ইসলামী পূনর্জাগরণের রূপকার ও রূপরেখা

(Architects & Outline of Islamic Revival)

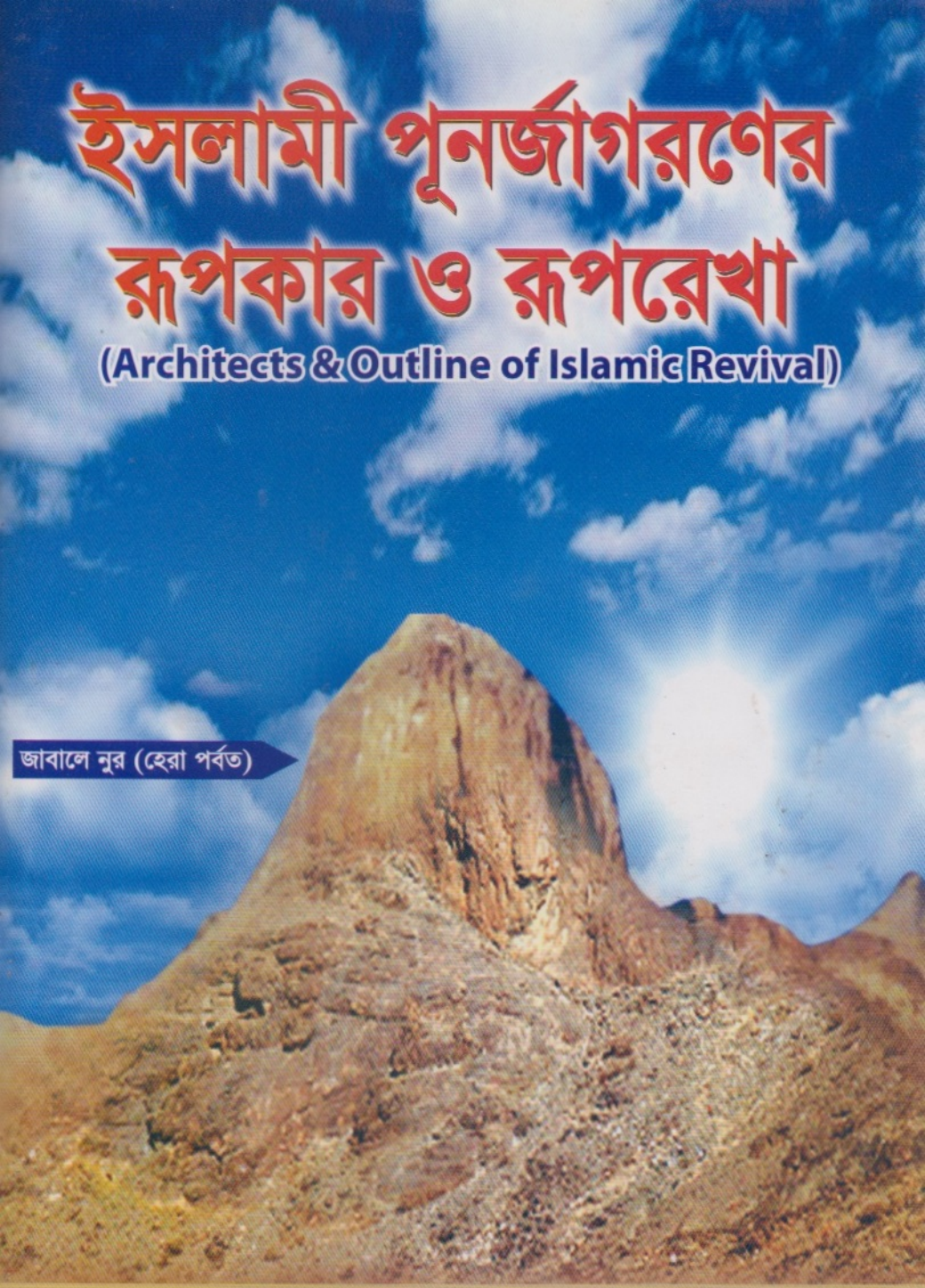

এস.এম. নজরুল ইসলাম

ইসলামী পুনর্জাগরণের রূপকার ও রূপরেখা

এস এম নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

ইসলামী পুনর্জাগরণের রূপকার ও রূপরেখা

এস এম নজরুল ইসলাম

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
মে ২০১৫

প্রকাশক
ইতিহাস অন্বেষা প্রকাশনা
২১৯ ফকিরেরপুল ১ম গলি, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
লেখক

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স
ফোন : ৯৫৫০১০৭, ০১৯১১৩৩৫৬৮২

মুদ্রণ
পিজন প্রিন্টিং প্রেস
১৮৬ মতিঝিল সার্কুলার রোড (হোটেল আল হেলাল বিল্ডিং), ঢাকা-১০০০।

মূল্য
২৮০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা।
- তামান্না বুক কর্ণার, ৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
- ধারণী সাহিত্য সংসদ, ৯৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা।
- কারেন্ট বুক সেন্টার, জলসা মার্কেট, চট্টগ্রাম।
- পিপলস লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা মোড়, চট্টগ্রাম।
- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সদর রোড, বরিশাল।
- আল-আমিন লাইব্রেরী, জামে কসাই মসজিদ মার্কেট, হেমায়েত উদ্দীন রোড, বরিশাল।
- প্রফেসরস বুক কর্ণার, ওয়ারলেস রেল গেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।
- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
- এবিসি প্রকাশনী, আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা), চট্টগ্রাম।
- মিতা প্রকাশনী, প্রেস ক্লাব মার্কেট, রংপুর শহর।
- বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ১৫০-৫২, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান

- **আহসান পাবলিকেশন**
  কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা।
- **তামান্না বুক কর্ণার**
  ৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
- **ধারণী সাহিত্য সংসদ**
  ৯৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা।
- **কারেন্ট বুক সেন্টার**
  জলসা মার্কেট, চট্টগ্রাম।
- **পিপলস লাইব্রেরী**
  আন্দরকিল্লা মোড়, চট্টগ্রাম।
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**
  সদর রোড, বরিশাল।
- **আল-আমিন লাইব্রেরী**
  জামে কসাই মসজিদ মার্কেট, হেমায়েত উদ্দীন রোড, বরিশাল।
- **প্রফেসরস বুক কর্ণার**
  ওয়ারলেস রেল গেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**
  সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
- **এ বি সি প্রকাশনী**
  আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা), চট্টগ্রাম।
- **মিতা প্রকাশনী**
  প্রেস ক্লাব মার্কেট, রংপুর শহর।
- **বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.**
  ১৫০-৫২, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সাচ্চা ঈমানদার ও দেশপ্রেমিক শহীদ
এবং গাজীদের স্মরণে—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অভিমত

মুহতারাম এস এম নজরুল ইসলাম আমার কাছে নতুন পরিচিত মুখ। কওমী সিলেবাসের নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষকতা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ক্লাসসংশ্লিষ্ট কিতাবাদি ও নির্দিষ্ট কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া অন্য কিছু পড়ার তেমন সুযোগ হয় না বিধায় তাঁর লেখাগুলো আগে পড়া হয়নি। সপ্তাহ দুয়েক আগে মনে হয় অতিরিক্ত সুধারণার ভিত্তিতে আমার কর্মস্থল **জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম**-এ এসে স্বশরীরে সাক্ষাৎ করেন। সাথে নিয়ে আসেন নিজের রচিত ও মুদ্রিত **'খাল কেটে কুমির আনার পরিণাম'** বইটির একটি কপি এবং প্রকাশিতব্য **'ইসলামী পুনর্জাগরণের রূপকার ও রূপরেখা'** বইটির একটি পাণ্ডুলিপি। বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। আলোচনার পর শেষোক্ত বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে একটি অভিমত দিতে আবদার করলেন। অপরিচিত লেখক ও অজানা লেখা সত্ত্বেও 'না' বলতে পারলাম না। স্বল্প সময়ের আলোচনা ও বই দুটি পড়ার পর অনুধাবন করতে পারলাম এস এম নজরুল ইসলাম একজন শেকড়সন্ধানী গবেষক ও লেখক এবং ইতিহাসপ্রেমী সাহসী সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক। সত্যিই প্রেম মানুষকে সাহসী বানায়, প্রেমের পথে প্রাণ দিতে শেখায়। দুটি বস্তু গোপন রাখা যায় না। এশ্‌ক ও মেশ্‌ক– প্রেম ও কস্তুরী। প্রেম প্রকাশ পেলে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের শিকার হতে হয়। কস্তুরীর সুগন্ধি হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লে সকলের নাসিকা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে এ-ও সত্য যে, প্রেমিক প্রেমাস্পদের দর্শনে ধন্য হওয়ার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করে এবং নানা জনের কাছে সহযোগিতা চায়, যাদের সহযোগিতা চায় তাদের মধ্যে এমনও কেউ থাকতে পারে, যে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে চায়।

মুহতারাম এস এম নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র অধ্যয়ন এবং তার সাথে কথা বলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, তিনি ইতিহাস-অন্বেষা ও ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা পাগলপরা। হয়তো এর ফলশ্রুতিতেই 'ইতিহাস-অন্বেষা' নামের পত্রিকাটির সম্পাদনা ও প্রকাশনায় দরদী মন নিয়ে তার আত্মনিয়োগ। পরবর্তীতে প্রকাশিত রচনাবলীর বই আকারে প্রকাশের ব্যবস্থাগ্রহণ। এ

www.pathagar.com

অভিযানের সফলতা-ব্যর্থতা আল্লাহর হাতে ও ভবিষ্যতের অজানা প্রকোষ্টে। কিন্তু তিনি যে বিষয়েই কলম ধরেছেন আন্তরিকতার মাধুরী মিশিয়ে লেখক হিসেবে মেধার বিস্ফোরণ ঘটাতে এবং যোগ্যতার কারিশমা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। ভাষা সাবলীল। উপস্থাপনা হৃদয়গ্রাহী। অধিকাংশ তথ্য-উপাত্ত সত্যগ্রাহ্য ও যুক্তিযুক্ত। পাঠক-মননে নাড়া দেয়। নতুন প্রজন্মকে আলো ঝলমল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়।

ইতিহাসপ্রেমী এই নির্ভীক কলমসৈনিক **'ইসলামী পুনর্জাগরণের রূপকার ও রূপরেখা'** নামের যে বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছেন তা তেরোটি প্রবন্ধের সামষ্টিক রূপ। আমি তার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। প্রত্যেক লেখা অতি মূল্যবান ও ইতিহাসভিত্তিক হওয়ায় সুখপাঠ্যও বটে। পাঠক অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে কোনো কোনো আলোচনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অবোধ্য, আবার কোনো কোনো আলোচনা মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ায় বিরক্তির কারণ হতে পারে। যেমন, সুফিবাদের ওপর যে আলোচনা হয়েছে তা থেকে পাঠক বিরূপ ধারণা পেতে পারেন। কেননা সুফিবাদের সকল ধারক ভ্রান্ত নন। অনেক সুফি-সাধক ছিলেন-আছেন, যাদের দ্বারা লাখো হাজার পথভ্রষ্ট মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন। ইরানী বিপ্লবের নায়ক শিয়াদের ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে এবং যত পৃষ্ঠা খরচ করা হয়েছে তা দেখে অনেকে ভাবতে পারেন, লেখক শিয়া মতাবলম্বী কিনা! ইরানী বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব কি-না মুসলিম স্কলারদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কে আরো অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। যে দেশে মুসলমান (সুন্নী মুসলমান) সরকারিভাবে সংখ্যালঘু সেটা কীভাবে ইসলামী দেশ হতে পারে? আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের স্বতঃসিদ্ধ মত হলো, হযরত আবু বকর (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তারপর ওমর, ওসমান ও আলী (রা)। তাঁদের খেলাফতকালই তো ইসলামের স্বর্ণযুগ।

সুতরাং ইরানী বিপ্লব নিরেট ইসলামী আন্দোলন নয়। শিয়া মতভিত্তিক বর্ণবাদী আন্দোলন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইউরোপ-আমেরিকার রাজনৈতিক বোদ্ধারা শিয়া মতাদর্শকে আর তাদের প্রতিপক্ষ ভাবছেন না। তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সুন্নী মুসলমানরাই তাদের মূল শত্রু। ইরান, সিরিয়া, ইরাক, বাহরাইন, লেবানন ও ইয়েমেনকে নিয়ে ইসলামী কনফেডারেশন নামে সুন্নীবিরোধী বৃহত্তর শিয়া সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখছে ইরান। যার নেতৃত্বে রয়েছে হাশেমী রাফসাঞ্জানীর মতো চরম সুন্নীবিরোধী খোমেনীর ভাবশিষ্যরা। সুতরাং

www.pathagar.com

কোনো সুন্নী মুসলমান শিয়া বিপ্লবকে ইসলামী আন্দোলন বলতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিভাবান গবেষক জনাব এস এম নজরুল ইসলামকে পরামর্শ দেবো, ইতিহাসের আরো গভীরে যান। নিরপেক্ষ সূত্রাবলী ঘেঁটে শিয়াদের মুখোশ উন্মোচন করুন। ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদের সোপান হলো তাওহীদ ও রিসালত। এ দু'টির ওপর ভর করেই ইসলামী আক্বীদা ও বিধি-বিধান। শিয়াদের ইমামত ইসলামের ফসলে ভয়াবহ ক্ষতিকারক পরগাছা। এর মূলোৎপাটন প্রয়োজন।

অবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে লেখকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর আরো বেশি খিদমত করার তাওফীক কামনা করছি।

২৯.০৪.২০১৫

(এম. এম. ফুরকানুল্লাহ খলীল)
উপপরিচালক
জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম
সম্পাদক, মাসিক আল-হক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা ও প্রসঙ্গ কথা

বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৭ বিলিয়নের কিছু বেশি। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মুসলিম। ২০০৯-এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা ১.৫৭ বিলিয়ন। খ্রিস্টান ২.১ বিলিয়ন। হিন্দু ৯০০ মিলিয়ন। বৌদ্ধ ৪০০ মিলিয়ন। ইয়াহুদী ১৯ মিলিয়ন। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩১% খ্রিস্টান, ২৩% মুসলিম, ১৪% হিন্দু, ৬% বৌদ্ধ আর ০.২২% ইয়াহুদী।

একটি জাতির পুনর্জাগরণের জন্য যা কিছু দরকার সবই আছে মুসলিম উম্মাহর। তবুও প্রায় তিন শতাব্দির বেশি সময় ধরে মুসলিম উম্মাহ পশ্চাদপদ ও দুর্বল জাতি হিসেবে জীবন যাপন করছে।

বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ মানবসম্পদ ও দুই-তৃতীয়াংশ প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী মুসলিম উম্মাহ। এতদসত্ত্বেও গোটা বিশ্বের মোট সম্পদে তাদের প্রাপ্তি মাত্র ৬%। বিশ্বের সমস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ বাস করে মুসলিম দেশে। যাদের দৈনন্দিন আয় হচ্ছে দুই ডলারের চেয়ে কম। বিশ্বের শীর্ষ ৩০টি ধনী রাষ্ট্রের মধ্যে একটিও মুসলিম দেশ নেই।

জাপানে এমনও গাড়ির কোম্পানি রয়েছে, যার বার্ষিক আয় কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের বার্ষিক বাজেটের চেয়েও বেশি, যার জনসংখ্যা ৭০ মিলিয়নেরও বেশি।

বিশ্বের ৫০ হাজার প্রথম সারির মানসম্পন্ন পণ্যের মধ্যে একটি পণ্যের উৎপাদকও কোনো মুসলিম দেশ নয়। সবগুলোই অমুসলিম রাষ্ট্র।

মুসলিম বিশ্বের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ শত শত মিলিয়ন ডলার। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার ক্ষেত্রে তারা সবসময় পিছিয়ে পড়ছে। একজন মধ্যবিত্ত গোছের মুসলিম পাশ্চাত্যের একজন মধ্যবিত্তের চেয়ে জীবনমানে বিশ বছর পিছিয়ে রয়েছে।

বিশ্বে ধূমপায়ীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা মুসলিম বিশ্বেই। মুসলিম বিশ্ব থেকেই তামাক কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করে। ৪০% মুসলিম যুবক উচ্চশিক্ষার সনদ নিয়েও মানসম্পন্ন পেশায় চাকরি পাচ্ছে না। তাই তারা বিদেশে পাড়ি জমায়। বিদেশে যেখানেই যাওয়া যায় সেখানেই লক্ষ লক্ষ

www.pathagar.com

মুসলিম প্রবাসী পাওয়া যায়। বিশ্বে যেখানে বেকারত্বের সমস্যা ৪-৬%। সেখানে মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ বেকারত্বের সংখ্যা ২০%। আর অপর্যাপ্ত আয়ের বেকারত্বের সংখ্যা ৬০%। মুসলিম বিশ্বের দারিদ্র্যতা দেখলে যে কোনো ললাট বেয়ে বেদনার ঘাম ঝড়ে। বিশ্বের বিবাদমান ত্রিশটি বিষয়ের মধ্যে ২৮টিই হলো মুসলিম বিশ্বে।

বিগত তিন দশকে আড়াই মিলিয়ন মুসলিম নিহত হয়েছে যুদ্ধে। ইরাকেই নিহত হয়েছে ৬ লাখের বেশি। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জেলবন্দী হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে। বিশ্বের ৮০%টি ফাঁসির ঘটনা ঘটছে মুসলিম দেশগুলোতে। সারা পৃথিবীর সমস্ত শরণার্থী ৮০% মুসলিম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা খাতে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম বিনিয়োগ করা হয় মুসলিম দেশগুলোতেই। আমেরিকা একাই ব্যয় করে বিজ্ঞান গবেষণায় ১৬৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি। যা এ ক্ষেত্রে বিশ্বের সমগ্র বরাদ্দের ৩২%। এর পরে আসে জাপানের অবস্থান। বিজ্ঞান গবেষণায় তার বাজেট হচ্ছে ১৩০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের ২৪%। তারপর হচ্ছে উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো। ক্রমিক অনুসারে, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা।

সমগ্র আরব বিশ্ব ব্যয় করে মাত্র ৫৩৫ মিলিয়ন ডলার। যাদের গবেষকদের সংখ্যাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানা যায় না। অথচ একা ইসরাইলই ব্যয় করে এ ক্ষেত্রে ৯ বিলিয়ন ডলার। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ইসরাইল মোট জাতীয় বাজেটের ৩৪.৬% ব্যয় করে। ইসরাইলে গবেষকদের সংখ্যা হচ্ছে মোটামুটি ২৪ হাজার। কোনো কোনো পরিসংখ্যানের হিসাবে ৯০ হাজার।

সমকালীন মুসলিম বিশ্বের এই হলো সামান্য কিছু চিত্র। যা মুসলমানদের অনুন্নতি, পশ্চাদপদতা ও পতিত অবস্থারই হৃদয়বিদারক বাস্তবতা বহন করে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, অধঃপতন ও পশ্চাদপদতা মুসলিমদের অলঙ্ঘনীয় ভাগ্যের স্থায়ী লিখন, মুসলিমরা সত্তাগতভাবেই পশ্চাদপদ, যা কখনো পরিবর্তনশীল নয়। বরং এটি একটি সাময়িক ধাপ মাত্র। কারণ, এই মুসলিমরাই বিশ্বকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে নেতৃত্ব দিয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত। মুসলিম মনীষীদের লেখা বই-পুস্তকই ছিল পাশ্চাত্যের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক।

মুসলিম রসায়নবিদ মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়ার হাম ও বসন্ত রোগ সম্পর্কে লিখিত 'আল-জুদারী ওয়াল হাসবাহ' বইটি ১৪৯৮ থেকে ১৮৬৬ খিস্টাব্দ পর্যন্ত ল্যাটিন ও ইউরোপীয় সকল ভাষাসহ চল্লিশবার শুধু ইংরেজি ভাষাতেই অনূদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। দশম খণ্ডে লিখিত চিকিৎসা বিষয়ক তাঁর আরেকটি

www.pathagar.com

বই 'কিতাবুল মানসুরী' পনর শতকের শেষ দিকে মিলান শহরে ল্যাটিন ভাষায় এবং পরবর্তীতে ফরাসী ও জার্মানি ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। তার লেখা আরেকটি মহামূল্যবান গ্রন্থ 'আল-হাবী'। এতে সর্বপ্রকার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও চিকিৎসার প্রণালী ও ওষুধের ব্যবস্থা ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে এই গ্রন্থখানা ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ্য হয়েছিল। সিসিলির রাজা প্রথম চার্লস এই বৃহৎ গ্রন্থের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। ষোল শতক পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ ছিল পাঠ্য।

মুসলমানদের কাছে অস্ত্র চিকিৎসার ব্যাপারে সমগ্র ইউরোপ ঋণী। শুধু ইউরোপই নয়; সমগ্র জগতকে আবুল কাসেম আল-জাহরাবী, তার আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি কর্ডোভার বিখ্যাত হাসপাতালের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্রচিকিৎসা বিশারদ ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, আরবী, আযমী শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের আশায় তাঁর বাড়িতে ভিড় জমাতো।

নাকের ছিদ্রে ওষুধ দেয়ার যন্ত্র, দাঁতের গোড়া পরিষ্কার করার যন্ত্র, দাঁতের গোড়ার গোশত কাটার যন্ত্র, চোখের পালকে গোশত কাটার যন্ত্র, মূত্রনালীর পাথর বের করার যন্ত্র, ভাঙ্গা হাড় বের করার যন্ত্র, জরায়ুর মুখ প্রশস্ত করার যন্ত্র ও সাধারণ চিকিৎসার বহু রকমের যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন।

ধাতু সম্পর্কে জাবির ইবনে হাইয়্যানের মৌলিক মতামত আঠার শতক পর্যন্ত ইউরোপের রসায়ন শিক্ষায় বিনা দ্বিধায় গৃহীত হতো। পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, পরিস্রবণ, দ্রবণ, কেলাসন, ভস্মীকরণ, বাষ্পীকরণ ও গলানো প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার তাঁরই দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। নাইট্রিক এসিড, আর্সেনিক, এন্টিমনি, সিল্‌ভার নাইট্রেড, কিউরিক ক্লোরাইড, পটাশ, সোডা, বিভিন্ন রকমের গন্ধক, সিলভার অব সালফার, ভিট্রিয়ল, সল্ট অ্যামোনিক, সল্টপিটার ও লেড এসিটেড প্রভৃতির আবিষ্কার তিনিই সর্বপ্রথম করেছিলেন।

মুসা আল খারেজমী সৌরমণ্ডল ও জ্যোতির্মণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা করে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র তিনিই এঁকেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ডিগ্রির মাপে পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি নিরূপণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ইউরোপীয় গবেষকগণ এটিকেই তাদের গবেষণার মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বীজগণিতের জন্মদাতা তিনি। তাঁর আল-জাবর নামক বীজগণিতের মৌলিক গ্রন্থ হতে ইউরোপীয় 'এলজেবরা' শব্দটি চয়ন করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে মিস্টার 'জিরার্ড' ল্যাটিন ভাষায় এই গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজগণিতের প্রধান ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

www.pathagar.com

মুসলিম বৈজ্ঞানিক আবুল হাসান সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানই নয়; ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবেও বিশ্বের বিশাল অংশ ছিল মুসলিম রাষ্ট্রের সরাসরি সীমানাভুক্ত। রাসূল (স.) এর যুগে তা গোটা আরব উপদ্বীপকেই শামিল করে নেয়। এরপর খুলাফায়ে রাশেদার ত্রিশ বছর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়ে শামের বিস্তীর্ণ এলাকা (সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তিনে) পাশাপাশি সাইপ্রাস (কুবরুস), ইরাক ও মিশর পর্যন্ত পৌছায়। উমাইয়্যা যুগের নব্বই বছরের শাসনামলে মুসলিম বিশ্ব বিস্তৃত হয় বিশাল এলাকাজুড়ে। পূর্বে ইরান, ভারত, চীন, মধ্য এশিয়া। পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা, আন্দালুস স্পেন, পর্তুগাল ও দক্ষিণ ফ্রান্স।

এরপর আব্বাসীয় যুগে ইসলাম মধ্য এশিয়ার অভ্যন্তরে বিভিন্ন নতুন নতুন এলাকায় ঢুকে পড়ে। এছাড়া, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকায় ইসলাম তার অবস্থান বিস্তৃত করে নেয়। মামলুকদের শাসনামলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে ভারতের সব দিক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকায়। এরপর ১৪৯২ সালে স্পেন ইসলামী বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়। আসে তুরস্ক ভিত্তিক উসমানী যুগ ১৩০০ সালে। যা উত্তর আফ্রিকাসহ তুরস্ক, বালকান, পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ, পশ্চিম আফ্রিকা, ভারত, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খিলাফাতের সমাপ্তি ঘটে। ১৯২৪ সালে তুরস্ক থেকে ইসলামী ফিলাফাত বিলুপ্তি ঘোষণা করে কামাল পাশা এবং তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেয়।

তারপর কালক্রমে অধিকাংশ মুসলিম দেশ ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারপর আবার ধীরে ধীরে স্বাধীনতা ফিরে পেতে থাকে। পৃথিবীতে আজ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যরূপে ৫৬ মুসলিম দেশ থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে মুসলিম দেশের সংখ্যা হলো ৮৬টি।

অনেক চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করে মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণ বসন্ত পূর্বাভাসের মতো সর্বত্র এখন আলোচ্য বিষয়।

২০০৭ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্বের বর্ধমান ছয়টি ধর্মের মধ্যে ইসলামই হচ্ছে প্রথম। আর খ্রিস্টান ধর্ম হচ্ছে ষষ্ঠ। ভ্যাটিকান পত্রিকা 'রুমানো লি'তে এক সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে যে, এই প্রথমবারের মতো ইতিহাসে ইসলাম ক্যাথলিক ধর্মকে ছাপিয়ে উঠলো। ক্যাথলিকরা বিশ্বের অধিবাসীদের ১৭.৪% ভাগ। আর মুসলিমদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৯.২ ভাগ। (যা বাস্তবে এখন ২৩% এর কম নয়)। এভাবে প্রটেস্টান্ট, ক্যাথলিক, ব্র আলাদা হিসাব করলে ইসলামই হবে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্ম।

ভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইউরোপে ২০০৭ সালে মুসলমানদের মোট

www.pathagar.com

সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৩ মিলিয়ন। অর্থাৎ ৫.২%। এদের মধ্যে ১৬ মিলিয়ন ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৩.২%।

এ সংখ্যা আজ দ্রুত হারে বেড়েই চলছে।

ফ্রান্সের বড় বড় নগরী যেমন, প্যারিস, নিস, মারসিলিয়াতে ২০ বছরের নিচে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা হচ্ছে ৩০%। আশা করা হচ্ছে, ২০২৭ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ৪৫% পৌঁছাবে। অর্থাৎ ৩৯ বছরের মধ্যে ফ্রান্সের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী হবে মুসলমান।

ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত Jeune Afrique ম্যাগাজিন উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডিসেম্বর ২০০১ এর ঘটনার পর থেকে ফ্রান্সে সর্বাধিক বিক্রিত পুস্তকের মধ্যে রয়েছে ফরাসী ভাষায় অনুবাদসহ 'চল্লিশ হাদীস' বইটি। ম্যাগাজিনটি আরো উল্লেখ করে যে, ফ্রান্সে ক্যাথলিকদের পরে ইসলামই হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। বছরে প্রায় ৫০ হাজার ফরাসী ইসলাম গ্রহণ করে।

অন্যদিকে, ব্রিটেনে গত ত্রিশ বছরে মুসলমানদের সংখ্যা ৮২ হাজার থেকে ত্রিশগুণ বেড়ে ২.৫ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। সেখানে এখন এক হাজারেরও বেশি রয়েছে মসজিদ। যেগুলোর অধিকাংশ ছিল গীর্জা। ব্রিটেনে বছরে ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ ব্রিটিশ ইসলাম গ্রহণ করে।

হল্যান্ডের নতুন জন্মগ্রহণকারীদের ৫০% হলো মুসলিম। এর অর্থ হচ্ছে, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে তার অর্ধেক জনসংখ্যাই হবে মুসলিম।

রাশিয়ায় বর্তমানে ২৩ মিলিয়নের চেয়ে বেশি মুসলিম রয়েছে। যা মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। আশা করা হচ্ছে যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই রুশ সেনাবাহিনীর ৪০% এ উপনীত হবে মুসলিমদের সংখ্যা।

২০০৮ সালে রাশিয়ার 'প্রাভদা' (Pravda) পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ ইসলাম হবে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ধর্ম। বর্তমানে সেথায় খ্রিস্টান অর্থডক্স এর পর ইসলামকে দ্বিতীয় ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়।

বেলজিয়ামের অধিবাসীদের ২৫% এবং নতুন জন্মগ্রহণকারীদের ৫০% এখন মুসলিম।

ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের এক তথ্যে বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সাল নাগাদ অর্থাৎ আগামী ১১ বছরের মধ্যে ইউরোপে জন্মগ্রহণকারীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে মুসলিম।

প্রথমবারের মতো জার্মান সরকার জানিয়েছে, জনসংখ্যা বর্ধনের গড়ে যে নিম্নমুখীতা সৃষ্টি হয়েছে, তা বন্ধ করা এখন সম্ভব নয়। কারণ, তা এমন পর্যায়ে চলে গেছে, যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব। এতে আরো বলা হয় যে, ২০৫০ সালের মধ্যে জার্মানি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেখানে গড়ে প্রত্যেক দুই

www.pathagar.com

ঘন্টায় একজন করে ইসলাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ বছরে ৪০০০ এর বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। প্রতিদিন গড়ে ১২ জন, প্রতি তিন মাসে প্রায় ৩৫০ জন। এটা হচ্ছে সরকারি হিসাব। বিভিন্ন ইসলামী সেন্টারের হিসেবে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি। কারণ অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে তা রেজিস্ট্রেশন করে না। এই হিসাবে সেখানে বছরে ১০ থেকে ১৫ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেক ৪৫ মিনিটে একজন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী খোদ জার্মানিতে এখন ২৫০০ মসজিদ রয়েছে।

ইতালিতে কর্মরত বিভিন্ন ইসলামী সংস্থার তথ্যানুসারে সেথায় প্রতি বছর শতাধিক মসজিদ নির্মিত হচ্ছে।

১৯৭০ সালে আমেরিকায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ মাত্র। তা বেড়ে ২০০৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৯ মিলিয়নে। ধারণা করা হচ্ছে যে, আগামী ত্রিশ বছরে এ সংখ্যা আরো বেড়ে ৫০ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে। জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে বলা হয়েছে যে, আমেরিকায় বর্তমানে সবচেয়ে দ্রত বর্ধনশীল ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। বর্তমানে আমেরিকাতে মসজিদের সংখ্যা হচ্ছে ১২০৯। যার অর্ধেকই নির্মিত হয়েছে গত বিশ বছরের মধ্যে। এগুলো আমাদের দেশে প্রচলিত মসজিদের মতো নয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : মাদ্রাসা, লাইব্রেরী, সামাজিক সেন্টার, পুস্তক বিক্রয় স্টল, খাবার ঘর, সেমিনার হল এমনকি আবাসনের ফ্ল্যাটও। ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা শতকরা ১৭ থেকে ৩০ ভাগ। এন বি সি চ্যানেলের তথ্যানুযায়ী, প্রতি বছর ২০,০০০ আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করে। আমেরিকার মুসলমানদের ২৫% জনই নতুন মুসলিম।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরিপের মধ্যে সংখ্যাতাত্ত্বিক কিছু পার্থক্য থাকলেও ইসলামের প্রসারতা ও দ্রুত বর্ধ্বনশীলতার প্রশ্নে সবগুলোর অবস্থান অভিন্ন।

আসলে, পুনর্জাগরণ ও উত্থানের বিষয়টি বিশ্বব্যবস্থাপনায় আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার একটি অমোঘ বিধান। যে কোনো জাতির দুটো অবস্থাই হতে পারে। শক্তি ও দুর্বলতা। কোনো জাতি তখনই শক্তিশালী হয়, যখন সে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারে। সে লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে দৃঢ়পদে এগিয়ে যায়। সামনে রাখতে পারে সর্বোত্তম অনুকরণীয় আদর্শ। বরণ করে নিতে পারে এই পথে যে কোনো ত্যাগ ও কুরবানী। পক্ষান্তরে, কোনো জাতি যখন তার উদ্দেশ্য ভুলে যায়। আদর্শ সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। হারিয়ে ফেলে তার কর্মপদ্ধতি। জিহাদের উপর পার্থিব স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। চরিত্রকে ধ্বংস করে। ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত হয়ে

www.pathagar.com

দায়িত্বের প্রতি হয় উদাসীন। তখন দুর্বলতা তাকে পরিবেষ্টন করে নেয়। সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যায় সে। এভাবে ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের তলে হারিয়ে যায় সে জাতি।

পৃথিবীর নেতৃত্ব এক সময় ছিল শুধুই প্রাচ্যমুখী বা পূর্বকেন্দ্রিক। তারপর গ্রীস ও রোমের উত্থানের পর তা চলে যায় পাশ্চাত্যে। অতঃপর আবার মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (স.) এর নবুয়্যাতের মাধ্যমে তা চলে আসে প্রাচ্যে। তারপর প্রাচ্যবাসীরা অলস নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। এক সময় তা আবার চলে যায় পাশ্চাত্যে। এই সেই পাশ্চাত্য যারা আজ নেতৃত্বের নামে গোটা বিশ্বকে যুলুম, নির্যাতন ও অনৈতিকতার বিষাক্ত ছোবল দিয়ে মুমূর্ষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। বিগত শতাব্দিগুলোতে ঘটে যাওয়া হাজারো তিক্ত বাস্তবতার আলোকে বিশ্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছে, পাশ্চাত্যের স্বার্থপর, ভোগবাদী, ধর্মহীন সভ্যতায় মানবতার মুক্তি নেই। মানব রচিত মতবাদগুলো জীবন সমস্যার সমাধানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

তাই বিশ্ব আজ নতুন এক সভ্যতার পানে তাকিয়ে রয়েছে। যেখানে মানুষকে প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হবে। সর্বাত্মক ও সর্বজনীন ন্যায় বিচারের গ্যারান্টি থাকবে। দেহ ও আত্মার প্রতি যুগপৎ গুরুত্বারোপ করা হবে। মানুষ খুঁজে পাবে, জীবনের মূল লক্ষ্য। খুঁজে তার মৌলিক পরিচয় ও শেষ পরিণামে সাফল্যের সন্ধান। সেই সভ্যতার নামই হলো ইসলাম। এজন্যই আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিশ্বমানবতার জন্য সাক্ষী তথা শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বলছেন :

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে" (আল-বাকারাহ : ১৪৩)।

তাই ইসলামই হলো মানবতার আগামী দিনের কাঙ্ক্ষিত সভ্যতা। বিশ্বনেতৃত্ব এখন তাদের জন্য অপেক্ষমাণ। ইসলামের পুনর্জাগরণ ও চূড়ান্ত বিজয় এখন সময়ের অনিবার্য দাবি।

তাই হাতাশা নয়; বরং মানবতার কল্যাণ সাধনের প্রতিজ্ঞায় পুনর্জাগরণের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মুসলিম উম্মাহর এখন এগিয়ে যাওয়ার সময়। তাদের বিজয় অনিবার্য। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে উম্মাহর এই বিজয়ের বহুমুখী সুসংবাদ অকাট্যভাবে দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের তিন স্থানে আল্লাহ সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামের এই বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে বলছেন,

"তিনি প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন" (সূরা তাওবাহ : ৩৩, আল-ফাতহ : ২৮, আসসাফ : ৯)। ইসলাম শুধু ধর্ম হিসেবে নয়; বরং

www.pathagar.com

রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবেও গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, নিম্নের হাদীসদ্বয় থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

হযরত তামীমুদ্দারী (রা.) রাসূল (স.) থেকে বর্ণনা করেন :

"(মহাবিশ্বের) যেথায় দিনের আলো ও রাতের আধার গিয়ে পৌঁছায় সেথায় গিয়ে ইসলাম পৌঁছাবে। (ভূপৃষ্ঠে) এমন কোনো মাটির ঘর বা ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের কালেমা প্রবেশ করাবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানীর সাথে। আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করবেন। আর কুফরকে করবেন লাঞ্ছিত।" (আহমাদ, হাকিম)।

হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল (স.) বলছেন :

"আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করলেন। তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত দেখলাম। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের রাজত্ব সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে পর্যন্ত যমীন আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল" (মুসলিম)।

হযরত আমার ইবনুল 'আস বলেন,

আমরা একদা রাসূলের চারপাশে বসে লিখছিলাম। এমন সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন শহরটি আগে বিজয় হবে? কনস্টানটিনোপল (আজকের 'ইস্তাম্বুল') না কি রোম? রাসূল (স.) জবাব দিলেন, হিরাক্লিয়াসের শহর (অর্থাৎ কনস্টানটিনোপল) প্রথমে বিজয় হবে (আহমাদ, দারমী)।

এই সুসংবাদের ৮০০ শত বছর পরে ২৩ বছরের উসমানী যুবক মুহাম্মাদ বিন মুরাদ আল-ফাতিহের হাতে এই নগরীর বিজয় অর্জিত হয় ১৪৫৩ সালে। এখন আমরা ইতালির রাজধানী রোম বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছি এবং সেদিন অবশ্যই আসবে।

খিলাফাতে রাশেদার যুগে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিজয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আরব উপদ্বীপ থেকে কুফর চিরতরে বিদায় নিয়েছে। পরবর্তীতে উমাইয়া, আব্বাসীয়, উসমানীয় খিলাফাতের যুগে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। যা ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। অতঃপর রাজনৈতিক বিজয় সংকুচিত হয়ে গেলেও ধর্মীয় বিজয় সর্বদা ক্রমবর্ধমান রয়েছে। বর্তমানে যা অতি দ্রুতবেগে এগিয়ে চলছে। যা পরিসংখ্যানের দ্বারা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। মানুষ নাস্তিক্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যে এবং মানুষের মনগড়া ধর্মসমূহে মানসিক শান্তি ও সুখ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে দ্রুত ইলাহী ধর্ম ইসলামের দিকে ফিরে আসছে। বস্তুবাদীরা যতই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের উপর যুলুম

www.pathagar.com

করবে, মানুষ ততই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এভাবেই ইসলাম যখন মানুষের হৃদয় দখল করবে, তখন পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি সবই ইসলামের দখলে চলে আসবে।

আদর্শিক বিজয়ের স্বরূপ হলো আদর্শ কবুল করার মাধ্যমে বিজয় আসা। রাজনৈতিক বিজয়কে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করলে ইসলামী বিজয় বাধাগ্রস্থ হয়। বরং ইসলামী বিজয়কে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করলে রাজনৈতিক বিজয় ত্বরান্বিত হয়। লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল হবার কারণে অনেক দেশে ইসলামী বিজয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দৃঢ়চিত্ত, ঈমানদার ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ইসলামের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য। সেই সাথে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা যদি কোনো আন্দোলনের লক্ষ্য না হয়, তাহলে সেখানে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে না। মনে রাখতে হবে, ইসলাম কখনোই পরাজিত হয় না। পরাজিত হই আমরা– আমাদের দোষে। আমরা যতই ত্রুটিমুক্ত হব, আল্লাহর রহমত তত নিকটবর্তী হবে। সাময়িক বস্তুগত বিজয়ে শত্রুরা হাসবে। এটাই ওদের দুনিয়ার সান্ত্বনা। পরকালে ওরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

"ওরা চায় মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে (ইসলামকে) পূর্ণতায় পৌছানো ব্যতীত ক্ষান্ত হবেন না। যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে" (আত-তাওবাহ : ৩২)।

সবকিছু বিবেচনায় এনে এ কথা বলা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ আজ একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শত শত ব্যর্থতার মাঝেও তার সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও বিজয়ের অপার সম্ভাবনা। মনে রাখতে হবে, মুসলিম উম্মাহ কোনো শিকড়হীন বৃক্ষ নয়। এর শিকড় এত গভীরে প্রোথিত যে, যত ঝড়-বন্যা-সাইক্লোনই আসুক না কেন, তাতে হয়তো এর ডাল-মগডালগুলো প্রচণ্ডরূপে আন্দোলিত হবে, এদিক-সেদিক দুলবে, কিন্তু এর শিকড় উৎপাটিত হবে না। এ বৃক্ষ প্রতিনিয়ত সুফল দিতেই থাকবে। মুসলিম উম্মাহ নয়তো সমুদ্রের কোনো ফেনার মতো যে, অদৃশ্যে হারিয়ে যাবে। বরং তারা এমন খনিসদৃশ, যা মানবতার কল্যাণে পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। তার উপর দিয়ে যখন বিপদ-বিপর্যয় বয়ে যায়, তখন অবিশ্বাসীরা মনে করে, সে মরে গেছে। আসলে সে মরে না। সাময়িক দুর্বল হয় মাত্র। কারণ, তার মধ্যে রয়েছে এমন উপাদান যা নতুন করে জীবন সঞ্চার করতে পারে। রাতের আধার হয়তো কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভোর হবে না কোনো দিন। ফজরের আযান আর শোনা যাবে না। আজকের বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ সেই আযান ও ভোরের অপেক্ষায় শুধু প্রহর গুনছে। কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে, যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক কর্মপদ্ধতির

www.pathagar.com

অভাব। এ বিষয়ে চলছে নিত্য নতুন গবেষণা। প্রকাশিত হচ্ছে গবেষকদের মত-অভিমত।

'ইসলামী পুনর্জাগরণের রূপকার ও রূপরেখা' আলোচ্য বইটি মূলত এ পর্যায়েরই একটি নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টা। বইটির ক্ষুরধার লেখক অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলাম তাঁর শিকড়সন্ধানী, ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক, বাস্তবধর্মী ও দিকনির্দেশনামূলক মূল্যবান লেখালেখির জন্য অনেক আগেই বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ইতোপূর্বে তাঁর প্রকাশিত প্রায় সবগুলো বই আংশিক কিংবা পূর্ণভাবে পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, এই বইটি তাঁর লিখিত সবগুলো বইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এতে তিনি মুসলিম উম্মাহর সামনে এমন কিছু মনীষীর চিন্তাধারা ও কর্মকৌশল তুলে ধরেছেন, যারা ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে মুসলিম উম্মাহকে ভয়াবহ সংকট ও বিপর্যয় থেকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। ইতিহাস যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে। যেমন, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, জামাল উদ্দীন আফগানী, ইমাম খোমেনী, শায়খ আহমাদ ইয়াসিন প্রমুখ। একই সাথে তুলে ধরেছেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গিও একাধিক প্রবন্ধে।

উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলাম তথা মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাদের অনুসৃত কর্মপদ্ধতির রূপরেখা আত্মস্থ করা ও তার আলোকে আগামী দিনের পথ-পাথেয় সংগ্রহ করা। বইটির আদ্যোপান্ত গভীর মনোযোগের সাথে পড়ার চেষ্টা করেছি। আলোকিত ও সমৃদ্ধ হয়েছি। একই সাথে নিজের বহুমুখী মূর্খতাও উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছি। মুসলিম উম্মাহর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থানের প্রেক্ষিতে এই বইটি বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমি আন্তরিকভাবে লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দুআ করছি, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর এ আমল কবুল করেন। আমীন।

ড. বি. এম. মফিজুর রহমান আল-আযহারী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
পরিচালক, সেন্টার ফর ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট কোর্সেস
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
খতীব, চট্টগ্রাম কলেজ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

প্রতিটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল হলো সংশ্লিষ্ট ধর্ম। হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত প্রত্যেকেই ধর্মীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নবী-রাসূল (সা) ও তাঁদের সঠিক অনুসারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা হলো মানবীয় সভ্যতা। পক্ষান্তরে উক্ত সভ্যতা সংস্কৃতির বিরোধী সভ্যতা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি হলো দানবীয় সভ্যতা বা শয়তানী সভ্যতা। পবিত্র কুরআনেও মানুষকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর একটি হলো আসহাবুল ইয়ামীন (ডানপন্থী বা হকপন্থী), অপরটি হলো আসহাবুস শেমাল (বামপন্থী বা বাতিলপন্থী)।

আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব করার জন্য। এই দাসত্বের পরীক্ষাকেন্দ্র হলো দুনিয়ার জীবন। মানুষ ও জিন ব্যতীত অপর কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেননি। ফলে অন্যান্য সৃষ্টি সদা-সর্বদা তাঁর আনুগত্য করে। কিন্তু মানুষ ও জিন তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে এক অংশ আল্লাহর আনুগত্য করে, অপর অংশ নিজেদের খেয়ালখুশি মোতাবেক জীবন যাপন করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে অভিশপ্ত শয়তানের আনুগত্য করে। মানুষ ও জিনের মধ্যে তৃতীয় পন্থার অনুসারীদের সংখ্যাও কম নয়। এই তৃতীয় পন্থার বৈশিষ্ট্য হলো– এরা আল্লাহর কিছু আদেশকে মানে এবং কিছু আদেশকে অমান্য করে অথবা অগ্রাহ্য করে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী উক্ত প্রথম পক্ষ তাদের দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরকালে সুখময় বেহেশতের বাসিন্দা হবে, দ্বিতীয় পক্ষ দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষায় ফেল করে পরকালে নিজেদের জন্য জাহান্নামকে বেছে নেয় এবং তৃতীয় পক্ষ (অর্থাৎ সুবিধাবাদী পক্ষ) দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং আখেরাতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

বিগত ৩-৪ শত বছর যাবত দেখা যাচ্ছে, পবিত্র কুরআনে শ্রেষ্ঠ জাতি (খাইরুন্ উম্মাত) হিসেবে বর্ণিত মুসলমানগণ পৃথিবীর অপরাপর সকল জাতির

www.pathagar.com

ফুটবলে পরিণত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমানই বর্ণিত তৃতীয় পক্ষের দলে নিজেদের নাম লিখিয়েছে। এমতাবস্থায় ভিন জাতির ফুটবল হওয়া থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে মুসলমানরা যদি স্বাধীন ও মর্যাদাবান হতে চায় তবে তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন, রাসূল মুহাম্মদ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের আদর্শকে ধারণ করতে হবে এবং রিসালাতের শিক্ষাকে অনুধাবন করতে হবে।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল (সা) পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী হওয়ায় তাঁর উম্মতদের উপর রোজ কিয়ামত পর্যন্ত রিসালাতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ততা অর্জন করতে হলে রিসালাতের শিক্ষাকে অনুধাবন করতে হবে।

রিসালাতের শিক্ষা : সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে মহান ব্যক্তিকে রিসালাতের দায়িত্ব প্রদান করেছেন তাঁকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মানব হওয়ার যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা দান করেছেন। এটিই আল্লাহর হিকমাত। উদাহরণস্বরূপ আমি কয়েকজন নবী-রাসূল (সা) ও তাঁদের সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করব।

ক. হযরত নূহ (আ) যে যুগে দুনিয়াতে এসেছেন যে যুগের মানুষ ব্যাপকভাবে নৌকা তৈরি করত এবং নৌকার মাধ্যমে সমুদ্রে চলাচল করত। আল্লাহ নূহ (আ)কে সে যুগে বৃহদাকার বহুতল জাহাজ নির্মাণের জ্ঞান দান করেন এবং নূহ (আ) উক্ত জ্ঞানের মাধ্যমে বৃহদাকার বহুতল জাহাজ নির্মাণ করে সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

খ. হযরত মূসা (আ) যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন সে যুগে উক্ত জনপদের অধিবাসীরা যাদুবিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করেছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ মূসা (আ)কে লাঠির সাহায্যে এমন মোজেজা দান করেন, যাতে সকল যাদুকরগণ মূসা (আ)-এর নিকট মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এভাবে সমকালীন শ্রেষ্ঠতত্ব অর্জন করে মূসা (আ) নিজ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয় অর্জন করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

গ. হযরত দাউদ (আ)-এর যুগে জনগণের মধ্যে গান-বাজনার প্রচলন ছিল খুব বেশি। তদুপরি শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। আল্লাহ দাউদ (আ)কে এমন সুন্দর কিতাব ও কণ্ঠ প্রদান করেন যে,

www.pathagar.com

দাউদ (আ) যখন আল্লাহর কালাম পাঠ করতেন তখন মানুষ ছাড়াও জীবজন্তু, সাগরের মাছ ও আকাশের পাখিরাও তাঁর সুমধুর তেলাওয়াত শ্রবণে একত্রিত হতো। এ ছাড়াও আল্লাহ দাউদ (আ)কে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করায় তিনি প্রতিবেশী শক্তিশালী জালেম শাসক 'জালুত'কে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজ জাতির একচ্ছত্র নেতায় পরিণত হন এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।

ঘ. হযরত সোলায়মান (আ)-এর আমলে বিশ্বে বিভিন্ন ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি ও শাসকশ্রেণী ছিল, সে যুগের মানুষের মুখে মুখে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের গল্প শোনা যেত। আল্লাহ হযরত সোলায়মান আলাইহেস সালামকে ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্য ছাড়াও পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর কথোপকথন বুঝার ও তাদেরকে পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করেন এবং সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় দ্বীনকে বিজয়ী করেন।

ঙ. হযরত ঈসা (আ)-এর যুগে গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান ছিল শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। তৎকালীন গ্রীকদের উদ্ভাবিত ইউনানী চিকিৎসা মুসলমানদের মাধ্যমে বর্তমানেও টিকে আছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ হযরত ঈসা (আ)কে এমন মোজেজা দান করলেন, যাতে তাঁর হস্তস্পর্শে রোগী সুস্থ হয়ে যেত এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মৃতকে জীবিত করারও ক্ষমতা লাভ করে যুগশ্রেষ্ঠ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসার করেন।

চ. হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যুগে আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়সমূহ ছিল– ১. আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য, ২. বংশ গৌরব, ৩. যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব। এমতাবস্থায় আল্লাহ আরবী ভাষায় নাজিল করলেন অশ্রুতপূর্ব গদ্য ছন্দের আল কুরআন এবং তাঁর নবীর কণ্ঠে তা প্রতিধ্বনিত হতো আকর্ষণীয় সুরে। তিনি তাঁর নবীকে পাঠালেন আরবের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বংশে এবং নবী মুহাম্মদ (সা) ১৭টি যুদ্ধের সেনাপতিত্বের পদ অলংকৃত করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

উপরোক্ত উদাহরণসমূহের মাধ্যমে আমরা অবগত হলাম যে, রিসালাতের শিক্ষা হচ্ছে– আল্লাহর দ্বীনের দায়ীকে হতে হবে যুগশ্রেষ্ঠ। সমকালীন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিত্বই মানুষকে আল্লাহর পথে নেতৃত্ব প্রদান করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন।

(বি.দ্র. : রিসালাতের শিক্ষা সংক্রান্ত অংশটি আমার প্রবন্ধ সংকলন 'সমকালীন সংলাপ' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে)

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে পাঠকদের মনে প্রথম যে প্রশ্নের উদয় হতে পারে তা হলো– রাসূলদের অবর্তমানে সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব কিভাবে অর্জিত হবে?

www.pathagar.com

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যারা নিজেদেরকে রাসূলের অনুসারী মনে করেন তাদের উচিত হবে পবিত্র কুরআন যথাযথভাবে অধ্যয়ন করা, রাসূল (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ও কর্মের উপর গবেষণা করা, পবিত্র কুরআনে যেসকল বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে সে সকল বিষয়ের উপর গবেষণা করে সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী মুসলমানকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করে তাঁর আনুগত্য করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মজলিশে শুরা/ বায়তুল হিকমা/ নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি পাঠকদের মনে উদয় হতে পারে তা হলো– বর্তমান যুগের শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমানদেরকে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রথমেই শতধা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণসমূহ অনুসন্ধান করতে হবে, অতঃপর রোগ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের দুঃসময়ের পথপ্রদর্শক হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহর উপলব্ধি ও দিক-নির্দেশনা নিম্নরূপ :

তাঁর উপলব্ধি : সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাবে সমাজ, রাষ্ট্র এবং জাতীয় জীবনে বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, ব্যবহারিক বিকৃতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা করে। সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিধান জরুরি। কুরআনের ব্যবহারিক মূল্য প্রদর্শন এবং অর্থনৈতিক সমতা বিধান একান্ত জরুরি। এ দুটি ছিল শাহ ওয়ালীউল্লাহর সংস্কার কর্মসূচির বুনিয়াদ। (উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, শাহ ওয়ালীউল্লাহর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, পৃ. ১৮)

তাঁর দিক-নির্দেশনা : ১. ইসলামের নীতি ও বিধানগুলোকে যুক্তি ও বিবেকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসেছে। কেবল আল্লাহর আদেশ বলে মানুষ তা পালন করবে সে যুগ আর নেই। (আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, সমাজ, সংস্কৃতি, ও ইতিহাস, পৃ ১২১)

২. মুসলমানদের মধ্যে যতদিন জিহাদের মানসিকতা বজায় ছিল ততদিন তাদের বিজয় ও সম্মান অব্যাহত ছিল, কিন্তু যখন থেকে জিহাদের মানসিকতা দূর হয়েছে তখন থেকে তারা সর্বত্র অপমানিত ও ঘৃণিত হয়েছে। (জি.এন. জালবানী, লাইফ অফ শাহ ওয়ালিউল্লাহ, পৃ. ৬২)

এ বিষয়ে পরাধীন ভারতের অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের কঠিন সময়ের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম লিখেছেন–

১. জন্মগত ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব থেকে কোনো জীবেরই পরিত্রাণ নেই। এ জন্য আমি সমাজবিজ্ঞান ও তার অন্যান্য শাখা অর্থনীতি,

www.pathagar.com

রাজনীতি, ইতিহাস ও আইনশাস্ত্র পড়াশোনা শুরু করি। সমাজবিজ্ঞানের সাথে দর্শনশাস্ত্রও পড়তে হয়েছে। এসব পড়তে গিয়ে বুঝলাম যে, পবিত্র কুরআনকে ভালোভাবে বুঝতে হলে দর্শনশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ও জীববিদ্যার উপর একটা সুষ্ঠু ধারণা থাকা প্রয়োজন। এরপর আমি ইসলাম ও কমিউনিজমের তুলনামূলক পড়াশোনায় উৎসাহী হই। (সূত্র : আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, আবুল হাশিম, অনুবাদ : শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী, পৃ. ১৯)

২. ১৯৩৭ সালে কলকাতায় এম এ ইস্পাহানীর বাসভবনে আমি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। জিন্নাহ আমাকে বললেন– যুবক, আমার পতাকাতলে এসো। উত্তরে আমি বলেছিলাম, স্যার, আমি কেন, প্রত্যেক নারী ও পুরুষ আপনার পতাকাতলে আসবে যদি আপনি তাদের জন্য উপযুক্ত লক্ষ্য নির্দেশ করতে সক্ষম হন। যুবকরা চায় উন্মাদনা, আবেগ ও চাঞ্চল্য। (সূত্র : ঐ, পৃ. ২৫)

৩. মৌলানা আজাদ সুবহানী একজন প্রতিথযশা দার্শনিক ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাবিদ ছিলেন। মানবজীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী চিন্তাধারার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব দিতেন।... তিনি আমাকে রব্বানী দর্শনে দীক্ষিত করেছিলেন। রব্বানিয়াত শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক 'রব' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং বিবর্তক। বাস্তব অর্থে রব্বানিয়াত বলতে বোঝায় স্রষ্টার নিয়ম অনুসারে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং বিবর্তনে মানবজাতির দৈহিক. মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন, যেগুলো প্রকৃতির মধ্যে আল কুরআন এবং পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনে লক্ষ্যণীয় ছিল। আল কুরআন এবং মুহাম্মদ (সা) কোনো অদ্ভূত ও অসার জীবনপদ্ধতি শিক্ষা দেননি বরং অন্যান্য পয়গম্বর, ঋষি ও দার্শনিকরা যা শিক্ষা দিয়েছিলেন সেগুলোর সঠিকতাই তুলে ধরেছিলেন। রব্বানিয়াত ইসলামী মূল্যবোধের মূল তত্ত্ব।... যে রাষ্ট্র তার নাগরিকের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে বিশ্বস্ততার সঙ্গে রব্বানিয়াতকে কার্যে পরিণত করে তাকেই বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্র।... মাওলানা আজাদ সোবহানী আমাকে ইসলামের প্রায়োগিক তাৎপর্য শিক্ষা দেন এবং আমি মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক হয়ে বাংলায় মুসলিম লীগ এর মঞ্চ থেকে ইসলামের প্রায়োগিক তাৎপর্য প্রচার করি। ফলে মুসলিম লীগ অতি অল্পকালের মধ্যেই জনগণের সংগঠনে পরিণত হয়। (সূত্র : ঐ, পৃ. ৩৫-৩৭)

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পবিত্র কুরআনে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও জীবজগৎ সম্পর্কে যেসব আলোচনা

www.pathagar.com

রয়েছে সেসব বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত পবিত্র কুরআনকে যুগোপযোগীভাবে বুঝা সম্ভব নয়। যুগোপযোগীভাবে নিজে বুঝে সমকালীন জনগণকে ইসলামের প্রায়োগিক তাৎপর্য শিক্ষা দিলে জনগণ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে। জনগণের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে এর ইসলামিক সমাধানসূত্রের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে এবং জনগণের জন্য উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এর মাধ্যমেই সমকালীন জনগণ দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

আমার লিখিত 'ইসলামী পুনর্জাগরণের রূপকার ও রূপরেখা' বইটিতে মূল প্রবন্ধ রয়েছে ৮টি। তন্মধ্যে প্রথম প্রবন্ধটির মাধ্যমে সকল দর্শনের চেয়ে ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী ৫টি প্রবন্ধে ৫ জন সফল ইসলামী নেতৃত্বের জীবন, কর্ম, শিক্ষা, কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। ৭ম প্রবন্ধে জিহাদের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। ৮ম প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামের ও মুসলমানদের বিজয়ের শর্তাবলী উল্লেখিত হয়েছে। পরিশিষ্টে রয়েছে ৫টি প্রবন্ধ। মূল ৮টি প্রবন্ধ পাঠের পর পাঠকের মনে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে সে সকল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে পরিশিষ্টে প্রদত্ত ৫টি প্রবন্ধ উপকারী প্রমাণিত হবে– এই আমার বিশ্বাস।

ইসলামের প্রথম বিজ্ঞানী ছিলেন খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা)। তাঁর সময়কাল থেকে পরবর্তী ৯০০ বছর যাবত মুসলিম শাসকবর্গ ও আলেম ওলামারা সমকালীন জ্ঞানের সকল শাখায় যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। মুসলমানগণ যতদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন ততদিন আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের পদে বহাল রেখেছিলেন। কিন্তু যখনই মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা ত্যাগ করে, জিহাদ ভুলে গিয়ে আরাম-আয়েশের, ঝগড়া-ফ্যাসাদ-আত্মকলহের জীবন বেছে নিল তখন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে চলে যেতে থাকে। সর্বশেষ প্রথম মহাযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯২২ সালে তুর্কী খিলাফতের অবসানের মাধ্যমে মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বের সকল কর্তৃত্ব হারায়। অতঃপর সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আফগানীর Pan Islamism-কে ধারণ করে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। ইরানের প্রভাবে ও সহায়তায় লেবাননে হিজবুল্লাহর নেতৃত্বে এবং ফিলিস্তিনে হামাসের নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়াভিযান পুনরায় শুরু হয়েছে। তুর্কী খিলাফত উচ্ছেদকারী ইহুদীদের অনুচর কামাল পাশার মতবাদ ও ধ্বংসলীলা থেকে তুরস্ক আবার ইসলামের

www.pathagar.com

পথে জয়যাত্রা শুরু করেছে। ইহুদীদের অনুচর আরব রাজা-বাদশাহদের অর্থ সহায়তায় ও ইহুদী-খ্রিস্টান ষড়যন্ত্রে মিসরের ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলেমুন আপাতত পরাজিত হলেও অতিশীঘ্রই তারা বিজয়ী হবে ইনশাল্লাহ।

ইসলামের এ সকল অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য ইহুদী-খ্রিস্টান ও হিন্দুশক্তি এবং তাদের আজ্ঞাবহ নামধারী মুসলিম শাসকরা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে রক্তের হোলিখেলা খেলছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মুসলিম বিশ্বের বর্তমান গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত মুসলিম বিশ্বের ধ্বংসের লক্ষণ নয়– বরং এর মাধ্যমেই মুসলিম বিশ্ব পুনরায় বিশ্বের নেতৃত্বের আসন দখল করবে। এ জন্য প্রয়োজন হবে সঠিক ও যুগোপযোগী নেতৃত্ব, পবিত্র কুরআনের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, জ্ঞানের সকল শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং সর্বোপরি মহান রাব্বুল আলামীনের সাহায্য। পবিত্র কুরআনকে তাবিজ, কবজ, সওয়াব ও বরকত হাসিলের গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার না করে মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে পুনস্থাপন করলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, মানবতা মুক্তি পাবে, জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষিত হবে। এর মাধ্যমেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সওয়াব, বরকতের সাথে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবী নিশ্চিত করবেন।

মাসিক আল-হক পত্রিকার সম্পাদক এবং জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম-এর উপ-পরিচালক মুহ্তারাম এম এম ফুরকানুল্লাহ্ খলীল এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, সংগ্রামী আলেম ড. বি. এম. মফিজুর রহমান আল-আযহারী এই বইটি পড়ে মূল্যবান অভিমত প্রদান করে নিজেদের দ্বীনি দায়িত্ব পালন করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদের সাথে আমাকেও পুরস্কৃত করবেন এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বইটি প্রকাশে যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁরাও মহান আল্লাহর রহমত লাভ করে তৃপ্ত হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে সঠিক পথ চিনে সঠিক পদ্ধতিতে পথ চলার তৌফিক দিন। আমিন।

ধন্যবাদান্তে

এস এম নজরুল ইসলাম
০১৭১১ ৭২০৯২৩

চট্টগ্রাম
১৫ মে ২০১৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিভিন্ন দর্শনে নাগরিকের মর্যাদা : দায়িত্ব ও কর্তব্য / ৩৭
শায়খ আহমদ সারহিন্দী (মুজাদ্দেদে আলফে-সানী)র সংস্কার আন্দোলন / ৪৭
মহান সংস্কারক শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব / ৫৮
প্যান ইসলামিক চিন্তাধারার আধুনিক প্রবক্তা সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আফগানী / ৬৭
মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণের মহানায়ক ইমাম রুহুল্লাহ মোস্তাফাভী মুসাভী খোমেনী / ৭৫
স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিনের রূপকার শায়খ আহমদ ইসমাইল হাসান ইয়াছিন / ১১৭
শাহাদাতে কারবালার ঘটনাবলী ও শিক্ষা / ১৩৬
আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই—বিজয়ের শর্তাবলী / ১৪১

পরিশিষ্ট
সম্রাট আকবরের তথাকথিত 'দ্বীনে ইলাহী' / ১৫৩
সম্রাট আকবরের বিপথগামিতার নেপথ্য কারণ / ১৭১
শিয়া মাজহাবী চিন্তাধারা / ১৯৭
কাদিয়ানী ফেরকা বা মতবাদ / ২০২
Pan Islamism বা বিশ্ব ইসলামীবাদ / ২০৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিষয় সূচি

প্রবন্ধ : বিভিন্ন দর্শনে নাগরিকের মর্যাদা : দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩৭

আলোচ্য বিষয়

- দর্শনভেদে নাগরিকদের মর্যাদায় পার্থক্য।
- আদর্শভেদে নাগরিকের প্রকারভেদ।
- পাশ্চাত্য দর্শন।
- Plato'র দর্শন।
- Aristotle-এর দর্শন।
- পাশ্চাত্য নাগরিকদের অধিকার অর্জনের সময়কাল।
- ফরাসী বিপ্লবোত্তর পাশ্চাত্য দর্শন।
- সমাজতান্ত্রিক মতবাদে মানুষের মর্যাদা।
- পাশ্চার্ত মতবাদে ভিন্ন সুর।
- ইসলামী দর্শনে মানুষের মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার।
- আদর্শ নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রবন্ধ : শায়খ আহমদ শরহিন্দী (মুজাদ্দেদে আলফে-সানী)র সংস্কার আন্দোলন

আলোচ্য বিষয় ৪৭

- মুজাদ্দেদের সংজ্ঞা ও কার্যক্রম।
- মুজাদ্দিদ সাহেবের উপলব্ধি।
- তাঁর শিক্ষা ও কর্মসূচি।
- মূল ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মতবাসমূহ।
- সুন্নাত ও বিদআতের প্রকারভেদ।
- পীরবাদ ও সুফিবাদ।
- শরীয়ত, তরীকত ও হাকিকত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য।
- কিয়াস ও ইজতিহাদ।
- শায়খ আহমদ সারহিন্দীর সংস্কার কর্মসূচি ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট মুজাদ্দিদের দাবিনামা।
- মুজাদ্দেদে আল-ফেসানী কেন সশস্ত্র যুদ্ধের পথে যাননি।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ : মহান সংস্কারক শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব ৫৮

আলোচ্য সূচি

- জন্ম, বংশ ও শিক্ষা জীবন।
- তাঁর মতবাদ, কর্মসূচি ও শিক্ষা।
- তাঁর রচিত বিখ্যাত কিতাবসমূহ।
- তাঁর প্রেরিত চিঠি।
- তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদ, এর উৎস এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত।
- শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের অবদান।

প্রবন্ধ : প্যান-ইসলামিক চিন্তাধারার আধুনিক প্রবক্তা সাইয়্যেদ জামাল উদ্দীন আফগানী ৬৭

আলোচ্য সূচি

- তাঁর কর্মজীবন
- তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- তাঁর বক্তব্য ও লেখনীর বিষয়।
- চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য।
- তাঁর অবদান।
- তাঁর শিক্ষা।
- তাঁর সম্পর্কে E. F. Browne'র উক্তি।
- তাঁর সম্পর্কে লর্ড ক্রোমারের প্রতিবেদন।

প্রবন্ধ : মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণের মহানায়ক ইমাম রুহুল্লাহ মোস্তাফাভী মুসাভী খোমেনী ৭৫

আলোচ্য বিষয়

- তাগুতী শক্তির গোলামী থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাই নবী, রাসূল ও ওয়ারাছাতুল আম্বিয়াদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা বান্দাহর প্রতি আরোপিত হলে জনগণ দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হয়।
- জন্ম, শিক্ষা জীবন।
- তাঁর শিক্ষকতা জীবন।
- ইরানী আলেমদের মানসগঠনে জামালউদ্দীন আফগানীর অবদান।
- ইমাম খোমেনীর রাজনীতিতে আসার কারণ।
- তাঁর আন্দোলনের ভিত্তি।

www.pathagar.com

- ইমাম খোমেনীর রাষ্ট্রচিন্তা।
- তাঁর আন্তর্জাতিক দর্শন।
- স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ।
- স্বাধীন থাকার পন্থা।
- ইরানী বিপ্লবের ধারাবাহিকতা।
- তাঁর আন্দোলন দমনে সরকারি কার্যক্রম।
- শাহ সরকারের সাংস্কৃতিক তৎপরতা।
- সরকারি কর্মপন্থার বিপরীতে দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী ও আলেমদের কর্মপন্থা।
- সশস্ত্র সংগ্রাম।
- সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও বিজয়ের সোপানসমূহ।
- রক্তাক্ত বিপ্লবের বিজয়-পূর্ববর্তী অবস্থা।
- দেশবাসীর প্রতি প্রেরিত ইমামের উল্লেখযোগ্য বাণী।
- যুক্তরাষ্ট্রের শেষ প্রচেষ্টা।
- নতুন শাসক শাহপুর বখতিয়ারের ঘোষণা।
- ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ গঠন।
- শাহের পলায়ন।
- ইমামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।
- অস্থায়ী সরকার গঠন।
- বিপ্লবের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ।
- সামরিক শাসন ঘোষণা।
- বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়।
- ইমাম কর্তৃক শাসন কাঠামো নির্মাণ।
- বিপ্লব সংরক্ষণে কর্মসূচি।
- তাঁর সাংস্কৃতিক নীতি।
- তাঁর অর্থ ও বাণিজ্য নীতি।
- ইমাম খোমেনীর অবদান।
- তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র।
- পাশ্চাত্য বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে ইমাম খোমেনী।
- তাঁর বিবাহ ও সন্তানসন্ততি।
- তাঁর বিখ্যাত বইসমূহ।
- তাঁর ইন্তেকাল ও জানাজা।
- ইমাম খোমেনী (র.) ও মার্কিন লেখক রবার্ট মাকওয়ানার ভবিষ্যদ্বাণী।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ : স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিনের রূপকার শায়খ আহমদ ইসমাইল হাসান ইয়াছিন **১১৭**

আলোচ্য বিষয়

- তাঁর জন্ম এবং অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম।
- তাঁর উদ্বাস্তু জীবন।
- শিক্ষা জীবন।
- কর্মজীবন।
- সাংগঠনিক জীবন।
- তাঁর উপলব্ধি ও জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ।
- লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন।
- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- হামাস প্রতিষ্ঠা।
- হামাসের ঘোষিত নীতি।
- তাঁর গ্রেফতার, মুক্তি ও বিজয়।
- ১ম ও ২য় ইন্তেফাদা বা গণজাগরণ।
- দ্বিতীয় ইন্তেফাদার কারণ এবং হামাস-ইসরাইল কর্মপন্থা।
- OSLO চুক্তি ও PLO'র আত্মসমর্পণ।
- ২য় ইন্তেফাদায় হামাসের কর্মসূচি।
- ২য় ইন্তেফাদা দমনে ইসরাইলী কার্যক্রম।
- হামাস-হিজবুল্লাহ সম্পর্ক স্থাপন।
- শায়খ আহমদ ইয়াছিনের হত্যা প্রচেষ্টা ও শাহাদাত।
- তাঁর হত্যায় প্রতিক্রিয়া।
- হামাস-ফাতাহ সংঘর্ষ।
- গাজা পুনর্দখলে ইসরাইলী আগ্রাসন।
- শায়খ আহমদ ইয়াছিনের ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রত্যয়, যা ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।
- আত্মঘাতি হামলার পক্ষে শায়খ আহমদের বক্তব্য।
- জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী।
- হামাসের জনপ্রিয়তার কারণ।
- হামাসের অর্থের উৎস।

প্রবন্ধ : শাহাদাতে কারবালার ঘটনাবলী ও শিক্ষা **১৩৬**

আলোচ্য সূচি

- খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন।
- মর্যাদাবান সাহাবা (রা.)দের প্রতিক্রিয়া।

www.pathagar.com

- কারবালার যুদ্ধের কারণ ও বর্ণনা।
- কারবালার শিক্ষা।
- পাপাচারী ব্যক্তি মুসলমানদের শাসক হওয়ার পরিণতি।
- কারবালার শিক্ষা ধারণ না করায় মুসলমানরা বর্তমানে ভিনজাতির ফুটবলে পরিণত হয়েছে।

প্রবন্ধ : আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই : বিজয়ের শর্তাবলী **১৪১**

আলোচ্য বিষয়

- ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনের পলাশী বিপর্যয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের চূড়ান্ত পতন শুরু হয়। ঐদিন থেকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্থান হয় হিন্দুদের পদতলে।
- অন্ধকারে নিমজ্জিত মুসলমানদের জন্য আলোর মশাল হাতে যারা এগিয়ে এলেন।
- আমাদের ১৯৪৭ সালের অর্জনকে মেনে নিতে পারেনি ব্রাহ্মণ্যবাদ শাসিত হিন্দুস্থান।
- ব্রাহ্মণ্যবাদী গোয়েন্দা সংস্থা আমাদের ইঁদুর স্বভাবের লোকদেরকে এজেন্টে পরিণত করে ১৯৪৭ এর অর্জনকে কেড়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।
- আমাদের ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার চেতনা।
- ১৯৭১-এর যুদ্ধে হিন্দু শরণার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই নগণ্য।
- প্রত্যেক জাতি-গোত্রের ঐক্যের মূলমন্ত্র ধর্ম।
- ১/১১-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শত্রু-মিত্র চিহ্নিত হয়ে গেছে।
- ৪ দলীয় জোট ও স্যালাইন তত্ত্ব।
- বিএনপির সংস্কার প্রক্রিয়া ও শেষ সুযোগ।
- বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের জন্য আগামী ১০ বছর হবে সবচেয়ে কঠিন সময়।
- ইসলামী দলসমূহে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম।
- স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি।
- বিজয়ের শর্তাবলী।

পরিশিষ্ট

১. সম্রাট আকবরের তথাকথিত 'দ্বীনে ইলাহী' ১৫৩
২. সম্রাট আকবরের বিপথগামিতার নেপথ্য কারণ ১৭১
৩. শিয়া মাজহাবী চিন্তাধারা ১৯৭
৪. কাদিয়ানী ফেরকা বা মতবাদ ২০২
৫. Pan Islamism বা বিশ্ব ইসলামীবাদ ২০৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিভিন্ন দর্শনে নাগরিকের মর্যাদা : দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিরোনামের শব্দসমূহ আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে, অতঃপর শব্দসমষ্টির শিরোনামটি সম্পর্কে এককভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করতে হবে।

'আদর্শ' প্রধানত ২টি মতবাদকে ঘিরে তৈরি হয়েছে। আল্লাহর প্রদত্ত ধর্মীয় মতবাদভিত্তিক আদর্শ এবং মানব রচিত মতবাদভিত্তিক আদর্শ। ধর্মীয় আদর্শ প্রধানত ২ প্রকার—অবিকৃত ধর্মীয় গ্রন্থভিত্তিক আদর্শ এবং বিকৃত ধর্মীয় গ্রন্থভিত্তিক আদর্শ। পবিত্র কুরআন ব্যতীত অপর কোনো ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় নেই বিধায় কুরআনের মতবাদভিত্তিক আদর্শ অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহ বারবার যুগোপযোগী করতে গিয়ে মূল থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং মানব রচিত আদর্শের সাথে একাকার হয়ে গেছে। ফলে মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদভিত্তিক আদর্শ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে কেবলমাত্র ইসলামী আদর্শ, সংস্কৃতি সভ্যতারই দ্বন্দ্ব হচ্ছে এবং আগামীতেও হবে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে একাকার হওয়ার কারণে অন্য ধর্মের আদর্শ, সভ্যতা, সংস্কৃতির সাথে মানব রচিত মতবাদভিত্তিক আদর্শ-সভ্যতা-সংস্কৃতির সুস্পষ্ট কোনো বিরোধ দেখা যাচ্ছে না। **এমতাবস্থায় আদর্শ নাগরিক বিষয়টিরও প্রকারভেদ রয়েছে। ব্যক্তিমানুষকে যে আদর্শ যেরূপ মর্যাদাবান মনে করে এবং যে নাগরিক যেরূপ আদর্শ ধারণ, লালন ও চর্চা করে—সে ব্যক্তি বা নাগরিকের আচার-ব্যবহার-স্বভাব-প্রকৃতিও সেরূপ হবে। ফলে একজনের নিকট যেটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে হয় অপরজনের নিকট তার কোনো মূল্যই হয়তো থাকে না।** আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু ব্যক্তিমানুষ বা নাগরিক সেহেতু বিভিন্ন আদর্শে বা দর্শনে মানুষের মর্যাদা কিরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে তা জানা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য দর্শন : স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য দর্শনের মূলকেন্দ্র হওয়ার কথা ছিল খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। কিন্তু ত্রিত্ববাদী রোমান পৌত্তলিকদের দলে দলে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের পর উপস্থিত সুবিধালাভের জন্য খ্রিষ্টান ধর্মসভা বা Nicen

www.pathagar.com

Council ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে আইন করে হিব্রু ভাষার বাইবেলসমূহ ধ্বংস করে এবং সবশেষে Glessian Decrec of 496-এর মাধ্যমে অসংখ্য গসপেলের সাথে বাইবেলের নির্ভরযোগ্য সংস্করণ ইভানজেলিজম বার্নাবিকেও নিষিদ্ধ করা হয়। অতঃপর তারা মূল কিতাবের পরিবর্তে গ্রীক দর্শন ও রোমান পৌত্তলিকতা সমৃদ্ধ বর্তমান বাইবেলের প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে প্রচলিত বাইবেল গীর্জা ভেদে, দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এজন্য পাশ্চাত্য দর্শনকে বুঝতে হলে গ্রীক দর্শন ও একাদশ শতক থেকে রচিত বিভিন্ন পাশ্চাত্য দর্শনকে বুঝতে হবে।

Plato'র দর্শন : Plato তাঁর The Republic (প্রজাতন্ত্র) গ্রন্থে মানবজাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। তিনি বলেন, "নাগরিকগণ! তোমরা অবশ্যই পরস্পর ভাই, কিন্তু খোদা তোমাদেরকে বিভিন্ন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের মধ্যে যাদেরকে খোদা সোনা দিয়ে তৈরি করেছেন তারা রাজত্ব করার যোগ্যতার অধিকারী, যাদেরকে রূপা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তারা শাসকদের সহযোগী, যাদেরকে পিতল ও লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তারা হস্তশিল্প, কারিগর ও কৃষিকাজ করার উপযুক্ত। (সূত্র : Morris Stockhammer, Plato Dictionary, Philosophical Library, New York, 1903, P-32)

(আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সময় Plato'র দর্শন ভারতবর্ষে পৌঁছে এবং এর আদলে রচিত হয় মনুশাস্ত্র। যেখানে বলা হয়েছে—ভগবানের মাথা থেকে যারা সৃষ্টি হয়েছে তারা সমাজ ও দেশের মাথা, দেশ শাসন ও নেতৃত্ব চলবে তাদের (উচ্চবর্ণ)। ভগবানের হাত থেকে যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তারা কায়স্থ। পূর্বোক্তদের সাহায্য করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভগবানের শরীর থেকে যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তারা বৈশ্য। মানুষের জন্য উৎপাদন করা এদের কাজ। ভগবানের পা থেকে যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তারা শূদ্র। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের পদসেবা করাই এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।)

আলেকজান্ডার ভারত ত্যাগের পর আরও ২০০ বছর পর্যন্ত তাঁর সেনাপতি ও উত্তরসূরিরা উত্তর ভারত শাসন করেছে। এ সময়কালে ভারতীয় পৌত্তলিক ও গ্রীক পৌত্তলিকরা একে অন্যের ধর্মকে একাকার করে ফেলে। ফলে বর্তমানে উক্ত গ্রীকরা ভারতীয় হিন্দুদের একটি গোত্র বা বর্ণ মাত্র। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজের পতনের পর ব্রিটিশ শাসন চালু হলে পুনরায় পাশ্চাত্য দর্শন ও হিন্দু দর্শন পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে একাকার হয়ে যায়। এজন্য আমি আলাদা করে হিন্দু দর্শন আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

www.pathagar.com

Aristotle-এর দর্শন : তিনি তাঁর গুরু Platoর উপরোক্ত মতবাদের সমর্থক। তিনি নাগরিকদেরকে প্রধানত ২ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি লিখেন, নাগরিক কেবল সেই ব্যক্তি যিনি প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। আর এই অধিকার শুধুমাত্র স্বাধীন লোকদেরই রয়েছে। সেই ব্যক্তিই স্বাধীন, যার মাতৃকূল ও পিতৃকূল উভয়েই সম্ভ্রান্ত। নাগরিক কেবল সেই ব্যক্তি, যে পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা ক্রীতদাসদের নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে, তাদের কর্মে নিয়োগ করবে এবং প্রয়োজন পূরণ করবে। (সূত্র : Politics, Aristotle, P. 364)

তিনি এ গ্রন্থে আরো লিখেছেন, "গোলামদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনের উপরও সম্ভ্রান্তদের একই প্রকার অধিকার রয়েছে। (পৃ. ১৮৫)

পাশ্চাত্যে অভিজাত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লাভের আন্দোলন শুরু হয় ১০৩৭ সালে, যার ফলশ্রুতিতে ১২১৫ সালে 'ম্যাগনা কার্টা' সনদ গৃহীত হয়। এটি ছিল রাজা ও অভিজাতদের মধ্যে সম্পর্ক ও ক্ষমতা সম্পর্কিত, সাধারণ জনগণের এতে কোনো অংশ নেই। ১৬৮৯ সালে ব্রিটেন সর্বপ্রথম নাগরিকদের জন্য অধিকার আইন প্রবর্তন করে যার নাম 'Bill of Rights'। এই আইনটি শুধুমাত্র ব্রিটেনের ভৌগোলিক পরিসীমার জন্য, দখলীকৃত অন্য কোনো দেশের নাগরিকদের এই অধিকার দেয়া হয়নি। ১৭৮৯ সালে মার্কিন কংগ্রেস 'অধিকার আইন' অনুমোদন করে এবং ফ্রান্স 'মানবাধিকার' ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি এবং ১৯৪৭ সালে ফ্রান্স ও জাপান নিজেদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ 'মানবাধিকার সনদ' ঘোষণা করে। এই ঘোষণা দ্বারা অমুসলিম দেশগুলি জানতে পারে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা কি? জাতিসংঘ ঘোষিত এ মানবাধিকার সনদ কোনো দেশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এজন্য এ সনদ বাস্তবায়নের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি জাতিসংঘ।

ফরাসী বিপ্লবোত্তর পাশ্চাত্য দর্শন : ফরাসী বিপ্লবের পর পাশ্চাত্যে অসংখ্য সামাজিক রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ক ডাক্তার বা দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের কেউ বলল—মানুষের পূর্বপুরুষ বানর ছিল, কেউ বলল—মানুষের সকল কাজের অনুপ্রেরণা আসে যৌনতা থেকে, কেউ বলল—মানুষ উৎপাদনের উপকরণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ইউরোপের নব্য রাজনৈতিক হাতুড়ে ডাক্তারগণ নিত্যনতুন দর্শন-মতবাদ রচনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু করে। তাদের কেউ সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার

www.pathagar.com

হাতে অর্পণ করে, কেউ তা দেয় প্রজার হাতে, কখনো ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের হাতে, কখনো সংখ্যাগুরুদের নিকট থেকে সংখ্যালঘুদের হাতে, কখনো প্রশাসনের নিকট থেকে পার্লামেন্টের হাতে, কখনো বিচার বিভাগের হাতে। এভাবে শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক করে জনগণকে, কিন্তু তা চলে যায় প্রশাসনের হাতে অথবা দলীয় প্রধানের হাতে।

তাদের এ সকল অস্থিরচিত্ততার কারণ হলো পাশ্চাত্য দর্শনের কোনো স্থায়ী ও বিশ্বজনীন উৎস ও মানদণ্ড নেই। এজন্য সেখানে ব্যক্তির অধিকারসমূহ কোনো স্থায়ী মূল্য ও মর্যাদার বাহক নয়। উদ্ভূদ পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের সনদ সরবরাহ করে। ফলে আজ যাকে মৌলিক অধিকার বলে সনদ দেয়া হয়, গতকাল পর্যন্ত তা মৌলিক অধিকার ছিল না। পরিস্থিতি পাল্টে গেলে সনদেও পরিবর্তন আসে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদে মানুষের মর্যাদা : এ মতবাদটিও যেহেতু পাশ্চাত্যের আবিষ্কার এবং এ মতবাদের অধীনে পৃথিবীর ২৪টি দেশ ৩০ থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত শাসিত হয়েছিল এবং এখনও উক্ত মতবাদের কমরেডগণ পৃথিবীর সব দেশে জীবিত আছে সেজন্য এ মতবাদটিও আলোচনার দাবি রাখে। এ মতবাদের মূল কথা হলো—এই জীবন দর্শন নিরেট বস্তুবাদী। বিশ্বের অন্যান্য জড় পদার্থের মতো মানুষ একটি জড় জীব। তার মূল্য-মর্যাদা তার সৃজনশীল যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। উৎপাদনের উপকরণের চেয়ে অধিক কোনো মর্যাদা মানুষের নেই। ধর্ম-চরিত্র-নৈতিকতা, আত্মা, ঈমান, আখেরাত এবং এ ধরনের অন্যসব পরিভাষা সাধারণ মানুষকে শোষণের জন্য পুঁজিপতি ও তাদের এজেন্টদের আবিষ্কার।

পাশ্চাত্য মতবাদে ভিন্ন সুর

গ্রীক দার্শনিক জেনো (৪৯০-৪৩০ খ্রি.পূর্ব) সর্বপ্রথম সেদেশে মানুষের মর্যাদার বিষয়ে সোচ্চার হন। এ উপলক্ষে তিনি 'প্রাকৃতিক আইনের মতবাদ' প্রচার করেন। এই আইনের মূল কথা ছিল—"প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে চিরন্তন। তার প্রয়োগ কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর শুধু নয়—প্রতিটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের এটি প্রাপ্য। বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়ার কারণেই এটি মানুষের প্রাপ্য।" তবে প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে পাশ্চাত্য তার এই দর্শন থেকে উপকৃত হতে পারেনি।

রোমের প্রসিদ্ধ আইনবিদ সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রি.পূর্ব) প্রাকৃতিক বিধান মতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, "এই বিধান সামগ্রিকভাবে প্রয়োগযোগ্য। এটি স্থায়ী মূলনীতি, যার পরিবর্তন করা অপরাধ। এর কোনো অংশ রহিত

www.pathagar.com

করার প্রচেষ্টা গ্রহণের অনুমতি দেয়া যায় না। একে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সম্ভব নয়। সিনেট অথবা জনসাধারণের মতামতের দ্বারা আমরা এর আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে পারি না। রোম এবং এথেন্সে পৃথক আইন হতে পারে, উভয় ভূখণ্ড আলাদা দেশ হতে পারে, কিন্তু একটি স্থায়ী পরিবর্তন অযোগ্য আইনই সব জাতি ও সব যুগের জন্য বৈধ ও কার্যকর হতে পারে।"

তিনি আইন ও বিধানের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং বলেন, "সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষের জন্য সমান ও অভিন্ন, তিনিই তাদের প্রভু ও সম্রাট। তিনিই এ বিধান দিয়েছেন। এ বিধানের আনুগত্য না করলে মানুষ স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধাচারী হয় এবং কঠোর শাস্তি তার জন্য অবধারিত হয়। (সূত্র : A.K. Brohi, Fundamental Law of Pakistan, Karachi-1958, P. 733)

খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ নিজেদের বৈষয়িক সুবিধার্থে নিজেদের ধর্মগ্রন্থে বারবার পরিবর্তন আনার ফলে পাশ্চাত্য দর্শনে জেনো ও সিসেরোর মতবাদসমূহ উপেক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য ভোগবাদী, সুবিধাবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনে সম্পৃক্ত হয়। দর্শনের আত্মা খোদাভীতি পাশ্চাত্য থেকে বিদায় নেয়—কেবল শরীর বা জড় অবশিষ্ট থাকে।

ইসলামী দর্শনে মানুষের মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার

মানুষের মর্যাদা : আল্লাহ প্রেরিত প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলগণ ছিলেন ইসলামের বার্তাবাহক। তারা কেউ আল্লাহর পক্ষ থেকে সহীফা (পুস্তিকা) পেয়েছেন এবং কেউ আসমানী কিতাব পেয়েছেন। যাঁরা উভয়ের কোনোটি পাননি তাঁরা পূর্ববর্তী নবী বা রাসুলের প্রদর্শিত পথে মানুষকে পরিচালনা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদমকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেন এবং ফেরেস্তাদেরকে নির্দেশ দেন আদম (আঃ)কে সিজদা করতে। এভাবে তিনি সৃষ্টি জগতের সামনে মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা ঘোষণা করেন।

প্রতিটি আসমানী কিতাবে ব্যক্তিমানুষ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য তিনি স্বাধীন, পরাধীন, জিম্মি, দাস, নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের অধিকার তাঁর কিতাবসমূহে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর দাসত্ব করতে এবং অপর কাউকে হুকুমদাতা, মাবুদ বা মালিক হিসেবে মান্য করতে নিষেধ করেছেন। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার সমান বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আল্লাহকে ইলাহ মানলে অপর কেউ মানুষের মালিক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে জুলুম-নির্যাতন-অধিকার হরণ করতে পারবে না। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য

www.pathagar.com

সকল দর্শনে ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা তথাকথিত দার্শনিকের স্বকপোলকল্পিত ও অস্থায়ী, পক্ষান্তরে ইসলামে ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও স্থায়ী। কোনো কর্তৃপক্ষ এই অধিকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার এখতিয়ার রাখে না। গ্রীক দার্শনিক জেনো এবং রোমান আইনবিদ সিসেরা আল্লাহর এই শিক্ষার বিষয়ে জনগণকে জানালেও পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী, বস্তুবাদী, জড়বাদী ও সমাজবাদী দর্শন উক্ত মহান দার্শনিকের মতবাদকে গ্রহণ না করে নিজেদের বৈষয়িক সুবিধার্থে স্বকপোলকল্পিত মতবাদের ফাঁদে জনগণকে অষ্টপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার আয়োজন করে ব্যক্তিমানুষ ও মানবজাতির দুর্ভোগের কারণে পরিণত হয়েছে। এজন্যই দেখা যায় ইসলামী দর্শনে বিশ্বাসী মুসলমান খলিফা, রাজা, বাদশাহ, একনায়ক মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে দেশ শাসন করেছেন, অপরদিকে মুসলিম নামধারী কিন্তু অমুসলিম দর্শনে বিশ্বাসী শাসকরা ও অমুসলিম শাসকরা ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়ে ব্যক্তিমানুষের অধিকারকে পদদলিত করে অত্যাচারী শাসন পরিচালনা করেছেন এবং করছেন।

ইসলামে বিশ্বাসী নাগরিক ও শাসকগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যক্তিমানুষের অধিকারসমূহ রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। অপরদিকে কল্পিত মতবাদের অনুসারীরা সাময়িক সুবিধার লোভে রাজার সার্বভৌমত্বের নামে, জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে, দলীয় সার্বভৌমত্বের (সমাজতন্ত্র) নামে, শাসকের সার্বভৌমত্বের নামে, ব্যক্তিমানুষের অধিকারকে পদদলিত করে। এজন্যই দেখা যায়, ইসলাম ব্যতীত অপরাপর দর্শনের ধারকগণ বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন করে ব্যক্তিমানুষের অধিকার হরণ করে বা স্থগিত করে। **ইসলামী দর্শনে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ—অপরাপর দর্শনে সার্বভৌম ক্ষমতা দর্শনভেদে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের হাতে আরোপিত হয়। ফলে অন্যান্য দর্শনে কোনো অধিকারই স্থায়ী নয়। আল্লাহ ব্যক্তিমানুষের জন্য, মানবজাতির জন্য যেসকল অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেসকল অধিকার ব্যক্তিমানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুস্পষ্ট আইন প্রদান করেছেন, ফলে ইসলামী শাসকরা এসব অধিকারের বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়নের এখতিয়ার রাখে না।**

মৌলিক অধিকার ব্যতীত অপরাপর যেসব বিষয়ে আল্লাহ সুস্পষ্ট বিধান নাজিল করেননি, রাসুল (সঃ)-এর হাদীসে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ নেই, কেবলমাত্র সেসব ব্যাপারেই ইসলামী সরকার ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এজন্য আল্লাহ নির্ধারিত ব্যক্তিমানুষের অধিকারকে Fundamental Rights বলা হয় এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অর্জিত অধিকারকে Legal Rights বলে। মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম রাষ্ট্রের বিপরীতে নাগরিককে নিরাপত্তা প্রদান করে। আইন পরিবর্তন বা

www.pathagar.com

বাতিলের মাধ্যমে লিগ্যাল রাইটস পরিবর্তন, সংকোচন বা বাতিল করা যায়। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য দর্শনে সকল অধিকারই Legal Rights হিসেবে গণ্য করা হয় এবং আইনের মাধ্যমে নাগরিককে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়।

ইসলামী দর্শনে নিশ্চিত অধিকারসমূহ

ইসলামী দর্শনে অধিকার সমূহ ২ প্রকার। যথা—নৈতিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার। নৈতিক অধিকারের উদাহরণ হলো ছোটদের স্নেহ করা, মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে সেবা করা ও মেহমানদারী করা। মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নৈতিক অধিকার আদায় করে। কেউ ছোটদেরকে স্নেহ না করলে বড়দেরকে সম্মান বা অসম্মান না করলে, দুস্থদের সেবা না করলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য করতে পারবে না। এরূপ বিষয়গুলি ইসলামী নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে আল্লাহ নির্ধারিত মৌলিক অধিকারসমূহের ব্যাপারে ইসলামী আদালত সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অধিকার প্রদানে বাধ্য করতে পারে।

ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ

জীবনের নিরাপত্তা : ইসলামের দৃষ্টিতে শাসন কর্তৃপক্ষ দ্বারা ৬টি কারণে মানুষ হত্যা করা যায়। এর বাইরে কাউকে হত্যা করা যায় না এবং আত্মহত্যাও করা যায় না। যুদ্ধ চলাকালীন নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুদ্ধে লিপ্ত নয় এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানকে, মুমিন মুসলমানকে, অমুসলিম জিম্মিকে, চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি বা গোত্রকে, কন্যা শিশুকে, একজনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে অপরজনকে, আত্মসমর্পণকারীকে, আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা যায় না। বিচারে দোষী সাব্যস্থ হওয়ার পূর্বে কাউকে আটক রাখাও নিষেধ।

মালিকানার নিরাপত্তা : প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পদ ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে, সম্পদ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে, নিজ সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবে, স্বীয় মালিকানাধীন স্বত্ব রক্ষা করতে পারবে, অন্য কোনো নাগরিক বা রাষ্ট্র আইনগত অধিকার ছাড়া কোনো ব্যক্তির মালিকানা থেকে তার কোনো সম্পদ নিতে পারবে না।

মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা : ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের মানহানি করতে পারবে না। কাউকে উপহাস করা, কাউকে অপবাদ দেওয়া, দোষারোপ করা, মন্দ নামে ডাকা এবং জনস্বার্থের ক্ষতি না হলে কারও গোপনীয়তা ফাঁস করা

www.pathagar.com

যাবে না। গীবত করা বা অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা যাবে না। বিচার ব্যতীত কাউকে আঘাত করা যাবে না। কেউ কাউকে অপমানিত হতে দেখলে তাকে সাহায্য করতে হবে।

ব্যক্তিগত জীবনের নিরপত্তা : ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। অনুমতি ব্যাতিত কারো বাড়িতে ও ঘরে প্রবেশ করা যাবে না, উঁকি দেয়া যাবে না, অন্যের বাড়িতে অনর্থক আড্ডা দিয়ে তার সময় নষ্ট করা যাবে না, কারো পিছনে গুপ্তচর নিয়োগ করা যাবে না।

একজনের কার্যকলাপের জন্য অপরজনকে দায়ী করা যাবে না : এক ব্যক্তির অপরাধের জন্য তাকে ব্যতীত তার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব বা গোত্রকে হয়রানি করা যাবে না।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। আবু দাউদ ও তিরমিযী শরিফে রয়েছে—রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "মানুষ যদি অত্যাচারীর অত্যাচার ও জুলুম দেখেও তাকে প্রতিহত না করে তাহলে আল্লাহর ব্যাপক শাস্তি তাদের উপর নাজিল হবে।"

মত প্রকাশের স্বাধীনতা : অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে অবাধে মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে নাগরিকদের। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো জালেম শাসকের সামনে নায্য কথা বলে তার জিহাদই সর্বোত্তম।"

বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা : ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের বিবেক, বিবেচনাবোধ ও ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা রয়েছে। অপরের ধর্ম বিশ্বাসকে কটাক্ষ করা, নিন্দা করা, ক্ষতি করা ইসলামে নিষেধ। প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলবে, আমল করবে কিন্তু অন্য ধর্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত করবে না।

সমান অধিকার : ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, জাতি, দেশ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের সমানাধিকারের পক্ষে। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বংশ, গোত্র বা বর্ণ নয়—মাপকাঠি হলো খোদাভীতি বা তাকওয়া। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমরা সবাই আদমের সন্তান (বংশধর) আর আদম মাটির তৈরি।"

ন্যায়বিচার লাভের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। কাউকে ফাঁসানোর জন্য, অপরাধ থেকে বাঁচানোর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্যই সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। বিচারের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-ধনী-

www.pathagar.com

গরিব, আশরাফ-আতরাফ, স্বজাতি-বিজাতি, আত্মীয়-অনাত্মীয় পার্থক্য করা যাবে না।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার : প্রত্যেক নাগরিককে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়া প্রথমতঃ রাষ্ট্রের দায়িত্ব, অতঃপর সমাজের দায়িত্ব, অতঃপর প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব।

পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার অধিকার : কোনো নাগরিককে পাপাচারে প্ররোচিত করা, বাধ্য করা যাবে না। পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের সহযোগী হতে হবে।

রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নীতিমালা নিম্নরূপ :

১. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান (আমীর) এবং তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ সাধারণ নাগরিকের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে।
২. জনসাধারণ শাসকদের গঠনমূলক সমালোচনা করবে, নিজেদের মতপার্থক্য তুলে ধরবে ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবে।
৩. নির্বাচিত শাসকগণ জনগণের সামনে দেশের সার্বিক অবস্থা ও সমস্যাবলী তুলে ধরবে, যাতে জনগণ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে শাসকদের পরামর্শ দিতে পারে।
৪. জনগণ যাকে চাইবে সে সরকার পরিচালনা করবে, যাকে চাইবে না তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে।

স্থানান্তর গমন ও বসবাসের স্বাধীনতা : রাষ্ট্রের নাগরিকগণ দেশের যে কোনো স্থানে অথবা দেশের বাইরে বসবাসের জন্য স্থানান্তরিত হতে পারবে।

পারিতোষিক ও বিনিময় (মজুরি) লাভের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে চাষী ও শ্রমজীবীদেরকে ন্যায়সঙ্গত মজুরি বা বিনিময় দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের আর্থিক বা দৈহিক ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মজুরি প্রদান ব্যতীত কাউকে শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না। শ্রমিকদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, তারা যেন বিশ্বস্ততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করে।

উপরোক্ত মৌলিক অধিকারসমূহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ন্যায্য পাওনা। ভিন্ন ধর্মের লোকেরা যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র কনসেপ্ট (ধারণা) বিশ্বাস করে না তাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী পদে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত পদে অমুসলিমদেরকে দায়িত্ব দেয়া যাবে না। এসব পদে কেবল ইসলাম বিশ্বাসীদের নিয়োগ দেয়া যাবে। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা নিরাপত্তা কর (জিজিয়া)-এর বিনিময়ে সার্বিক নিরাপত্তা ভোগ করবে এবং চুক্তিবদ্ধ নাগরিকগণ চুক্তি অনুযায়ী অধিকার ভোগ করবে।

www.pathagar.com

আদর্শ নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপরোক্ত নৈতিক অধিকার, আইনগত অধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহ জানা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। প্রত্যেকে যাতে এই অধিকার ভোগ করতে পারে, কেউ যেন বঞ্চিত না হয়, কারও অধিকারে কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে জন্য সদা-সর্বদা সজাগ-সতর্ক থাকা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আদর্শ রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কর্তব্য।

চট্টগ্রাম, ১০.০১.২০১৫

www.pathagar.com

শায়খ আহমদ সারহিন্দী (মুজাদ্দেদে আলফে-সানী)র সংস্কার আন্দোলন

আহম্মদ সারহিন্দী (র.) ৯৭৫ হিজরীতে (১৫৬৩ খ্রি.) পাঞ্জাবের তৎকালীন পাতিয়ালা রাজ্যের বিখ্যাত সারহিন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (র.)-এর ২৮তম অধঃস্তন বংশধর। তাঁর বয়সকাল ছিল রাসূল (স.)-এর ন্যায় ৬৩ বছর। তাঁর জীবন ও কর্ম তাঁকে সত্যিকারের ওয়ারাছাতুল আম্বিয়ার মর্যাদা দান করেছে। তিনি হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন, তবে ইমাম শাফেয়ীকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন এবং কোনো কোনো আমল ইমাম শাফেয়ীর তরীকায় সম্পাদন করতেন।

ফসলের ক্ষেতে যেরূপ আগাছা জন্মায় এবং উক্ত আগাছা যথাযথরূপে উৎপাটন না করলে যেভাবে ফসলের মাঠ আগাছার মাঠে পরিণত হয় ঠিক তদ্রুপ ইসলাম নামক শস্যক্ষেত্রেও শিরক, বেদাত, কুফরীসহ বিভিন্ন আগন্তুক মতবাদের আগাছা জন্মায় অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আগাছার বীজ ছড়িয়ে দেয়া হয়, যাতে ইসলামের বাগান বাতিলের বাগানে পরিণত হয়।

এমতাবস্থায় যে ধর্মনেতা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ ও রাসূল (স.)কে অনুসরণ করে ইসলামের বাগানকে আগাছামুক্ত করার দায়িত্ব পালন করেন তাঁকে বলা হয় মুজাদ্দেদ বা সংস্কার কর্তা।

মুজাদ্দেদ কোনো দাবি করার জিনিস নয়—করে দেখানোর জিনিস। শতাব্দীব্যাপী কুসংস্কার ও অনাচারে ইসলামের সত্য-সুন্দর রূপ আচ্ছন্ন হয়ে বিকৃত হয়ে পড়লে যে মনীষী তাঁর অনুপম পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞান, বিপুল কর্মশক্তি, দুর্জয় সাহস, তেজোদীপ্ত কণ্ঠ এবং ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে জঞ্জাল, আবর্জনা ও আগাছা মুক্ত করে ইসলামের সত্য-সুন্দর রূপের বিকাশ ঘটাবেন এবং যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন তিনিই মুজাদ্দিদ বলে পরিগণিত হন। তাঁর কার্যসীমা মাদ্রাসা কিংবা খানকার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাঁর জীবন কেবল আনুষ্ঠানিক

www.pathagar.com

ইবাদাত-বন্দেগী, মুরাকাবা-মুশাহাদাতে ব্যয় হবে না বরং তাঁর কাজের ধরন হবে ভিন্নতর। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে চিঠির মাধ্যমে বলেছিলেন, "বৎস, আমাকে সৃষ্টি করার পিছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে—তা সত্ত্বেও আর একটি বিশাল কারখানা আমার জিম্মায় দেয়া হয়েছে। পীর-মুরিদী করার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়নি। মুরীদদের তারবিয়ত এবং মানুষের ইরশাদও এর উদ্দেশ্য নয়। সেটা ভিন্ন এক ব্যাপার এবং অন্য এক কারখানা। এর সাথে যে সম্পর্ক রাখবে সে উপকৃত হবে। অন্যথায় নয়। আমার উপর যে কারখানাটির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে—তার মোকাবিলায় তারবিয়ত ও ইরশাদ এমন একটি ব্যাপার—যেমন রাস্তায় পতিত কোনো বস্তু।" (পত্র নং-৬, ২য় খণ্ড)

শেখ আহমদ সারহিন্দী ছিলেন একজন যুগনায়ক, মরদে মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদ। ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের এক মহাসংকটকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় সাধনা ও কর্মশক্তি গুণে জাতির ইতিহাসে মুজাদ্দিদে আলফেসানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ) নামে পরিচিত হন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) বলেন—"আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর অবসানকালে এমন একজন ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি উম্মতের স্বার্থে তাঁর দ্বীনের সংস্কার সাধন করবেন।"

মুজাদ্দিদ সাহেবের উপলব্ধি ও শিক্ষা

সম্রাট আকবর রাজত্ব করেন ১৫৫৬ থেকে ১৬০৬ খ্রি. পর্যন্ত। আহমদ সারহিন্দের জন্ম ১৫৬৩ খ্রি. এবং ইন্তেকাল ১৬২৪ খ্রি.। সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খ্রি. সিংহাসনারোহণ করেন। সুতরাং আহমদ সারহিন্দ এই উভয় প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটদের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করেন। মুজাদ্দেদ (র.) যখন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তখন সম্রাট আকবরের চূড়ান্ত উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শানশওকতের কাল। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য আকবর তখন ইরান থেকে বিতাড়িত বিদ্আতপন্থী শিয়া ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ঠাকুর-পুরোহিতদের পরামর্শে সঠিক ইসলামকে নির্বাসনে পাঠিয়ে 'দ্বীনে ইলাহী' নামক কুফরী ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় শেখ আহমদ সারহিন্দ অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো প্রথমে রোগীর রোগের কারণ নির্ণয় করেন এবং অতঃপর রোগমুক্তির দাওয়াই সংগ্রহ করে প্রয়োগ করা শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি সফলতার দিকে এগিয়ে যায় এবং মুরতাদ আকবর শেষ জীবনে তওবা করে নিজ ধর্মে ফিরে আসেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্যায়ক্রমে সংশোধিত হয়ে এক পর্যায়ে শেখ আহমদ সারহিন্দের মাধ্যমে ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করেন ও শরীয়া আইন পুনর্বহাল করেন।

www.pathagar.com

মুজাদ্দিদ (র.) রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে দেখতে পান তৎকালীন ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মুসলমান মূল ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে মনগড়া ইসলাম অনুসরণ করছে। জাতির আলেমগণ তখন দুনিয়াদারীর লোভে পথভ্রষ্ট ও বিপদগামী। বিদায়াত, পীরবাদ, সুফীবাদ আলেম ও জনসাধারণকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে গেছে। আল্লাহর খলিফারা তখন পীরের খলিফা ও বাদশাহর মোসাহেবে পরিণত হয়েছে। দুনিয়াদার দরবারী আলেম, বিকৃত শিয়া মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী কূটচালে সম্রাট আকবর তখন পথভ্রষ্ট হয়ে ইসলাম বিরোধী 'দ্বীনে ইলাহী' ধর্ম চালু করেছেন। এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্য পূজা, নক্ষত্র পূজা ও শক্তি পূজায় ব্যস্ত। ইসলামের সকল স্তম্ভের উপর আকবর প্রচণ্ড হামলা করে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। অগণিত মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে, অনেকগুলোকে মন্দিরে পরিণত করা হয়েছে। ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম পালন আকবরী শাসনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। **এমতাবস্থায় মুজাদ্দেদ (র.) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সকল রোগ, দুঃখ-দুর্দশা ও অধঃপতন থেকে রক্ষা পাওয়ার মহৌষধ একটাই—আর তা হলো মূল ইসলামের দিকে ফিরে আসা। কেবল এর মাধ্যমেই মুসলমানগণ পুনরায় জেগে উঠবে এবং বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।**

১. মূল ইসলামের দিকে ফিরে আসতে হবে—

তিনি লিখেন, একটি বৃক্ষ যত বড়ই হোক মূলের সাথে তাকে সংযোগ বজায় রাখতেই হবে। তাহলেই সে মূল থেকে রস/জীবনীশক্তি টেনে নিতে সক্ষম হবে এবং উর্ধ্বাকাশ ও প্রকৃতি থেকে সূর্যালোক ও নাইট্রোজেন গ্রহণ করে সতেজ থাকতে পারবে। সুস্থ সতেজ অবস্থায় গাছ কখনো উর্ধ্বাকাশ ও প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর কোনো জিনিস গ্রহণ করে না। এভাবেই একটি গাছ বেঁচে থাকে এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়। কিন্তু মূলের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বৃক্ষ উর্ধ্বাকাশ থেকে যত খাদ্যই গ্রহণ করুক না কেন তার মৃত্যু অনিবার্য।

ইসলাম ও মুসলমানদের মূল হলো কুরআন ও রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ। ইসলাম রূপ বৃক্ষটির সাথে যদি এর মূলের নিবিড় সংযোগ থাকে তবে সে এই মূল থেকেই রস/জীবনী শক্তি আহরণ করবে এবং প্রয়োজনবোধে পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করবে, অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যাগ করবে। এভাবেই সে নিজেকে জীবন্ত, সতেজ ও পরিপূর্ণ রাখবে। **মুসলমানদের অনুকরণীয় আদর্শ হলো ইসলাম। তাদের ব্যক্তিক, সামষ্টিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাবধারা এবং কার্যক্রম এই আদর্শের উপরই নির্ভরশীল। যতদিন তারা এই আদর্শের উপর কায়েম থাকবে ততদিন তারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ**

www.pathagar.com

জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবে। বিশ্বের নেতৃত্ব তারাই দিবে, কর্তৃত্ব তারাই করবে। কিন্তু মূল থেকে সরে গেলে তারা আর জীবন্ত জাতি হিসেবে টিকে থাকতে সক্ষম হবে না। মূলের সাথে সংযোগহীন বৃক্ষের ন্যায় অন্য জাতির জ্বালানি কাঠে পরিণত হবে। বিশ্বে তারা একটি নিকৃষ্ট, নিপীড়িত, নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত জাতিতে পরিণত হবে। জ্বালানি কাঠের ন্যায় অন্যের কাজে, অন্যের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হবে। নিজ জাতির কোনো কাজে আসবে না। এমনকি কুঠারের হাতল হয়ে স্বজাতির ধ্বংস সাধনে ব্যবহৃত হবে।

২. মূল ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মতবাদসমূহ পরিত্যাগ করা—

তিনি মূল ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মতবাদসমূহকে চিহ্নিত করেন। এগুলো হলো—বিদা'ত, পীরবাদ, সুফীবাদ ও বিজাতীয় মতবাদ। এসকল বিষয়ে তার বক্তব্য হলো—

ক. বিদা'ত : ইসলামে যদি কেউ নতুন কোনো কিছুর উদ্ভাবন বা সংযোজন করে যা তাতে (ইসলামে) নেই তবে তা বিদআত। এ প্রসঙ্গে তিনি রাসূল (র.)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণের সময় নাজিল হওয়া পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াত—("আল্ইয়াত্তমু আক্মালতু লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নে'মাতা, ওয়ারাদীতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা"; যার অর্থ আজ আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর দ্বীন (জীবন বিধান) হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।) উল্লেখ করে বলেন, যে বস্তু পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাতে বাইরের কোনো বস্তুর জন্য সামান্য কোনো স্থান থাকতে পারে না। যদি স্থান থাকে তবে সে পূর্ণ নয়—অপূর্ণ। আর পূর্ণ পানির গ্লাসে বাইরের কিছু প্রবেশ করালে সেখান থেকে মূল পানি বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট পানি ভেজালে পরিপূর্ণ হবে। তিনি আরো বলেন, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (স.)-এর হাদীসে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ কিংবা আমল ও আকীদা ছাড়া অন্য কোনো উদ্ভাবিত বিষয়ের স্থান ইসলামে নেই। কুরআন সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যহীন কোনো কিছু ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট হলে, কিংবা করানো হলে তা হবে সম্পূর্ণ বেদআত—স্থান বিশেষে শিরক ও কুফর।

খ. বেদআতে হাসানা ও সাইয়্যাহ্

মুজাদ্দেদ (র.) বেদআতে হাসানা ও সাইয়্যাহ্ নামক বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, সকল বেদআতই অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ৩টি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। যার অনুবাদ হলো—

www.pathagar.com

১. ইসলামে যদি কেউ নতুন কোনো কিছুর উদ্ভাবন করে, যা তাতে (ইসলামে) নেই তবে তা পরিত্যাজ্য।

২. রাসূল (স.) বলেছেন—তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য—আমার ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুযায়ী চলা। তা থেকেই দলিল প্রমাণ নিবে এবং তাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। নব-উদ্ভাবিত আমল বেদআত, প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহী ও ভ্রান্তি।

৩. হযরত হাস্‌সান (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন, জাতি যদি নিজের দ্বীনে কোনো বেদাআত সৃষ্টি করে তাহলে আল্লাহ তাদের থেকে ঠিক অনুরূপ একটি সুন্নাতকে ছিনিয়ে নেন। এরপর সেই সুন্নাত কেয়ামত পর্যন্ত আর তাদের কাছে ফেরত আসে না।

গ. সুন্নাত ও বিদআ'তের প্রকারভেদ

মুজাদ্দেদ (র.) বলেছেন, রাসূল (স.)-এর সব আমল দুই ধরনের ছিল। (১) ইবাদাতের পর্যায়ভুক্ত, (২) অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত।

১. রাসূল (স.) যেসব আমল ইবাদাত হিসেবে করেছিলেন তার বিপরীত আমলই বেদআত-ই-মুনকার (অবশ্যই নিষিদ্ধ)। এর প্রতিরোধ ও গতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো সাচ্চা উম্মতের কর্তব্য।

২. রাসূল (স.) যেসব কাজ দেশপ্রথা ও অভ্যাস হিসেবে করতেন তার বিপরীত কাজকে আমি (মুজাদ্দেদ) বেদআতে মুনকার মনে করি না। এর প্রতিরোধ ও গতিরোধে অপ্রয়োজনীয় প্রয়াসও চালাই না। কেননা, দ্বীনের সাথে এ কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। তার উদ্ভব প্রচলিত প্রথার কারণেই হয়েছিল—দ্বীন ও মিল্লাতের কারণে নয়।

তিনি (মুজাদ্দেদ) আরো বলেছেন, প্রত্যেক বেদআতী ও বিভ্রান্ত ব্যক্তি স্বীয় বাতিল আকিদার যথাযোগ্যতা প্রমাণের জন্য কুরআন ও সুন্নারই আশ্রয় নিয়ে থাকে ও দোহাই পাড়ে। অথচ নিঃসন্দেহে তা নিস্ফল ও নিরর্থক। এজন্য সর্বাগ্রে আকায়েদ পরিশোধন নেহায়েত জরুরি। এরপর হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজিব প্রভৃতি শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, তারপর তদানুযায়ী আমল এবং এরপরেই তাজকিয়ার (আত্মার বিশুদ্ধকরণ) স্থান।

ঘ. পীরবাদ

এ সম্পর্কে মুজাদ্দেদ (র.) বলেছেন, পীরবাদ দ্বারা আল্লাহর খলিফারা মানুষের খলিফা হয়ে যায়। আলাদা হয়ে যায় শরীয়ত থেকে তরীকত। শরীয়তের

www.pathagar.com

অধীনে না হলে যে কোনো তরীকতই সুস্পষ্ট গোমরাহী। পীরবাদীরা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অনুসরণের পরিবর্তে পীরের অনুসরণ করে গোমরাহ হয়।

ঙ. সুফীবাদ

এ সম্পর্কে মুজাদ্দেদ (র.)-এর বক্তব্যের সারকথা হলো, পথভ্রষ্ট সুফীবাদের মাধ্যমে মহাবিপ্লবী মুসলমানেরা হয়ে যায় মহাধ্যানী, মহাযোগী বা বৈরাগীতে। বনের রাজা সিংহরা পরিণত হয় গৃহপালিত বিড়ালে।

মূল ইসলামে উপরোক্ত ক্ষতিকর মতবাদসমূহের অনুপ্রবেশের ফলে সম্রাট আকবরের আমলে ভারতবর্ষের আলেম সমাজ ও মুসলমানদের বেশির ভাগ সদস্যই ঈমান ও আমল হারিয়ে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছিল। আকবর এ সকল গোমরাহ সুফী (বিড়াল)দেরকে শুঁটকী দিয়ে, পীরদেরকে শিরনী দিয়ে, বেদাআতীদেরকে অপকর্মের লাইসেন্স দিয়ে নিজের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের সহযোগীতে পরিণত করেছিল। এ জন্যই সম্রাট আকবরের আমলে ভারতবর্ষের পীর-সুফী বেদআতীরা আকবরের ইসলামবিরোধী অপকর্মের প্রতিবাদ করেনি এবং সঠিক ইসলামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য আকবরের সহযোগী হয়েছিল।

মুজাদ্দেদ (র.) সাহেবের আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণকারী ও তৃতীয় পুত্র খাজা মাসুম বলেছেন—

তিন ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে—

১. দায়িত্বে অবহেলাকারী আলেম।

২. শরীয়তবিরোধী দরবেশ।

৩. মূর্খ সুফী।

তিনি আরো বলেছেন—

যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দীক্ষা দানকারী পীরের আসনে আসীন হয়েছে অথচ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাতের অনুসারী নয় এবং শরীয়তের অলঙ্কারে সুসজ্জিত নয়—তার থেকে দূরে অবস্থান করিও... সে আত্মগোপনকারী চোর এবং শয়তানের এজেন্ট।

৩. শরীয়ত, তরীকত ও হাকিকত সম্পর্কে মুজাদ্দেদ (র.)-এর বক্তব্য

শরীয়তের তিন অংশ—জ্ঞান (ইলম), কর্ম (আমল) ও একাগ্রতা বা নিষ্ঠা (ইখলাস)। যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিনটির সম্মিলন না হলো ততক্ষণ শরীয়ত হলো না। যখন শরীয়ত প্রমাণিত ও বাস্তবায়িত হয়ে গেল, আল্লাহর সন্তুষ্টিও হাসিল

www.pathagar.com

হয়ে গেল। ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় সৌভাগ্যের চাবিকাঠি একমাত্র শরীয়ত।

তরীকত ও হাকিকত (আধ্যাত্মিকতা) সুফীদের বৈশিষ্ট্য গুণ। কিন্তু এ দুটি জিনিস শরীয়তের তৃতীয় অংশ অর্থাৎ ইসলাম এর পূর্ণতার জন্য শরীয়তের খাদেম বিশেষ। শরীয়তের পূর্ণতা বিধানই হচ্ছে তরীকত ও হাকিকতের একমাত্র উদ্দেশ্য।

৪. কেয়াস ও ইজতিহাদ

এ প্রসঙ্গে মুজাদ্দিদ (র.)-এর বক্তব্যের মূল কথা হলো—কেয়াস (অনুমান) ও ইজতিহাদের কোনো সম্পর্ক বেদআতের সঙ্গে নেই। কেয়াস ও ইজতিহাদ অতিরিক্ত কোনো কিছুর সৃষ্টি করে না। বরং তা একমাত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্মার্থকে প্রকাশ করে থাকে।

শায়খ আহমদ সারহিন্দীর সংস্কার কর্মসূচি

তিনি সহজ-সরল-বোধগম্য ভাষায় তাঁর উপলব্ধি ও সিদ্ধান্ত মৌখিক ও লিখিত আকারে জাতির সামনে তুলে ধরেন। তিনি বুঝেছিলেন মূল ইসলাম ধর্মে অন্যান্য বিষয় অনুপ্রবেশের ধারাবাহিকতায় ধর্মনেতাদের বেশির ভাগ অংশ বিপদগামী এবং মাতৃভাষায় ইসলামকে না বুঝার কারণে জনগণ গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তাঁর সমকালীন উপলব্ধি ছিল—শাসকগোষ্ঠীই সকল অনাচারের মূল। আরবীতে একটি প্রবচন আছে যার অর্থ হলো—"জনগণ শাসকদেরই অনুসারী হয়ে থাকে।" এ প্রসঙ্গে পত্র নং-৪৭, (১ম খণ্ড)-এর ৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, **"সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাদশাহর সম্পর্ক ঠিক তেমন—যেমন সম্পর্ক দেহের সাথে মনের। মন যদি ঠিক থাকে তবে দেহও ঠিক থাকে। যদি মন বিগড়ে যায় তবে দেহ বিপথগামী হয়। সুতরাং বাদশাহর সংশোধন সাম্রাজ্যেরই সংশোধন। বাদশাহর বিপর্যয় সমগ্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসের নামান্তর। এ জন্য তিনি শাসক পরিবর্তনের চাইতে শাসকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনকেই অগ্রাধিকার দেন।** এর আলোকে তাঁর কর্মসূচি ছিল—

ক. বেসরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংশোধন।

খ. উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের সংশোধন।

গ. বাদশাহ্‌র সংশোধন।

ঘ. দুনিয়াদার ও দরবারী আলেমদের সংশোধন।

উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও পন্থা ছিল নিম্নরূপ—

তিনি তাঁর কর্মসূচি বাস্তবায়নে তরবারির আশ্রয় নেননি। তিনি ভারতের

www.pathagar.com

নেতৃস্থানীয় সামরিক-বেসামরিক, সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এবং জনগণের মনোজগতে বিপ্লব সৃষ্টির পন্থা অনুসরণ করেন। উক্ত বিপ্লব তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষের চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে, নৈতিকতা ও তামাদ্দুনে, রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায়, সমাজ ও অর্থনীতিতে। তাঁর একমাত্র পাথেয় ছিল—আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, আল্লাহর সাহায্য এবং দৃঢ় মনোবল। এ লক্ষ্যে তাঁর কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ—

১. তিনি প্রথমত লোকদের সামনে দ্বীনের সঠিক রূপটি তুলে ধরেন, যারা তা গ্রহণ করে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করেন এবং তাদের চারিত্রিক দিক অর্থাৎ ঈমান, আকীদা ও আচার-আচরণ সংশোধন করতে সচেষ্ট হন।

২. **তিনি বেদআতের প্রকাশ্য বিরোধিতায় না গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাত অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। আর এটাকেই সফলতা ও সৌভাগ্যের একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—"বন্দেগীর সকল প্রকার হক আদায় করা এবং আল্লাহর প্রতি সর্বদা ও সব সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। এই অবস্থা ঠিক তখনি সৃষ্টি হবে—মানুষ যখন দুনিয়া ও আখেরাতের মহান নেতার আদর্শকে প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় পূর্ণরূপে অনুসরণ করবে।"**
পার্থিব শান্তি ও উন্নতি এবং পরকালীন মুক্তি একমাত্র নবী (স.)-এর আদর্শের অনুসরণের উপরই নির্ভলশীল। একজন মুসলমান যখন পূর্ণভাবে নবী (স.)-এর আদর্শের অনুসরণ করে তখনিই সে আল্লাহর সত্যিকার বান্দায় পরিণত হয়। উন্নীত হয় আল্লাহর প্রেমাস্পদের পর্যায়ে, লাভ করে সফলতা ও পূর্ণতা। এই সফলতা লাভকারী ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বনী ইসরাইলের নবীগণের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়।

৩. তিনি আগ্রা, সারহিন্দ ও লাহোরে উচ্চ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন এবং ছাত্রদেরকে স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অনুকূলে প্রস্তুত করেন।

৪. তিনি ভারতের বিশিষ্ট বেসরকারি ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং অনেককে স্বীয় মতে দীক্ষিত করেন।

৫. তিনি সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ঠ সুন্নী মতাবলম্বী সভাসদদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের অনেককে স্বীয় মতাদর্শে দীক্ষিত করেন। এ সকল সভাসদদের তৎপরতায় সম্রাট আকবর শেষ জীবনে তওবা করে আপন ধর্মে ফিরে আসেন।

৬. আকবরের মৃত্যুর পর ১০১৪ হিজরীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনারোহণ করলে তিনি চূড়ান্ত লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। তিনি স্বমতে দীক্ষিত দরবারের সভাসদদের দ্বারা জাহাঙ্গীরের মনোভাবকে ইসলামের অনুকূলে

www.pathagar.com

আনতে সক্ষম হন এবং এক পর্যায়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর মুজাদ্দেদ (র.)-এর দাবিগুলো মেনে নেন। অবশ্য দাবি মানার পূর্বে সম্রাট জাহাঙ্গীর মুজাদ্দিদকে স্বীয় সিংহাসনের জন্য হুমকি মনে করে কুখ্যাত গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করেন। দুর্গাধিপতি এক সময় সম্রাটের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট প্রেরণ করেন যে, "আহমদ সারহিন্দ এর সংস্পর্শে থেকে গোয়ালিয়র দুর্গের পশুসুলভ বন্দীরা মানুষে পরিণত হয়েছে এবং মানুষগুলো ফেরেশতায় পরিণত হয়েছে।" এরূপ রিপোর্ট পাওয়ার পর সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং মুজাদ্দেদকে মুক্তি দান করে তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সাক্ষাতে মুজাদ্দিদ (র.) সম্রাটের নিকট স্বীয় দাবিনামা পেশ করেন। তাঁর দাবিগুলো ছিল—

ক. সম্রাটকে সেজদা করার রীতি সম্পূর্ণভাবে রহিত করতে হবে।
খ. মুসলমানদেরকে গরু জবেহ করার অনুমতি দিতে হবে।
গ. বাদশাহ ও তাঁর দরবারীদের জামায়াতে নামাজ আদায় করতে হবে।
ঘ. কাজীর পদ ও শরীয়ত বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
ঙ. সমস্ত বেদায়াত ও ইসলামবিরোধী অনাচারকে সমূলে উৎখাত করতে হবে।
চ. ইসলামবিরোধী যাবতীয় আইন রহিত করতে হবে।
ছ. ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মসজিদগুলোকে পুনরায় আবাদ করতে হবে।
(উল্লেখ্য, সম্রাট আকবরের আমলে হিন্দুরা ভারতের অনেক মসজিদকে ধ্বংস করেছিল এবং অনেকগুলোকে মন্দিরে পরিণত করেছিল।)

সম্রাট জাহাঙ্গীর মুজাদ্দেদ (র.)-এর দাবিসমূহ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন এবং শাহী ফরমান জারি করে তা কার্যকর করেন।

মুজাদ্দেদ (র.)-এর দাবির সারকথা ছিল—নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। অপর কোনো ধর্ম বা ফেরকার বিরোধিতা করা বা ব্যক্তিগত লাভের কোনো ব্যাপার এতে ছিল না।

৭. প্রত্যেক শহর ও পল্লীতে মুজাদ্দেদ (র.) সাহেবের একজন করে প্রতিনিধি ছিলেন যারা নিজেদের উদ্দেশ্যের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, একাগ্রচিত্ত ও বজ্রকঠোর।

মুজাদ্দেদে আলফেসানী (র.) কেন সশস্ত্র যুদ্ধের পথে যাননি?

রোগ বুঝে চিকিৎসা করা মুজাদ্দেদ (র.)-এর নীতি ছিল। তিনি জানতেন, একশ্রেণীর দুনিয়াদার দরবারী আলেম, পীর ও সুফী সম্রাট আকবরকে

www.pathagar.com

ইসলামবিমুখ করেছে। তার সাথে যোগ হয়েছিল শিয়া মূলহেদ সম্প্রদায় ও হিন্দুরা। অথচ প্রথম জীবনে আকবর ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমে আকবরের সভাসদদের শুদ্ধ করেন এবং অতঃপর উক্ত সভাসদদের মাধ্যমে আকবরের মানসিক পরিবর্তনের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া আরো যেসব কারণ অনুমান করা যায় তা হলো—

১. হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী কোনো মুসলিম শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঠিক তখনই জায়েজ, যখন প্রমাণিত হবে যে, তিনি প্রকাশ্যে কুফরীতে ও ইসলামদ্রোহীতায় লিপ্ত রয়েছেন। মুশরেকী ও কাফেরী কার্যকলাপ সংগঠিত হওয়া যদিও হারাম তবুও কোনো ব্যক্তিকে ঠিক তখনই কাফের ঘোষণা করা যায়, যখন তাকে মুসলমান বলার মতো আর কোনো কারণই বিদ্যমান থাকে না। সম্ভবত আকবরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি মুজাদ্দিদ সাহেব তখনও অর্জন করতে পারেননি। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে জেহাদ ঘোষণার জন্য শর্ত হলো—এতটুকু বৈষয়িক শক্তি অর্জিত হতে হবে, যা দ্বারা বিজয়ী ও সফল হওয়ার কিছুটা আশা করা যায়। তাছাড়া আকবরের জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসাটাও সশস্ত্র যুদ্ধ না করার কারণ হতে পারে।

২. মুজাদ্দেদ সাহেব আকবরকে স্বার্থপর ও ফাসেক মুসলমান বলতেন। অসাধু চাটুকার ও স্বার্থপর লোকদের দ্বারা আকবর পরিবেষ্টিত ছিলেন। এ জন্য আকবরের তুলনায় তিনি এসব স্বার্থপর আলেম, বিলাসপ্রিয় সভাসদ এবং চাটুকারদের সমালোচনাই বেশি করেছিলেন। সম্রাটের সংশোধনের জন্য তাঁর পারিষদদের সংশোধনকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

৩. **সরকারের সংস্কার ও সংশোধনই যার একমাত্র লক্ষ্য সে রক্তাক্ত সংগ্রামকে ঠিক তখনই জরুরি মনে করেন যখন এ ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। ক্ষমতাসীনদের সংশোধনই মুজাদ্দিদ সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। এ লক্ষ্যেই তিনি কাজ করেছেন। শরীয়তের হুকুম-আহকাম কায়েম করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য নিজেকেই ক্ষমতাসীন হতে হবে এমন বিষয়কে তিনি জরুরি মনে করেননি।**

৪. মুসলমান রাজা-বাদশাহরা তখন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই অন্যের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, দুর্নীতিপরায়ণতা ও বিলাসিতার দোহাই পাড়তেন এবং সংশোধনের দাবি জানিয়েই যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। ঠিক এই অবস্থায় মুজাদ্দিদ সাহেবও যদি সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিতেন তবে জনগণ বিষয়টিকে ক্ষমতার লড়াই হিসেবে মনে করতেন। এমতাবস্থায় ক্ষমতার হাতবদল হলেও ভিতর থেকে সংশোধন ও সংস্কার সাধিত হতো না বরং

www.pathagar.com

মুসলমানদের রক্ত ঝরত।

তদুপরি আকবরের অনুসৃত ধ্বংসাত্মক নীতির ফলে সাম্রাজ্যের উপর হিন্দু ও শিয়ারা বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছিল। তারা একটি আত্মঘাতি যুদ্ধ লাগার অথবা লাগানোর অপেক্ষায় ছিল। মুজাদ্দিদ সাহেব যুদ্ধ ঘোষণা করলে তারা সে সুযোগটি পেয়ে যেত এবং ভারতবর্ষের মুসলমানরা আত্মঘাতি যুদ্ধে নিঃশেষ হয়ে যেত।

এ সকল কারণে মুজাদ্দেদ (র.) সমস্যার সমাধান ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অহিংস নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

তথ্যসূত্র :

মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন, মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ১ম প্রকাশ, ইফাবা প্রকাশনী

জুন ২০১২

বি.দ্র. : সম্রাট আকবরের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে এ গ্রন্থের শেষাংশের পরিশিষ্ট দেখুন।

www.pathagar.com

মহান সংস্কারক শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২)

(হাম্বলী মাজহাব অনুসারী ধর্মতাত্ত্বিক ও সংস্কারক)

জন্ম ও বংশ পরিচয় : মধ্য নাজ্‌দ এর উয়ায়নাতে জন্মগ্রহণ করেন। এটি তখন সমৃদ্ধশালী মরুদ্যান ছিল। বংশানুক্রমিকভাবে তাঁর পরিবার ছিল হাম্বলী মাজহাবের ধর্ম তাত্ত্বিক। তাঁর পিতা আবদুল ওয়াহাব বিন সুলায়মান ছিলেন তৎকালীন শাসক আমীর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুয়াম্মার এর শাসনকালে উয়ায়নার কাজী (বিচারক)। পিতামহ সুলায়মান ইবনে মুহাম্মাদ ছিলেন নাজদ এর মুফতি। তাঁর পিতা বেশ কিছু ধর্মীয় গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তিনি শহরের মসজিদে হাদীস ও ফিকাহ্‌শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।

শিক্ষা জীবন : পিতার নিকটেই তিনি শিক্ষা জীবন শুরু করেন। পবিত্র কুরআন হেফ্‌জ করেন এবং হাম্বলী মাজহাবের মৌলিক গ্রন্থাবলী—বিশেষ করে শায়খ ময়াফ্‌ফাকউদ্দীন রচিত 'উম্‌দা' নামক গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি পবিত্র মক্কায় হজ্ব পালন করেন। মক্কায় তিনি উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রত্যক্ষ করে মদীনায় যান। মদীনায় তিনি ইমাম ইবনে তায়মিয়ার অনুসারী প্রখ্যাত আলেম আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আন্ নাজদীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর এই শিক্ষক দীর্ঘদিন মদীনায় শিক্ষকতা করে অবশেষে দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন। এই শিক্ষকই শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হার এর মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। মদীনায় তিনি আরো দু'জন আলেমের সান্নিধ্যে আসেন তন্মধ্যে একজন ছিলেন হানাফী মাজহাব অনুসারী মুহাম্মাদ ইবনে হায়াত আল সিন্ধী ও মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান আল কুরদী।

মদীনায় শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি তৎকালীন ইসলামী কৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র বসরায় গমন করেন। বসরায় তিনি 'মুহাম্মাদ আল মাজমু'ঈর'-

www.pathagar.com

এর নিকট ভাষাতত্ত্ব ও 'সীরাত শাস্ত্র' পাঠ করেন। বসরায় তিনি ইসলামের বহুরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তন্মধ্যে সুফী ভ্রাতৃসংঘসমূহ, শী'আ দল-উপদল, মুশরেকী কার্যকলাপে লিপ্ত মুসলমান এবং সুফীভেদে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। বসরার মুসলমানদের এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামকে সঠিক রূপে প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন। বসরায় ৪ বছর অতিবাহিত করার পর তিনি বাগদাদ গমন করেন ও একজন ধনাঢ্য মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পাঁচ বছর বাগদাদে অবস্থান করার পর তিনি কুর্দিস্থান, হামাদান ও ইসফাহানে গমন করেন এবং দর্শনশাস্ত্র ও সুফীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি দামিশ্ক ও কায়রো সফর করে নিজ পিতার নতুন বাসস্থান 'হুরায়মিলা' গমন করে পিতার সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি আল্লাহর একত্ববাদের উপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুত্ তাওহীদ' রচনা করেন এবং সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মতবাদের অনুসারী একটি গ্রুপ গঠিত হলে তিনি হুরায়মিলা ছেড়ে জন্মস্থান উয়ায়না গমন করেন। তৎকালীন উয়ায়না শাসক উছমান ইবনে বিশর তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হন এবং নিজ শাসনাধীন এলাকার মাজার কেন্দ্রীক ব্যবসা বিলুপ্ত করেন এবং পবিত্র হিসাবে কথিত গাছসমূহ কর্তন করেন।

অতঃপর শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর প্রচার কাজ রিয়াদের দার'ইয়্যা এবং মান্‌ফুহা মরুদ্যানসমূহে সম্প্রসারিত করেন। দারইয়্যার তৎকালীন আমীর মুহাম্মাদ ইবনে সউদ ও তাঁর দুই ভাই যথাক্রমে মাশারী ও 'ছুমাইয়্যান' শায়খ মুহাম্মাদের মতবাদে দীক্ষিত হন। **১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে শায়খ মুহাম্মাদ এবং দারইয়্যার শাসক মুহাম্মাদ ইবনে সউদের মধ্যে পারস্পরিক আনুগত্যের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। শপথের মূল বক্তব্য ছিল—"এখন থেকে উভয়ে আল্লাহর আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করবেন এবং প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করবেন।" এই চুক্তির মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র বেদুঈন রাজ্য (দারইয়্যা) শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। এই চুক্তিটিই শরীয়াভিত্তিক আধুনিক সৌদি আরব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।** ১৭৯২ সালে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের ইন্তেকাল পর্যন্ত শায়খ সউদ বংশের শাসকদের উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি দারইয়্যার মসজিদে জনগণকে শিক্ষাদান, গ্রন্থ রচনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে লিপ্ত থাকেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর বংশধরেরাও সউদ রাজবংশের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখেন।

www.pathagar.com

তাঁর মতবাদ, কর্মসূচি, চিঠি ও শিক্ষা

তাঁর মতবাদ

- এক আল্লাহ ছাড়া অন্যসব ইবাদত অলীক ও মিথ্যা। এরূপ মিথ্যা উপাস্যকারী হত্যার যোগ্য।
- অধিকাংশ মানুষই মওয়াহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী নয়—কারণ তারা ওয়ালী-দরবেশদের কবর জেয়ারতের দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে। সুতরাং তাদের কার্যকলাপ কুরআনে বর্ণিত মক্কার মুশরেকদের ক্রিয়াকর্মের অনুরূপ।
- দোয়ার সময় কোনো নবী, ওয়ালী, পীর বা ফেরেশতার নামের অবতারণা করা শিরক বা অংশীবাদীতার নামান্তর।
- আল্লাহ ছাড়া অপর কারো সাহায্য প্রার্থনা করা শিরকের পর্যায়ভুক্ত।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা শিরক।
- আল কুরআন, সুন্নাহ এবং যুক্তিমূলক কিয়াসের ভিত্তি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইল্‌মের স্বীকৃতি ব্যক্ত করা কুফরের শামিল।
- সমুদয় কাজে তাকদীরের অস্বীকৃতি কুফর এবং ইলহাদ অর্থাৎ অবিশ্বাস ও অধর্মাচরণের নামান্তর।
- তা'বীলের (মনগড়া ব্যাখ্যা) সাহায্যে কুরআনের ব্যাখ্যা করা কুফরের পর্যায়ভুক্ত।
- ফরজ নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য।
- তামাকের ধূমপান হারাম। কেউ পান করলে অনূর্ধ্ব ৪০ বেত্রাঘাত দিতে হবে।
- গোপন মুনাফার জন্যও যাকাত দিতে হবে। (যেমন ব্যবসার লাভ)।
- ইসলামের মর্মবাণী কালেমা-ই-তাইয়্যেবা শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই কোনো লোক মু'মিন বলে গণ্য হবে না।
- আযানের সময় আযানের বাক্য ছাড়া অন্য কোনো বাক্য জোরে উচ্চারণ করা নিষেধ।
- মিলাদুন্নবীর আবৃত্তি শ্রবণের জন্য বহু লোকের বিশেষ সমাবেশ করা বিদআত।

তাঁর রচিত বিখ্যাত বিতাবসমূহ হলো

১. কিতাবুত তাওহীদ
২. কিতাবু কাশ্‌ফুশ শুবহাত
৩. কিতাবু উসুলুল ঈমান

www.pathagar.com

৪. কিতাবু ফাজায়েলুল ইসলাম
৫. কিতাবু ফাজায়েলুল কুরআন
৬. কিতাবু সীরাতুল মুখতাছারাহ
৭. কিতাবু সীরাতুল মতাওয়ালা
৮. কিতাবু মাজমু'উল হাদীস
৯. কিতাবু মুখ্‌তাছারুল আনসাফ ওয়াশ শরহেল কবীর মিনহাজ
১০. কিতাবু মুখ্‌তাসারুল মিনহাজ
১১. কিতাবু মুখ্‌তাছারুল ঈমান
১২. কিতাবু আদাবুল মাশী ইলাস সালাত
১৩. মুখ্‌তাসার ফতোয়া ইবনে তায়মিয়া

তাঁর প্রেরিত চিঠি

তিনি বিভিন্ন সময় ওলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁর মতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করে পত্রাদি প্রেরণ করেছেন। তাঁর লিখিত ২টি চিঠির নিম্নোক্ত অংশ তাঁর মতবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেবে। কাসীমের আলেমদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তাঁর চিঠিতে তিনি বলেন—

আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে,

১. আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত যে সকল অভিমত পোষণ করে থাকেন, আমার অভিমতও তাই।
২. আমি আল্লাহ, তাঁর রাসুল, ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব, পুনরুত্থান এবং তাক্‌দীরের উপর ঈমান রাখি।
৩. কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আল্লাহর গুণাবলীর অপব্যাখ্যা না করে তা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই স্বীকার করে থাকি। আল্লাহর নির্গুণ হওয়া স্বীকার করি না। বরং তাঁর গুণাবলীকে অনুপম এবং সৃষ্ট বস্তুর সাথে তুলনাবিহীন বলে মনে করি।
৪. কুরআন আল্লাহর বাণী এবং কাদীম (অনাদি)। আল্লাহ্ কুরআনকে তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ (স.)-এর উপর নাজিল করেছেন।
৫. আল্লাহর ইচ্ছা এবং ফায়সালা বহির্ভূত কিছুই ঘটতে পারে না বলে বিশ্বাস করি। সমস্ত কার্য আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর তাক্‌দীরের সীমা লংঘন কারো পক্ষে সম্ভব নয়।
৬. রাসুলে কারীম (স.)-এর শাফায়াতের উপর ঈমান রাখি।
৭. আমি বিশ্বাস করি যে, মু'মিনগণ তাঁর প্রভুর দর্শন লাভে ধন্য হবেন।
৮. আল্লাহর ওয়ালীগণের কারামত (অলৌকিক কার্যাবলী) ও কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি)

www.pathagar.com

এর কথা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁদের কাউকেও প্রভুত্বের অধিকারী ও ইবাদতযোগ্য বলে মনে করি না।

৯. দাজ্জালের পতন পর্যন্ত তরবারীর জেহাদ ব্যবস্থা বলবৎ ও ফরজ।

১০. শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে বিশ্বাস করি।

১১. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শ্রেষ্ঠ নবীরূপে বিশ্বাস করি। যে ব্যক্তি তা বিশ্বাস করে না, তাকে মু'মিন বলে স্বীকার করি না।

১২. কোনো মুসলিমকে কাফির বলি না এবং তাদের কাউকেও ইসলামের বহির্ভূত বলে বিশ্বাস করি না।

১৩. ফাসেক নেতার নেতৃত্বে জেহাদ এবং তাদের পিছনে নামাজ আদায় করা জায়েজ মনে করি না।

১৪. আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক সাক্ষ্য এবং ব্যবহারিক আচরণ—এ তিনটিকে আমি ঈমানের অংশ বলে মনে করি। সৎ আমলের দ্বারা ঈমান বর্ধিত এবং পাপকার্যের ফলে তার ক্ষতি সাধিত হয় মর্মে বিশ্বাস করি।

পত্রের শেষাংশে তিনি চার মাজহাবের গ্রন্থসমূহকে বাতিল জানা, পূর্ববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণকে অস্বীকার করা, অগ্রাহ্য করা, রাসুলে করীম (সা.)-এর পবিত্র মাজার, পিতা-পিতামহগণের কবর জিয়ারতকে হারাম জানার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

চিঠি নং-২

সমসাময়িক কালের প্রসিদ্ধ আলেম আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আল বাগদাদীর (১১৩৪-১২০০ হিজরী) নিকট এক পত্রে তিনি লিখেন, "আমি জনসাধারণকে তাওহীদের শিক্ষা প্রদান করেছি। বিপদের সময় মৃত সাধুপুরুষ ও ওয়ালীদের প্রতি আহ্বান ও তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা নিষেধ করেছি। তাদের কবরে নযর-নিয়াজ ও মানত দিতে এবং কবরকে সিজদা করতে নিষেধ করেছি।

আমি আমার অনুসারীগণকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সঙ্গে আদায় করা, যাকাত আদায় করা, সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার, মাদকদ্রব্য পরিহার ও মুনাফেকদেরকে ঘৃণা করতে আদেশ দিয়েছি। দেশের নেতৃস্থানীয় ও বড় বড় ধর্ণাঢ্য ব্যক্তিরা উপরোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পেরে আমার প্রচারিত তাওহীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছে।

যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইসলাম ধর্ম পরিহার কিংবা রাসুলে পাক (স.)কে

www.pathagar.com

কটুক্তি করে এবং তাঁর অনুসরণে বাধা দেয় আমি কেবল তাকেই কাফের বলে মনে করি। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে উম্মতের অধিকাংশ লোক এরূপ নন।

তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদ, এর উৎস এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত

আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতির জন্য যেসব বিধান নাজিল করেছেন উক্ত বিধানসমূহ কার্যকরভাবে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, ব্যক্তিমানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নৈতিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনগত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর আইনভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। হযরত দাউদ (আ.), হযরত সোলায়মান (আ.), হযরত মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর অবর্তমানে খোলাফায়ে রাশেদীন এরূপ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ৪র্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর ইন্তেকালের পর সিরিয়ার শাসক হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফত ব্যবস্থার অবসান করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজনীতি ও ধর্ম আলাদা হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পর্যায়ক্রমে দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে অপর জাতির গোলামে পরিণত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা থাকেন একজন। তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। অপরদিকে ধর্মীয় নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে গেলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যা মুসলমানদের পতনের প্রধান কারণে পরিণত হয়। ইসলামবিরোধী শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানদের উত্থান ও পতনের উক্ত কারণ অবহিত হয়ে মুসলমানদের উত্থান প্রতিহত করতে সদা সর্বদা তৎপরতা পরিচালনা করে। এ জন্যই দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদীরা রাজতান্ত্রিক শাসনে শরীয়া আইন চালুকে ততটা বিপজ্জনক মনে করে না, কিন্তু ইসলামী ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে শরীয়া আইন চালুকে তারা প্রচণ্ডভাবে ভয় করে, ঘৃণা করে ও প্রতিরোধ করে। এই প্রতিরোধে সম্মুখ লড়াই তাদের সর্বশেষ অস্ত্র। সর্বশেষ অস্ত্র প্রয়োগ করার পূর্বে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মতবাদ ছড়িয়ে দিয়ে মুসলিম ঐক্যকে শতধা বিভক্ত করে এবং রাজনৈতিক ইসলামের কর্ণধার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কল্পিত-পরিকল্পিত অপবাদ আরোপ করে। বিগত ১৪০০ বছর যাবত তারা দেখেছে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম শক্তির সাথে যুদ্ধে জেতা যায় না বরং লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতে হয়।

মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব বিনষ্ট করে মুসলিম ঐক্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার ধারাবাহিকতায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং তাঁর উপর

www.pathagar.com

কল্পিত-পরিকল্পিত অপবাদ আরোপ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সময়কালে শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, সে সময়টা ছিল মুসলমানদের পতন যুগ, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য শক্তিগুলো তখন বিশ্বব্যাপী নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করে জুলুম-লুণ্ঠন করছে। এরূপ অবস্থায় শায়খ মুহাম্মাদের পরিচালনায় আরব ভূখণ্ডে মুসলমানরা জেগে উঠার প্রচেষ্টা করায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিজেদের উপনিবেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে অসত্য, অর্ধসত্য ও কাল্পনিক দোষারোপ করে। তন্মধ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে মারাত্মক ছিল তা হলো নিম্নরূপ :

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের আন্দোলনকে ইসলামী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত না করে উক্ত আন্দোলনের নাম প্রদান করে ওহাবী আন্দোলন। তখন থেকে পৃথিবীর যেসব মুসলমান নিজ দেশে ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন তাদের উপর 'ওহাবী' সিলমোহর লাগিয়ে দেয়ার রেওয়াজ চালু করা হয়। অথচ সাম্রাজ্যবাদীরা শায়খ মুহাম্মাদের আন্দোলনকে ইসলামী আন্দোলন না বলে 'মুহাম্মাদী আন্দোলন'ও বলতে পারত। এটাও কিছুটা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কেননা আন্দোলনের কর্ণধারের নাম ছিল মুহাম্মাদ। কিন্তু মুহাম্মদ (স.) যেহেতু মুসলমানদের রাসুলের নাম সেহেতু শায়খ মুহাম্মাদের আন্দোলনের নাম মুহাম্মাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করলে আন্দোলনের ক্ষতি করা যেত না। এই অসৎ উদ্দেশ্যে তারা উক্ত আন্দোলনের নাম তাঁর সাথে সম্পৃক্ত না করে তাঁর পিতা আবদুল ওয়াহ্হাবের সাথে সম্পৃক্ত করে।

শায়খ মুহাম্মাদের পিতার নামে আন্দোলনের নামকরণ করার ব্যাপারে তাদের একটি গভীর দূরভিসন্ধি কাজ করেছিল। এই দূরভিসন্ধি ছিল এই যে, হিজরী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর আফ্রিকার মরক্কোর অন্তর্গত 'থার্ত' নামক ছোট একটি রাজ্য ছিল, যে রাজ্যটি শাসন করত আবদুল ওয়াহাব ইবনে আবদুর রহমান ইবনে রুস্তম খারিজী আবাজী। উক্ত রুস্তম হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানের (খারিজীদের বিরুদ্ধে আলীর যুদ্ধ) যুদ্ধে পরাজিত হয়ে উত্তর আফ্রিকায় পলায়ন করেছিল। রুস্তমের দৌহিত্র আবদুল ওয়াহাব তার রাজ্যে একটি ইসলামবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেন। সে তার রাজ্যে ইসলামী শরীয়া আইন বাতিল করে এবং হজ্ব পালন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তখন থেকে এই আবদুল ওয়াহাবের নীতি ও কর্মকে 'ওহ্হাবিয়া' মতবাদ হিসেবে নামকরণ করা হয়। তার এই ইসলামবিরোধী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য উত্তর আফ্রিকার তৎকালীন ও পরবর্তী আলিমগণ তার বিরুদ্ধে 'ফতওয়া' জারি করে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ইউরোপীয় শক্তি কর্তৃক

www.pathagar.com

উত্তর আফ্রিকা বিজিত হলে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই আবদুল ওয়াহাবের কথা এবং তার বিরুদ্ধে আলেমদের ফতোয়া গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে অবগত হন। ইউরোপীয়দের মধ্যে ফরাসী ঐতিহাসিক 'শারলী আন্দরে'-এর রচিত 'উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস' এবং Alfred Bell রচিত 'উত্তর আফ্রিকার ইসলামী ফেরকাসমূহ' অন্যতম।

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ অষ্টাদশ শতাব্দীতে একের পর এক মুসলিম দেশ দখল করছিল। তুরস্ক ব্যতীত সকল মুসলিম দেশেই তখন দুর্বল ও অযোগ্য রাজতান্ত্রিক শাসন চালু ছিল। অযোগ্য রাজাগণ ইউরোপের সাথে একের পর এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজ জাতির গলায় গোলামীর জিঞ্জির পরাচ্ছিল। মুসলমানদের এহেন ঘোর দুর্দিনে তাদেরকে রক্ষায় এগিয়ে আসেন আলেম সমাজ। ভারতবর্ষেও প্রথম একশ' বছর (১৭৫৭-১৮৫৭) আলেম সমাজের নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী রক্তাক্ত লড়াই পরিচালিত হয়। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন প্রত্যেক মুসলিম দেশের সংগ্রামী আলেমদের আন্দোলনের গায়ে 'ওয়াহ্হাবী' সিল লাগিয়ে দিচ্ছিল এবং তাদেরকে ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী মুসলিম নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করে মুসলিম ঐক্য বিনষ্টের কাজ করে।

উপরোক্ত আলোচনা ও তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, হিজরী ১৯৭ সালে মতান্তরে ১৯০ সালে মৃত্যুবরণকারী মরক্কোর আবদুল ওয়াহ্হাবের ভ্রান্ত মতবাদ ও দুষ্কর্মকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা চিন্তাবিদ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁর মতবাদকে 'ওহাবী' মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে। অতঃপর রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত সকল মুসলিম আলেমের উপর এই 'ওহাবী' সিল লাগিয়ে দেয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকে মৃত্যুবরণ করা আবদুল ওয়াহ্হাবের বিরুদ্ধে জারি করা 'ফাতওয়া' গ্রন্থসমূহের তথ্যসমূহ দ্বাদশ হিজরীতে জন্ম নেয়া শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের (১১১৫-১২০৬ হিজরী) উপর চাপিয়ে দিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে। সাম্রাজ্যবাদী মতবাদে দীক্ষিত মুসলমান, দরবারী আলেম, ধর্ম ব্যবসায়ী আলেম ও অর্ধশিক্ষিত আলেম নামধারীরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্রিটিশ প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের অবদান

১. তিনি ইসলামের শস্যক্ষেত্র থেকে বিদ্আতের আগাছাসমূহ উৎপাটন করে ইসলামের নির্ভেজাল রূপটি প্রতিষ্ঠা করেন।
২. তিনি ইসলামী শরীয়াভিত্তিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

৩. মুসলমানদের আমল-আখলাককে কুসংস্কার ও বিদ্‌আতমুক্ত করেন এবং মুসলমানদেরকে পুনরায় সশস্ত্র জিহাদের পথে প্রতিষ্ঠা করেন।

আমার ধারণা, তাঁর কর্মপদ্ধতিতে একটি মাত্র ভুল ছিল, আর তা হলো—তিনি নির্ভেজাল খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে রাজতন্ত্রের অধীনে শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মীয় নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভাজনের ফলেই বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজের ন্যায় শাসক তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্রব্যবস্থার কর্ণধার হয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ক্ষতির কারণ হয়েছেন। ফলে বাদশাহ ভেদে সৌদি আরবের ইসলামী চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করছে। এতদসত্ত্বেও ইসলামের পতনের যুগে মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভয়াল গ্রাস থেকে রক্ষা করে ইসলামী সংস্কৃতির অনুসারী করার কৃতিত্বের জন্য তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি তাঁর পবিত্র আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

তথ্য সূত্র :

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, তৃতীয় খণ্ড, ই.ফা.বা প্রকাশনী।
২. 'সউদী আরব' (অভ্যুদয় ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে), ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন।
৩. সংস্কারধর্মী ওহ্‌হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তি নিরসন। মূল : ড. মোহাম্মদ বিন সা'দ আল্ শুয়াই'হির, অনুবাদ : মোহাম্মদ রকীবুদ্দীন আহমাদ হুসাইন।

৪ মার্চ ২০১৫

www.pathagar.com

প্যান ইসলামিক চিন্তাধারার আধুনিক প্রবক্তা সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আফগানী

পুরো নাম : জামালউদ্দীন আস সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ ইবনে সাফদার।

বংশ : বিখ্যাত হাদিসবেত্তা আলী আত তিরমিযীর মাধ্যমে তিনি হুসায়ন ইবনে আলীর বংশোদ্ভুদ।

জন্ম : ১২৫৪ হিজরী, মোতাবেক ১৮৩৮-৩৯ খ্রিষ্টাব্দ। কাবুল জেলার আস আদাবাদ পল্লীতে।

শিক্ষা : কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর শিক্ষার বিষয় ছিল— মধ্যযুগীয় দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

কর্মজীবন

- হজ্ব পালন শেষে ১৮৫৭ সালে কাবুল গমন। বৃটেনের চাপে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে উক্ত বছরে আফগানিস্তান ইরান থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ব্রিটিশ আধিপত্যের কবলে পড়ে। তিনি প্রথম আফগান আমীর দোস্ত মোহাম্মদের দরবারে একই সনে সভাসদ হিসাবে যোগ দেন। দোস্ত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর পরবর্তি আমীর আ'জামের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ব্রিটিশ চক্রান্তে আমীর আ'জামের পতন হলে ১৮৬৯ সালে তিনি ভারতে আসেন।
- ভারতের ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর চাপে তিনি ভারত ত্যাগ করে কায়রো যান। সেখানে তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক আলেমের উপর প্রভাব বিস্তার করেন।
- তুরস্কের শিক্ষা বিভাগের আমন্ত্রণে তিনি ১৮৭০ সালে তুরস্ক গমন করেন।

www.pathagar.com

সেখানে তিনি আয়া-সুফীয়া ও সুলতান আহমদের মসজিদে বক্তৃতা করেন। তুরস্কের শিল্পভবনে তিনি শিল্পকলার উপকারিতা সম্পর্কে এবং সমাজ সংগঠনে মহাপুরুষের ভূমিকার উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তুরস্কের প্রধান মুফতি 'শায়খুল ইসলাম হাসান ফাহমী' তাঁর প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরোধিতা শুরু করলে তিনি ১৮৭১ সালে পুনরায় কায়রো ফিরে আসেন।

কায়রোতে তিনি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। মিসর সরকার তাঁর জন্য বার্ষিক ১২০ পাউন্ড ভাতা ধার্য করেন। মিসরের প্রধান মুফতি আবদুহ এবং মিসরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যত নেতা সা'দ জগলুল তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। তিনি তাঁর বাসভবনে মিসরীয় জ্ঞানপিপাসুদের সম্মুখে মুসলিম দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন। বাসভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পরবর্তীতে তিনি কায়রোর 'ক্যাফে ডি-লা-পোস্টে'র সম্মেলন কক্ষে বক্তৃতা প্রদান করতেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর মিসরীয় শিষ্য আদীব ইসহাক প্রথমে 'মিসর' নামক এবং পরে 'দৈনিক আত-তিজারা' নামক সাময়িকী ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি 'মীর আতুশ শারক' সাময়িকী প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা ছিলেন এর লেখক। এসময় তিনি ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদদের সংস্থার একটি শাখা 'Grand Oriental' মিসরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিন শতাধিক উৎসাহী জাতীয়তাবাদী তরুণ এর সদস্য ছিলেন। এ সংস্থায় রাজনীতি আলোচিত হতো। আলোচনায় সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো এবং রাজনৈতিক সংস্কারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সার্বজনীন অনুরোধে এ সময় তিনি সংসদীয় আন্দোলনে জড়িত হন। মিসরের প্রাচীনপন্থীগণ এবং ব্রিটিশ সরকার তাঁর তৎপরতায় ও জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তাঁকে সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ সালে মিসর থেকে বহিষ্কার করে। মিসর থেকে তিনি ভারতে আসেন।

ভারতবর্ষে আসার পর তিনি ব্রিটিশ প্রহরাধীনে প্রথমে হায়দ্রাবাদে এবং পরে কলকাতায় গমন করেন। হায়দ্রাবাদে তিনি ডারউইনের মতবাদ খণ্ডন করে ফার্সী ভাষায় 'রাদ্দে ডারউইন' নামক বই লিখেন। বইতে তিনি বলেন, একমাত্র ধর্মই সমাজের স্থায়িত্ব ও জাতিগুলির শক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদী ও জড়বাদী দর্শন মানব সমাজের ধ্বংস ও চরিত্র হননের কারণে পরিণত হয়। ১৮৮১ সালে মিসর শাসক খেদীত উরাবী পাশার নেতৃত্বে মিসরে উপনিবেশবিরোধী বিদ্রোহের সূত্রপাত হলে ব্রিটিশ সরকার জামালউদ্দীনকে মিসর গমনে বাধাদান করে। মিসরীয়

www.pathagar.com

বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করলে বৃটেন মিসর দখল করে নেয়। এর পর জামালউদ্দীন প্রথমে লন্ডন এবং পরে প্যারিস গমন করেন। প্যারিসে গিয়ে তিনি সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে মুসলিম দেশসমূহে ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। রাশিয়া এবং বৃটেনের প্রাচ্যনীতি, তুরস্ক এবং মিসরের অবস্থা, সুদানে মাহদীদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ রচনা করে ফ্রান্সের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় লেখালেখি করেন। এ সময় মিসরের মুফতী আবদুহ প্যারিসে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং আরবী ভাষায় 'উরওয়াতুল উছকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

- ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইরান সম্রাট 'নাসিরুদ্দীন শাহ' জামালউদ্দীনকে ইরানে আমন্ত্রণ করেন। ইরানী আলেম ও জনসাধারণের উপর জামালউদ্দীনের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাঁকে ইরান থেকে বহিষ্কার করা হয়।
- ইরান থেকে তিনি রাশিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি রুশ সরকারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপন করেন। রাশিয়ার মুসলমানদের জন্য কুরআন ও ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশে তিনি রুশ সম্রাটের অনুমতি লাভ করেন।
- ১৮৮৯ সালে 'প্যারিস ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে' যোগদানের জন্য রাশিয়া থেকে ফ্রান্সের পথে জার্মানির মিউনিখে উপস্থিত হন, মিউনিখে তাঁর সাথে ইরানের শাহের সাক্ষাৎ ঘটে। শাহ নিজের অনুশোচনা প্রকাশ করেন এবং পুনরায় জামালউদ্দীনকে ইরান যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শাহের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন দেখে জামালউদ্দীন উক্ত আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ইরানের রাষ্ট্রীয় আইন সংস্কারের জন্য একটি সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।
- প্যারিস ওয়ার্ল্ড ফেয়ার শেষে জামালউদ্দীন ইরান গমন করেন। ইরানের প্রধান উজীর তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা দেখে নিজের ক্ষতির আশংকা করে ঈর্ষান্বিত হয়ে শাহের মনোভাব পরিবর্তন করেন। শাহ জামালউদ্দীনের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলে তিনি তেহরানের অদূরে শাহ আবদুল আজীমের দরগায় নিভৃত বাস গ্রহণ করেন। ইরানের সর্বস্তরের আলেমগণ এসময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন এবং তাঁর প্রণীত রাজনৈতিক সংস্কার সংক্রান্ত বক্তব্য শ্রবণ করতেন। প্রধান উজীরের (আলী আসগার খানের) পরামর্শে ইরান সরকার পুনরায় তাকে ইরান থেকে তুরস্কে বহিষ্কার করার জন্য তাঁকে ইরান-তুর্কী সীমান্তে পৌঁছে দেয়া হয়। জামালউদ্দীন তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বসরায় বসবাস করা শুরু করেন। এসময় তিনি ইরান সম্রাট ও প্রধান উজীরের দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা

www.pathagar.com

করতেন। এসময় ইরানের শাহ একটি ব্রিটিশ কোম্পানিকে ইরানের 'তামাক স্বত্ব' প্রদান করলে জামালউদ্দীন এর বিরুদ্ধে সামাররার প্রধান মুজতাহিদ 'মীরজা হাসান সিরাজী'কে পত্র লিখেন। সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ কোম্পানিকে প্রদত্ত সুবিধাদি বাতিল না করা পর্যন্ত সকল মুসলমানদের তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মুজতাহিদ একটি ফতওয়া জারি করেন। সরকার চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়।

- ১৮৯১ সালে তিনি বসরা থেকে লন্ডন গমন করেন। সেখানে তিনি পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতেন। লন্ডনে তিনি 'দুই গোলার্ধের রশ্মি' নামক দ্বিভাষিক (আরবী ও ইংরেজি) সাময়িকী প্রকাশে সহায়তা করেন। তিনি ইরানী আলেমসমাজকে দেশের স্বার্থহানি করার অভিযোগে ইরান সম্রাটকে পদচ্যুত করার আহ্বান জানান।
- তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ পর পর দুইবার জামালউদ্দীনকে তুরস্কে আসার আমন্ত্রণ জানানোয় তিনি তুরস্কে আসেন। সুলতান জামালউদ্দীনের বাসভবন হিসাবে একটি সুন্দর প্রাসাদ প্রদান করেন এবং মাসিক ৭৫ উছমানী পাউন্ড ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সুলতান তাঁকে তুরস্কের শায়খুল ইসলাম পদে নিয়োগের প্রস্তাব দিলে জামালউদ্দীন এই পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। সুলতানের সাথে জামালউদ্দীনের সখ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তুর্কী রাজদরবারের প্রভাবশালী ধর্মবেত্তা আবুল হুদা চক্রান্ত করে উভয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে সক্ষম হন। শায়খ জামালউদ্দীন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসা ব্যক্তিদের নিকট মুসলমানদের দাম্ভিকতা, নিষ্ক্রিয়তা ও অজ্ঞতার সমালোচনা করতেন।

১১ মার্চ ১৮৯৬ সালে ইরানের শাহ গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা নিহত হলে এতে আফগানীর হাত ছিল মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠে যে, তিনি খেদিভ আব্বাসকে মিসরের খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হতে প্ররোচণা দিয়েছেন। জামালউদ্দীন প্যারিসের La Tems দৈনিক পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে অভিযোগসমূহ অস্বীকার করেন। কিন্তু যেহেতু ইরানের শাহ এর হত্যাকারী ছিল তাঁর শিষ্য এবং খেদীভ আব্বাস ক্ষমতা দখলের পূর্বে তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন সেহেতু তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদ জামালউদ্দীনের ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

৯ মার্চ ১৮৯৭ সনে চিবুকের ক্যান্সারে জামালউদ্দীন পরলোক গমন করেন। অনেকের মতে, তুর্কী দরবারের ধর্মবেত্তা আবুল হুদা জামালউদ্দীনের চিকিৎসকের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করেন। তাঁকে নিশানতাশা কবরখানায় দাফন করা হয়। ১৯৪৪ সনের শেষ দিকে তাঁর মৃতদেহ আফগানিস্থানে নেয়া

www.pathagar.com

হয় এবং ১৯৪৫ সনের ২ জানুয়ারি তাঁকে কাবুলের উপকণ্ঠে আলী আবাদের নিকট দাফন করা হয়। তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' রচিত বিশ্বকোষে জামালউদ্দীন আফগানীর জন্মস্থান কাবুলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে হানাফী মাজহাবের অনুসারী বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'ইরানের সমকালীন ইতিহাস' নামক গ্রন্থে জামালউদ্দীন আফগানীর জন্ম ইরানের হামেদান শহরের আস আদাবাদ বলে উল্লেখ করেছে এবং ইরান ও বর্তমান ইরাকের নাজাফে তাঁর শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হওয়ার কথা লিখেছে। তবে তিনি শিয়া বা সুন্নী এমন কোনো কথা না লিখে ইরানী বিপ্লবে এবং মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণে জামালউদ্দীন আফগানীর অনন্য অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. মুসলিম দেশসমূহকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা।
২. প্যান ইসলামিক মুসলিম ঐক্য।
৩. একক খিলাফতের অধীনে মুসলিম বিশ্ব শাসন।

তাঁর বক্তব্য ও লেখনীর বিষয় : মুসলিম দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাজ সংগঠন, রাজনৈতিক সংস্কার, শিক্ষা ও বাণিজ্য।

তিনি যুবসমাজকে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হওয়ার অনুপ্রেরণা দিতেন। তিনি স্কটিশ Free Masson Society'র সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন পরে তাঁদের দূরভিসন্ধি দেখে সম্পর্ক ছেদ করেন।

- তাঁর মতে, গ্রীসের এপিকিউরিয়া, ফ্রান্সের ভলতেয়ার ও রুশোর মতবাদ মানুষকে বস্তুবাদ বা জড়বাদের দিকে নিয়ে গেছে। ডারউইনের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি বই লিখেন যার নাম 'রাদ্দে দাহরিয়্যান'।
- তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করেন, ইসলামের সত্যতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন।
- ফরাসী দার্শনিক আর্নেস্ট রেঁনে ফ্রান্সের সারবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম ও বিজ্ঞানবিষয়ক যে নেতিবাচক ভাষণ দেন জামালউদ্দীন তা ফরাসী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে খণ্ডন করেন।
- ফ্রান্সে অবস্থান করে তিনি মুসলিম দেশসমূহে ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

- ব্রিটিশ কলোনিসমূহে জামালউদ্দীনের প্রবন্ধ নিষিদ্ধ হয়।
- তাঁর লেখায় ইউরোপের প্রাচ্যনীতির তীব্র সমালোচনা থাকত এবং ইসলামের সেসব নীতি-আদর্শের উপর গুরুত্ব দেয়া হতো, যা অনুসরণ করলে মুসলমানগণ হারানো শক্তি ও গৌরব পুনরায় ফিরে পাবে।
- জামালউদ্দীনের শিষ্যরা ইরান ও মিসরে সরকার পরিবর্তন করে।

চরিত্র ও বৈশিষ্ট : ১. সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা, ২. গভীর ধর্মীয় অনুভূতি, ৩. উন্নত চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, ৪. দ্বিধা ভয়হীন চিত্ত, ৫. একনিষ্ঠ সাধক, ৬. লক্ষ্যের ব্যাপারে আপোষহীন, ৭. স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির অধিকারী ও জ্ঞানপিপাসু, ৮. তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং সকল জৈবিক লালসা মুক্ত নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি খুবই সহজ-সরল সাধাসিধা জীবনযাপন করতেন।

তাঁর অবদান

১. তিনি পুঁজিবাদ, জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ ও সমাজবাদের অন্তসারশূন্যতা তুলে ধরেন এবং জনগণকে এর থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দেন। দীর্ঘ ১৩০ বছর পর তাঁর বক্তব্যই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

২. **তিনি আধুনিক বিশ্বে 'প্যান ইসলামী' চিন্তাধারার প্রবর্তক ছিলেন। তিনি বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য স্থাপনের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বলেছেন, মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায় এমন প্রতিপক্ষের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।**

৩. বিশ্বখ্যাত দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল জামালউদ্দীনকে আধুনিক যুগের মুসলমানদের পুনর্জাগরণের অগ্রদূত (নকীব) বলে অভিহিত করেন। তাঁকে মুসলিম বিশ্বের ও প্রাচ্যের মহান চিন্তাবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। (ইকবাল নামা, ২য় খণ্ড, লাহোর, পৃ. ২৩২)

৪. তাঁর প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সালাফিয়্যা এবং ইখওয়ান আন্দোলন জন্মলাভ করে। ১৯০০ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে জন্ম নেয়া ইসলামী আন্দোলনসমূহ তাঁর আন্দোলনের ফসল। (ইসলামী বিশ্বকোষ, একাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৩১ বিশ্বকোষ)

তাঁর শিক্ষা

১. মানব জাতির স্থায়িত্ব, উন্নতি, সুখ ও সমৃদ্ধি ধর্মের উপর নির্ভরশীল।
২. প্রকৃত সংস্কৃতির ভিত্তি জ্ঞান, উন্নত চরিত্র ও ধর্ম—পার্থিব সমৃদ্ধি নয়।
৩. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি পারস্পরিক ভালোবাসা, জ্ঞান ও স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

৪. বস্তুবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ঘৃণা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচার।

৫. ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা যুক্তি-প্রমাণের আলোকে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইসলাম বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের বিরোধী নয় বরং ইসলাম জ্ঞানের আলোকেই সবকিছু প্রতিষ্ঠিত করে।

৬. তিনি পাশ্চাত্য রচিত ও প্রচারিত প্রাচ্যতত্ত্বের (যার মূল কথা হলো পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ ও শাসনের অধিকার শুধু পাশ্চাত্যের রয়েছে এবং প্রাচ্য পশ্চাৎপদ, সুতরাং তাঁরা শাসিত হওয়ার যোগ্য, শাসক হওয়ার যোগ্য নয়) কঠোর সমালোচনা ও বিরোধিতা করেন ও প্রাচ্যতত্ত্বের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেন।

৭. প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতিরোধে জামালউদ্দীন প্রাচ্যবাসীদেরকে বলতেন, "কোনো জাতি তাঁর নিজস্ব ভাষা ছাড়া জাতীয়তা ও স্বদেশ প্রেমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। যে জাতির নিজস্ব ভাষায় জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার নাই সে জাতির ভাষার কোনো মূল্য নাই, বিশ্বে যে জাতির নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য নেই সে জাতির কোনো মর্যাদা নাই। যে জাতি স্বদেশের ঐতিহ্য অর্জন ও সংরক্ষণ করতে পারে না অথবা তার মনীষীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে না সে জাতির কোনো ভবিষ্যত নাই।

৮. E.F. Browne-এর উক্তি অনুসারে—"তিনি ছিলেন একাধারে একজন দার্শনিক, লেখক, সুবক্তা এবং সাংবাদিক। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনসমূহের মধ্যে তিনিই প্রথম সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তিনি উপনিবেশবিরোধী আধুনিক মুসলিম মনোভাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত। তিনি অনেকের দ্বারাই অকপটভাবে প্রশংসিত এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা একজন বিপজ্জনক বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী হিসাবে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম বিশ্বের অধঃপতনের কারণসমূহ তিনি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে উত্থানের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন।"

সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আফগানীর শিক্ষায় ঘুমন্ত, নির্যাতিত নিপীড়িত ও দিশেহারা মুসলিম বিশ্ব কিভাবে জেগে উঠেছিল তা দখলদার ব্রিটেনের তৎকালীন মিসরস্থ ভাইসরয় 'লর্ড ক্রোমার' প্রেরিত চিঠিতেই উল্লেখ রয়েছে। লন্ডনে প্রেরিত লর্ড ক্রোমারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে—"আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জামালউদ্দীন আফগানীর নেতৃত্বাধীন 'স্বদেশী দল সমিতি' যদি আরো এক বছর টিকে থাকে এবং পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় বর্তমানে এর যে নেটওয়ার্ক রয়েছে তাও

www.pathagar.com

টিকে থাকে এবং জামালউদ্দীন মিসরে আরাম-আয়েশ ও নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন তাহলে শুধু কায়রোতে ব্রিটেনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতিই ধ্বংস হবে না বরং এ আশংকাও অমূলক নয় যে, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের নেতৃত্ব এই অদ্ভুত সমিতির পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে শুধু ইতিহাসের স্মৃতিতে পরিণত হবে এবং কার্যতঃ বিশ্বের বুকে তাঁর আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।" (সূত্র : ইরানের সমকালীন ইতিহাস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইরান পৃ. ৬১)

তথ্যসূত্র

১. ইসলামী বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩৩৭, ই.ফা.বা. প্রকাশনী।

২. ইরানের সমকালীন ইতিহাস, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পাদিত।

বিঃ দ্রঃ : অত্র বইয়ের অন্য প্রবন্ধে সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আফগানী সংক্রান্ত আরও তথ্য রয়েছে। তাঁর Pan Islamic মতবাদ সম্পর্কে জানতে এ বইয়ের শেষাংশের পরিশিষ্ট দেখুন।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণের মহানায়ক ইমাম রুহুল্লাহ মোস্তাফাভী মুসাভী খোমেনী

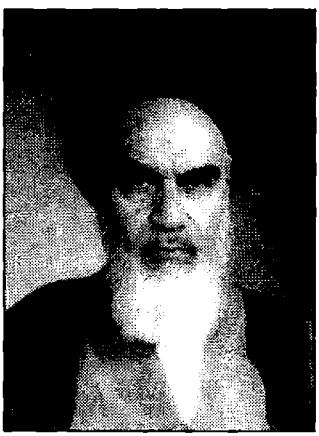

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে যত নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ছিল নিজ নিজ যুগের তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাগুতি শক্তির জুলুম-অত্যাচার নিপীড়ন থেকে জনগণকে মুক্ত করে জনগণকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের শিক্ষা দিয়ে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের ৪র্থ খলিফা হযরত আলী (রা:) এর ইন্তিকালের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসুল প্রদর্শিত ইসলামী শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় এবং জনগণ পর্যায়ক্রমে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সুশীতল ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে রাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক, অনৈসলামিক গণতন্ত্র, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী তাগুতি শক্তির কবলে পতিত হয়ে চরম জুলুম নিপীড়ন ও শোষণের শিকার হয়। **আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে বা ভুলে গিয়ে মানুষ যখন সার্বভৌম ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে, প্রেসিডেন্টের হাতে, স্বৈরতন্ত্রের হাতে তুলে দেয় বা তুলে দিতে বাধ্য হয় তখনই মানুষ জুলুম-অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হয়—কেননা আল্লাহর আইন চিরস্থায়ী, আল্লাহ্ প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সুনির্দিষ্ট। জন্মগতভাবে যারা মানুষ তাঁরা প্রত্যেকেই এই মৌলিক অধিকারের দাবিদার। পক্ষান্তরে যখনই সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো বান্দার উপর আরোপিত হয় তখনই সে নিজের খেয়ালখুশি মোতাবেক, নিজের সুবিধা মোতাবেক জনগণের মৌলিক অধিকার আংশিক বা সম্পূর্ণ হরণ করে, স্থগিত করে বা পরিবর্তন করে। এভাবে বিশ্বের মানবমণ্ডলী জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়।**

www.pathagar.com

মানবজাতিকে চরম অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হযরত মুসা (আঃ) জালেম শাসক ফেরাউনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, দাউদ (আঃ) জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের বিরুদ্ধে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কার শাসকদের বিরুদ্ধে, হযরত হোসাইন (আঃ) রাজা ইয়াজীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইমাম খোমেনী (আঃ) তাঁর সময়কার পুঁজিবাদী, সমাজবাদী, উপনিবেশবাদী তাগুতি শক্তি ও তাদের সৃষ্ট ইরানের সম্রাট রেজাশাহ পাহলভীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজ জনগণকে তাগুতি শক্তির গোলামী থেকে মুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের মুসলমানদেরকে ও নির্যাতিত জাতিসমূহকে সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী ও বর্ণবাদী তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হওয়ার পথনির্দেশ করেছেন। এজন্যই তাঁর মৃত্যুতে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যম বিবিসি'র মন্তব্য ছিল— "আজ এমন এক ব্যক্তি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, যার মৃত্যুতে পাশ্চাত্যের অনেকেই প্রশান্তিতে ঘুমোতে পেরেছেন।"

জন্ম, জন্মস্থান ও বংশ পরিচয়

১৯০৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর জন্মদিনে ফাতিমা (রাঃ)-এর বংশে ইরানের ধর্মীয় শহর কোমের ১৬০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে খোমেইন নামক ছোট শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ইরানের খোরাসান প্রদেশের নিশাপুর শহরের ইমাম মুসা আল কাজিম। তিনি শিয়া মাজহাবের ইমাম হিসেবে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৪২০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। এ বংশের একজন অষ্টাদশ শতকে উত্তর ভারতের লক্ষ্ণৌতে এসে বসতি স্থাপন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ খোমেনীর দাদা সাইয়েদ আহমদ জিয়ারত উপলক্ষে বর্তমান ইরাকের নাজাফে গমন করেন। নাজাফে তাঁর সাথে দেখা হয় খোমেইন শহরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইউসুফ খানের সাথে। ইউসুফ খানের আমন্ত্রণে তিনি খোমেইন শহরে এসে বসতি স্থাপন করেন ও 'খান' এর কন্যাকে বিবাহ করেন। এজন্যই ইমাম খোমেনীর দাদার নামের উপাধি ছিল সাইয়্যেদ আহমদ লখনৌভী। তিনি এক ছেলে ১ মেয়ের পিতা হন। ছেলের নাম রাখেন সাইয়্যেদ মোস্তফা হিন্দী এবং মেয়ের নাম রাখেন সাহিবা।

তাঁর পিতা দাদাসহ প্রত্যেকে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিয়া মাজহাবের ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। জন্মের ৫ মাস পর পিতার মৃত্যু হলে তাঁর মাতা হজর এবং ফুফু সাহিবা তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

১৯১৮ সালে মাতা ও ফুফুর মৃত্যু হলে তাঁর বড়ভাই সাইয়্যেদ মোরতাজা (পরবর্তীতে আয়াতুল্লাহ পাসানদিদেহ নামে পরিচিত হন) বালক খোমেনীর অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইমাম খোমেনীর শিক্ষা জীবন : বাল্যকালে তিনি স্থানীয় মক্তবে কুরআন শিক্ষা করেন। মাতার মৃত্যুর পর বড়ভাই তাঁকে শিক্ষার শহর সুলতানাবাদে (বর্তমান আরাক) প্রেরণ করেন। সেখানকার শিক্ষাশেষে তিনি তৎকালীন জ্ঞান কেন্দ্র কোম নগরীতে আগমন করেন। কোমের School of Academyi-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আয়াতুল্লাহ আবদুল করিম হায়েরী। তিনি আয়াতুল্লাহ হায়েরীর তত্ত্বধানে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। কোমের দার আল শাফা স্কুলে (বা School of Academy) তাঁর শিক্ষার বিষয় ছিল Islamic Law (শরীয়াহ) Islamic Jurisprudence (ফিকাহ), কবিতা, দর্শনশাস্ত্র ও সুফী ইজম। তিনি Plato, Aristotle-এর দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন তবে তাঁকে আকৃষ্ট করে ইবনে সিনাহ, ইবনে আরাবী ও মুল্লা সদর-এর দর্শন। উচ্চতর শিক্ষাজীবনে তাঁর শিক্ষকগণ ছিলেন যথাক্রমে আয়াতুল্লাহ ইয়াজদী (দর্শন ও সুফীবাদ বিশেষজ্ঞ), জাভাদ আবদ মালেকী তাবরীযী এবং মীর্জা মোহাম্মদ আলী শাহাবদী। শেষোক্ত শিক্ষকই তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেন। তৎকালীন কোমের শিক্ষাব্যবস্থায় দর্শন ও সুফীবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল না কিন্তু তাঁর শিক্ষকদের নিকট থেকে তিনি এই উভয় বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কোমের শিক্ষানীতিতে এ দুটি বিষয়কে সন্দেহ করে উপেক্ষা করা হতো।

শিক্ষকতা জীবন : তিনি শিক্ষাকতাকে স্বীয় পেশা হিসাবে বেছে নেন। তিনি কোম ও নাজাফের ধর্মীয় উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রের প্রভাষক হিসাবে দশ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী ন্যায় শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতাবাদ শিক্ষা দিতেন, তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে যে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে শিখাতেন তা ছিল—"দৈনন্দিন সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের শিক্ষা।" তিনি সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ Secularism-এর বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতেন ও এ মতবাদ খণ্ডন করে বই লিখেন। শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি কাশাফ-আল-আছরার (Uncovering of Secrets) নামক বই লিখে ইরানের বিখ্যাত ধর্মবিরোধী ইতিহাসিক আহমেদ কাছরাভীর লিখিত আছরার-ই-হজর (Secrets of Thousand Years) বইয়ের বক্তব্যকে ভুল প্রমাণিত করেন। ১৯২০-এর দশক থেকেই তিনি সময় পেলে কোম থেকে তেহরান গিয়ে তৎকালীন ইরানী পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেতা আয়াতুল্লাহ হাসান মুদাররিস এর বক্তব্য শুনতেন।

www.pathagar.com

ইরানের আলেমদের তৎকালীন সংগঠন—তৎকালীন ইরানের ৬টি বৃহৎ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে আলেমদের ৬টি সংগঠন ছিল। এসব সংগঠন প্রধানদের বলা হতো মারজা অর্থাৎ ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। উক্ত ৬ জন মারজা একত্রিত হয়ে জ্ঞান, মেধা ও প্রভাবের ভিত্তিতে একজনকে প্রধান মারজা হিসেবে নির্বাচিত করত। কোমে যেহেতু সবচেয়ে প্রভাবশালী আলেমদের কর্মস্থল ছিল তাই কোমের 'মারজা'ই প্রধান মারজা হিসেবে অভিষিক্ত হতেন। এ ধারাবাহিকতায় কোমের দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষা কারিকুলামের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ ওযমা হায়েরী 'গ্র্যান্ড মারজা' ছিলেন; তাঁর মৃত্যুতে আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী গ্র্যান্ড মারজা হন। বুরুজারদীর আমলে ইমাম খোমেনী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বই লিখে ও বক্তৃতা দিয়ে বিখ্যাত হন। **এ সময় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যারা তাঁর দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন তাঁরা ছিলেন আয়াতুল্লাহ মোতাহহারী, আয়াতুল্লাহ মোন্তাজারী, হোজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ জাভাদ বাহানুর (বিপ্লবের পরে প্রধানমন্ত্রী) ও আলী আকবর হাসেমী রাফাসানজানী (বিপ্লবের পর ইরানের প্রেসিডেন্ট)। শিক্ষক ইমাম খোমেনী ও তাঁর উক্ত ৪ জন ছাত্রই ছিল ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মূল নিউক্লিয়াস। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে এসময় গুরুত্ব সহকারে ইসলামী ফিকাহশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।** এ সময় তিনি এ সংক্রান্ত বিখ্যাত বই তৌজিহ আল মাসায়েল বা 'Basic Handbook of Religious Practice' রচনা করেন। তাঁর লিখিত বই ও তাঁর বক্তৃতা তাঁকে ইরানে ও নাজাফে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে। ১৯৬১ সালের ৩১ মার্চ গ্র্যান্ড মারজা আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী ইন্তেকাল করলে ইরানের আলেমগণ আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে ১৯৬২ সালে 'গ্র্যান্ড মারজা' হিসাবে মনোনীত করেন।

ইরানী আলেমদের মানস গঠন : শুধু ইরান নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণে এবং ৩য় বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখেন বিখ্যাত দার্শনিক, রাজনৈতিক ও বিপ্লবী সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আফগানী। তাঁর জীবনকাল ছিল ১৮৩৮ সন থেকে ১৮৯৭ খ্রি. পর্যন্ত। তিনি ইরানের হামেদান শহরের আসাদাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইরানের কাযভীন ও তেহরানে ধর্মীয় শিক্ষাশেষে উচ্চশিক্ষার্থে বর্তমান ইরাকের নাজাফে গমন করেন। ১৮৫৭ সালের প্যারিস চুক্তি মোতাবেক আফগানিস্থান ইরান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হলে তিনি একই বছর আফগান আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানের সভাসদ হন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি পরবর্তী আমীরের মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হন। ব্রিটিশ চক্রান্তে আফগান আমীর মোহাম্মদ আযম সিংহাসনচ্যুত হলে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। ভারতে তিনি হায়দরাবাদ ও

www.pathagar.com

কোলকাতা কেন্দ্রীক আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বহিষ্কার করলে তিনি তুরস্কে গমন করেন, তুরস্ক সরকার তাঁকে বহিষ্কার করলে তিনি মিসর গমন করেন। মিসরে তিনি 'আঞ্জুমানে মখফী' নামক সংগঠন গড়ে তুলে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন, সেখান থেকে তিনি পুনরায় ভারতে আসেন কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ সরকার তাঁকে পুনরায় বহিষ্কার করায় তিনি প্যারিস যান। সেখানে তিনি তাঁর মিসরীয় শিষ্য মুফতী আবদুহ এর সহায়তায় দৈনিক উরওয়াতুল উসকা (সুদৃঢ় রজ্জু) নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং অপর পত্রিকার মাধ্যমে আর্নেস্ট রেনেঁর মতবাদের জবাব প্রদান করেন। এ সময় ইরানের শাহ নাসিরুদ্দীন তাঁকে ইরান আমন্ত্রণ করায় তিনি ইরানে আসেন। তিনি ইরানের শাহের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে ইরানকে সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তাঁকে ইরান থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিছুদিন পর তিনি ইরান ফেরত এলে তাঁকে তেহরানের অদুরে রেই শহরে হযরত শাহ আবদুল আযীমের মাযারে নির্বাসিত করা হয়। নির্বাসিত অবস্থায়ও তিনি প্রহরীদের নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করে ইরানী আলিমদের সাথে বিভিন্ন সভার আয়োজন করেন এবং ইরানী জনগণকে শাহের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেগে উঠার আহ্বান জানান। ফলে ইরানের শাহ পুনরায় তাঁকে বহিষ্কার করায় তিনি তুরস্কে যান।

তুরস্কের ওসমানী সুলতান আবদুল হামিদ তাঁকে তুরস্কে বসবাসের অনুমতি দেন কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁর উপর নজর রাখা হতো। ইতিমধ্যে মীর্যা রেযা কেরমানী ইরানের নাসিরুদ্দীন শাহকে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে হত্যা করলে তুর্কী সুলতান জামালউদ্দীন আফগানীর ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হন। এমতাবস্থায় তুরস্কের শাইখুল ইসলাম ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ব্যবস্থা করেন।

তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মুসলিম বিশ্বের যেসব দেশে অবস্থান নিয়েছিলেন সেখানে তিনি দেশের আলেম, বুদ্ধিজীবী, সেনাপতি, শাসকশ্রেণী ও জনগণকে মুসলিম বিশ্বের পতনের কারণ ও উত্থানের রূপরেখার দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। পতনের কারণ হিসাবে তিনি যে সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন তা হলো— ১. স্বৈরাচারী শাসনযন্ত্র, ২. মুসলিম জনগণের অজ্ঞতা, গোঁড়ামী, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা, ৩. সঠিক ইসলাম থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতি ও বিজাতীয় জাহেলী মতাদর্শের প্রসার, ৪. ধর্মীয় ও ধর্মনিরেপক্ষ মতবাদ গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানদের বিভাজন, ৫. পাশ্চাত্য সৃষ্ট উপনিবেশিক চক্রান্ত।

উপরোক্ত কারণসমূহ প্রতিকারের মাধ্যমে মুসলমানদের উত্থান নিশ্চিত করার জন্য তিনি নিম্নোক্ত কর্মসূচি প্রদান করেন—

www.pathagar.com

১. বিশ্বের সকল মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা।
২. উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
৩. অপপ্রচার ও বস্তুবাদী চিন্তাধারার মোকাবিলায় ইসলামী মূল্যবোধের সমর্থন ও যথার্থতা প্রমাণ।
৪. ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
৫. আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া।
৬. সঠিক ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন।
৭. ইসলামী জীবন দর্শনের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।
৮. মুসলমানদের মধ্যে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা।
৯. পাশ্চাত্য জৌলুসে হতভম্ব হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
১০. উপনিবেশিক শক্তি ও স্বৈরতন্ত্রের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় দ্বীনি নেতৃত্ব ও 'মারজা'গণের প্রভাবকে কাজে লাগানো।

সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আফগানীর উপরোক্ত উপলব্ধি ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর শিষ্য ও ভাবশিষ্যরা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মুসলিম বিশ্ব ও সমগ্র বিশ্বে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে ইসলামের ও মুসলমানদের পুনর্জাগরণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন ও করছেন। তাঁর শিষ্য ও ভাবশিষ্যদের মধ্যে অন্যতম যারা ছিলেন তাঁরা হলেন—মিশরের মুফতী মোহাম্মদ আবদুহু ও সা'দ জগলুল, সিরিয়ার শেখ আবদুর রহমান কাওয়াকেবী, তুরস্কের জামাতে নূরের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ বদিউজ্জামান নূরসী, পাকিস্তানের ড. স্যার মোহাম্মদ ইকবাল, ভারতের মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও উপরোক্ত দু'জনের ভাবশিষ্য সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী। ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ কাশানী, আয়াতুল্লাহ উযমা হায়েরী, আয়াতুল্লাহ হাসান মুদাররিস (ইরানী পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেতা), আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী, আয়াতুল্লাহ গোল্পাইগুনী, আয়াতুল্লাহ মার-আশী ও আয়াতুল্লাহ খোমেনী।

আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মারজা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ইরানী আলেমগণ জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার কাজ করেন। এসময় তাঁরা উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করেন, শাসকদের উপদেশ প্রদান ও মৌখিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনেকাংশে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং ইমাম খোমেনীর জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করেন। ইমাম খোমেনী ধর্মীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর ১৯৬২ সাল থেকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বয়কট, ধর্মঘট, মিছিল ও জনতার অভ্যুত্থান সংগঠিত করে পরবর্তী আঠার বছরে উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের অনুচর ইরানের সম্রাট রেজা শাহ পাহলভীকে সিংহাসন থেকে পদচ্যুত ও বহিষ্কার করে

www.pathagar.com

ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল করেন। যা সমগ্র দুনিয়ার প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে উত্তরোত্তর শক্তি অর্জন করছে ও প্রসার ঘটাচ্ছে।

ইমাম খোমেনীর রাজনীতিতে আসার কারণ : সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণকারী ইরানের শাহ ইরানে সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচি বাস্তবায়নে তথাকথিত 'শ্বেতবিপ্লবের' এজেন্ডা বাস্তবায়নে অগ্রসর হলে আয়াতুল্লাহ খোমেনী এর বিরুদ্ধে আলেম ও জনগণকে নিয়ে রুখে দাঁড়ান। এমতাবস্থায় শাহের পুলিশ ও সৈন্যরা কোমের ফায়যিয়া মাদ্রাসাসহ অন্যান্য এলাকায় রক্তাক্ত হামলা পরিচালনা করে, যাতে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়, অনেকে আহত, পঙ্গু ও গ্রেফতার হয়। এমতাবস্থায় তিনি শাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "শাহ ও ইরানী জনগণের মধ্যে রক্তের নদীর ব্যবধান তৈরি হয়েছে, এমতাবস্থায় শাহ ইরান শাসন করার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম (৯৮%) জনগণ ইরানে কোনো তাবেদার সরকার বা স্বৈরাচারী শাসক চায় না—তাঁরা ইরানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় জীবনযাপন করতে চায়।"

উল্লেখ্য, 'মারজা' হিসাবে মনোনীত হওয়ার পর তিনি মাত্র আড়াই বছরের মতো ইরানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ০৫/০৬/১৯৬৩ইং তারিখে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, ০২/০৮/১৯৬৪ইং পর্যন্ত তাঁকে উত্তর ইরানে গৃহবন্দী করা হয়, ০৪/১১/১৯৬৪ইং সনে তাঁকে ইরান থেকে তুরস্কে বহিষ্কার করা হয়। তুরস্কে ইসলামী পোশাক পরিধান করাও তখন নিষিদ্ধ ছিল। ১১ মাস পর তাঁকে তুরস্ক থেকে ইরাকের নাজাফে বহিষ্কার করা হয়। নাজাফে তিনি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে যেসব রাজনৈতিক ও দার্শনিক বক্তব্য দিতেন সেগুলিই বই আকারে প্রকাশিত হয়ে ইরানী বিপ্লবকে পথনির্দেশ দিত। এমতাবস্থায় তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি বই ছিল যথাক্রমে— ১. ইসলামী সরকার, ২. হুকুমতে ইসলামী ও বেলায়েতে ফকীহ। এ ছাড়া তাঁর ক্যাসেটকৃত বক্তৃতা, ভাষণ, ঘোষণা ও বাণীর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীরা ইরানী বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়। **তাঁর কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ছিল— ১. ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে অতীতের ইসলামী আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ। ২. সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেয়া প্রতিটি কর্মসূচিকে গণআন্দোলনের মাধ্যমে বানচাল করা। ৩. বৈধতা লাভের উদ্দেশ্যে শাহ কর্তৃক আয়োজিত সকল পাতানো নির্বাচন, গণভোট বয়কট করা। ৪. ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক—এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করে আলেমদের নেতৃত্বে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করা।**

www.pathagar.com

তাঁর আন্দোলনের ভিত্তি

তাঁর আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি ছিল যথাক্রমে—

১. রাজনীতি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। বরং রাজনীতি এমন একটি বিষয় যার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ আবির্ভূত হয়েছেন এবং সমকালীন তাগুতি শক্তিকে পরাভূত করে, প্রতিরোধ করে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই নবী-রাসুলগণ রাজনীতি করেছেন। জনগণ যদি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করত তাহলে নবী-রাসুলগণ সমাজে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতেন না।

২. সামাজিক বিষয়ে নিজেকে না জড়িয়ে কিংবা বিভিন্ন গোত্র-বংশ ও জাতির অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। 'লে ইয়াকুমুন নাসু বিল কেস্তে' এই আয়াতের ফলাফল পেতে অবশ্যই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন তাঁদের সকলেই সমকালীন তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। অনেক নবী রাসুল (সঃ) তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছেন, অনেকে শহীদ হয়েছেন, নির্বাসিত হয়েছেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু তাগুতি শক্তি প্রতিরোধের দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি।

৪. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) রাজনীতিতে সততার বীজ বপন করেছেন। রাসুল (সঃ) এর যুগ থেকে হযরত আলী (রাঃ) এর যুগ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম এবং রাজনীতি ছিল পরস্পরের পরিপূরক বা সহায়ক। আমীর মুয়াবিয়া কর্তৃক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম ও রাজনীতি কালক্রমে পৃথক হয়ে যায় এবং ধর্মীয় আলেমগণ রাজনৈতিক ময়দান থেকে দূরে সরে যান বা দূরে সরে যেতে বাধ্য হন। ইসলাম ও রাজনীতির বিপরীত মেরুতে অবস্থানের কারণেই পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদীরা এটিকে একটি মতবাদ হিসেবে চালু করে এবং মুসলমানদের পতন নিশ্চিত করে।

৫. **তাগুতি শক্তির জুলুম-নির্যাতনের শিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো এবং জালেমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর ওয়ারিশগণের অন্তর্ভুক্ত পবিত্র ইমামদেরকে রাসুল (সঃ)-এর দায়িত্ব পালন করতে হবে। ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা ছাড়া শুধু শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়ার প্রতি রাসুল (সঃ)-এর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না।**

www.pathagar.com

ইমাম খোমেনীর রাষ্ট্রচিন্তা

১. ইমাম খোমেনীর দৃষ্টিতে মানবজাতি পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে যোগ্য ও পুণ্যবানদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে উন্নয়ন ও অগ্রগতির শিখরে আরোহণ করতে পারে। তিনি ইসলাম ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরেছেন। এ শাসন ব্যবস্থায় জুলুম, নির্যাতন, দুর্নীতি ও আগ্রাসনের কোনো স্থান নেই। এজন্যই জালেম, দুর্নীতিবাজ ও আগ্রাসীরা নিজেদের স্বার্থহানির ভয়ে সকল যুগে এর বিরোধিতা করেছে। তিনি মানুষের জন্য কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন ও স্বনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

২. ইমাম খোমেনী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক মানুষের নিজের ভবিষ্যত নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, মতামত প্রদান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করে। এজন্য তিনি দেশের সকল মানুষকে সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং এবং সরকারের কাজ পর্যবেক্ষণ ও তদারকির আহ্বান হিসাবে নির্বাচিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি যোগ্য ও নীতিবানদেরকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩. তিনি বিশ্বের সকল মানুষের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন জাতি যদি মানবীয় মূল্যবোধ রক্ষা করে চলে এবং অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের জুলুম-অত্যাচার-শোষণ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে না। তিনি বলতেন, বিশ্বের জাতিসমূহ যদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও বিজাতীয়দের কাছে আত্মসমর্পণের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তবে তারা ভবিষ্যতে সম্মান ও মর্যাদার স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হবে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ এলভিন টফলার বলেছেন, "আয়াতুল্লাহ খোমেনী বিশ্বকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এখন থেকে কেবল বিশ্বের শক্তিশালী জাতিগুলিই বিশ্ব-রাজনীতির প্রধান খেলোয়াড় নয়—বরং প্রত্যেক জাতিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যেসব ব্যক্তি ও জাতি বিশ্বকে তাঁদের কর্তৃত্বাধীন মনে করছে তাদের এ ধরনের কর্তৃত্ব করার কোনো অধিকার নেই।

৪. ইরানের ইসলামী বিপ্লব এ আদর্শ তুলে ধরেছে যে, রাজনীতি থেকে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে নির্বাসিত করা উচিত নয়। তাই

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদেরকে ন্যায়বিচারকামী, সৎ ও খোদাভীরু হতে হবে, যাতে বিশ্বের সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি হলো—বেলায়েতে ফকীহ। বেলায়েতে ফকীহ হচ্ছে ফকীহ বা মুজতাহিদ আলেমের শাসন, এরূপ ব্যক্তির শাসনেই কেবল ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

৫. তাঁর মতে, মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ সমাজে ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন। এ আইন বাস্তবায়ন করবে সৎ, খোদাভীরু, দক্ষ ও জ্ঞানী আলেমগণ। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটে নির্বাচিত জালেম ও দুষ্কৃতকারীদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা ক্ষমতা পেলে জালেমগণ জনগণের উপর জুলুম নির্যাতন বহুগুণে বৃদ্ধি করবে।

৬. তাঁর মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হলো—সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐশী মূল্যবোধে উপনীত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে সুরক্ষা প্রদান করা।

তাঁর আন্তর্জাতিক দর্শন

১. আপনি যে সমাজে ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি প্রদান করবেন আপনাকে প্রথমে উক্ত সমাজের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকেবহাল হতে হবে, জনগণের আচরিত সংস্কৃতির মূল্যায়ন করতে হবে। অতঃপর সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতির ধারণ ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রেখে আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ধারণ করে বাস্তবায়নের পথনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশকে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক-বাহক করতে না পারলে উক্ত সমাজকে দিয়ে ইসলামী বিপ্লব সফল করা সম্ভব হবে না।

২. তিনি মুসলমানদের পুঁজিবাদী বিশ্বশক্তি ও সমাজবাদী বিশ্বশক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে বিশ্বমুসলিমদের ঐক্যের শক্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। তিনি শিয়া-সুন্নী বা অন্যান্য মাজহাবী বিতর্ককে উপেক্ষা করেন এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি মুসলমানদেরকে ইসলামী সংস্কৃতি ধারণ করার ও বিজাতীয় সংস্কৃতি বর্জন করার উপদেশ দেন। তিনি মুসলিম বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত-নিষ্পেষিত জাতিসমূহের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

৩. তিনি মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহে রাজতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, এর মাধ্যমেই ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা হয়ে যায় এবং মুসলমানদের পতন সূচিত হয়।

৪. তিনি মুসলিম বিশ্বের ভূখণ্ড বা ভাষা, গোত্রভিত্তিক জাতীয়তাবোধকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ

১. ইরানের ইসলামী বিপ্লবের রূপকার ইমাম খোমেনী (রঃ) স্বাধীনতা ও মুক্তিকামীতাকে ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"মানুষের জীবন তখনই মূল্যবান, যখন তা হবে স্বাধীন। পরাধীন জীবনের কোনো মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি না।" তাই তিনি স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করাকে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "স্বাধীনতা এক খোদায়ী আমানত, যা মহান আল্লাহ্ই আমাদের দান করেছেন।"

২. ইরানের ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার সময় ইরানী জনগণের ও মরহুম ইমামের অন্যতম স্লোগান ছিল—স্বাধীনতা, মুক্তি ও ইসলামী গণশাসন ব্যবস্থা। ১৯৭৯ সালে বিপ্লব বিজয়ের পরই ইরানের রাজনৈতিক ও আইনি কাঠামোর স্বাধীনতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়। পরপর বেশ কয়েকটি গণভোট ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দেশটিতে গড়ে উঠে স্বাধীন রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন নাগরিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামী বিপ্লবের আদর্শে উজ্জীবিত ইরান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অসংখ্য বাধা ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে স্বাধীনতা ও মুক্তির আদর্শ বাস্তবায়নে সক্রিয় থেকেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। এ কারণেই ইসলামী ইরান আজ একটি স্বাধীনচেতা ও মুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্বে অনন্য গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত।

৩. 'ধর্ম মেনেই স্বাধীনতা অর্জন'—এই ছিল ইরানের ইসলামী বিপ্লবের আন্তর্জাতিক বার্তা। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে জন্মগতভাবে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন, তাই কোনো মানুষের গোলাম বা দাস হয়ো না।" স্বাধীনতা ধীরে ধীরে অর্জিত কোনো বিষয় নয়। মানুষের স্বাধীনতা মহান আল্লাহর এমন এক উপহার যা মানুষের প্রকৃতির সাথে মিশে রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা মানুষের ধর্মীয় ও প্রকৃতিগত

www.pathagar.com

অধিকার। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার—জীবন যাপনের অধিকারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ চিন্তা, বিশ্বাস ও আদর্শ বেছে নেয়ার ব্যাপারে স্বাধীন এবং স্বাধীন মতের অধিকারী ব্যক্তির সকল অধিকারকেও ইসলাম স্বীকার করে। এই ধর্মের দৃষ্টিতে মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধি ও যোগ্যতার আলোকে জীবনের পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সরকারের অবশ্য কর্তব্য। ইসলাম স্বাধীনতার কিছু সীমারেখা টেনে দিয়েছে, যাতে তা মানুষের বিভ্রান্তি ও অধঃপতন কিংবা অন্যের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ না করে। ইমাম খোমেনী স্বাধীনতা সম্পর্কে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাকে সমর্থন করেছেন।

৫. ইসলামী স্বাধীনতা বনাম পাশ্চাত্য স্বাধীনতা— ইমাম খোমানীর মতে, মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিলে তারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয় এবং অধঃপতনের শিকার হয়। বিপ্লব ও পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের যে বিকাশ, উন্নয়ন বা পরিপক্কতা ঘটে তা স্বাধীনতার ছায়াতলেই সম্ভব। স্বাধীনতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "চিন্তার স্বাধীনতার অর্থ মানুষ স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করবে। জ্ঞানগত বিষয় বা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার ফল হয় এক ধরনের, পূর্বানুমান বা বিশেষ অবস্থানের কারণে চিন্তার ফল হয় অন্য ধরনের।" ইসলাম নৈতিক স্বাধীনতাকে সমর্থন-সহযোগিতা করে, অনৈতিক ও লাগামহীম স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে।

ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা সর্বমানবের জন্য বা সকল জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত তথাকথিত স্বাধীনতা মানুষের জন্য ক্ষতিকর, ধংসাত্মক ও অন্তঃসারশূন্য। এ ধরনের স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিকে বা জাতিকে যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীনতা প্রদান করে। অপরাপর জাতির জন্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য এরূপ নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত স্বাধীনতা ক্ষতিকর। পশ্চিমারা অপরাপর জাতির জন্য যে স্বাধীনতা বরাদ্দ করে তা উক্ত জাতিসমূহের যুবসমাজের ধ্বংসের কারণ হয়। অপর জাতিকে পদানত করে।

৬. **ইমাম খোমেনী স্বৈরাচারী ও পাশ্চাত্যের ক্রীড়নক মুসলিম সরকারগুলির কঠোর সমালোচনা করতেন। তিনি এসব দেশের জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বান জানান। তাঁর ইন্তেকালের ২৬ বছর পরও তাঁর ঐ বার্তার প্রতি সাড়া দিচ্ছে মুসলিম বিশ্ব ও আরব বিশ্বের জনগণ। দেশে দেশে মুসলিম জাগরণ তাঁর এই আহ্বানের ধারাবাহিকতা।**

www.pathagar.com

স্বাধীন থাকার পন্থা

এ প্রসঙ্গে ইমাম খোমেনী বলেছেন, "যতদিন পর্যন্ত কোনো জাতি তাঁর প্রকৃত অধিকারকে দৃঢ় ঈমান, সচেতনতা ও অবিচলতা দিয়ে রক্ষা করবে—ততদিন সে জাতি মাথা উঁচু করে রাখতে সক্ষম হবে।" তিনি স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জনের আহ্বান জানান।

ইরানী বিপ্লবের ধারাবাহিকতা

অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল মুসলমানদের পরাজয়ের শতাব্দী। ৭ম শতাব্দী থেকে দীর্ঘ ১০০০ বছর মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতায় বিশ্বের নেতৃস্থানীয় আসন ধরে রেখেছিল কিন্তু নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে স্থবিরতা দেখা দেওয়ায় এবং উদীয়মান ইউরোপীয় শক্তির মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায়—সর্বোপরি ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে সরে যাওয়ায় মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে মাথামোটা পেশীশক্তিসম্পন্ন শাসকদের আবির্ভাব ঘটে। ভোগবিলাসে নিমজ্জিত থাকা এসব শাসকগণ ধূর্ত ইউরোপীয়দের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদান করতে গিয়ে পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা, স্বাধীনতা, মর্যাদা ও পরিচিতি হারায়। **ধূর্ত ও অভিশপ্ত ইহুদীরা এবং তাঁদের সাগরেদ পশ্চিমা জলদস্যুরা উত্তর ও মধ্য আমেরিকা লুণ্ঠনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে ভারতে এসে পৌঁছায়। ভারতের রাজা-বাদশারা এদের সাথে বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করে জনগণকে ইউরোপীয়দের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করে। এরই ধারাবাহিকতায় এদেশের বর্ণ হিন্দুদের অর্থ সহায়তা ও ষড়যন্ত্র এবং মুসলিম আমলাদের ক্ষমতালিপ্সায় প্রথমে সমৃদ্ধ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দখল নেয় ইউরোপীয়রা। পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশ ও ইউরোপীয় উপনিবেশে পরিণত হয়।**

ইরানের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। ইউরোপীয় ইহুদী-খ্রিষ্টান জোট নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাদের প্রত্যেক্যের নীতি ছিল প্রতারণামূলক। তারা তৎকালীন মুসলিম দেশসমূহের অদূরদর্শী শাসকদের সাথে সুন্দর-সুন্দর শিরোনামে চুক্তি করত এবং প্রয়োজনের সময় চুক্তিভঙ্গ ও প্রতারণা করত। ইরান সম্রাট ফাতহে আলী শাহের আমলে (১৭৯৭-১৮৩৪) ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার মানসে ১৮০৭ সালে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ইরান সম্রাটের সাথে ইরান-ফ্রান্স মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে। ইতিপূর্বে ১৮০১ সালে ইরান-ব্রিটেন রাজনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় ফ্রান্সের বিপরীতে রাশিয়া-ব্রিটেন গোপন সমঝোতা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমঝোতার পর রাশিয়া তৎকালীন ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ জর্জিয়াসহ বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। ইরান-ফ্রান্স বাণিজ্য চুক্তি করার পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে ১৮০৭ সালে রাশিয়া-ফ্রান্স তিলসিৎ চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ইরানকে উপেক্ষা করা হয়। ১৮১২ সালে রুশ আগ্রাসন থেকে নিজেকে রক্ষায় ইরান ব্রিটেনের সাথে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে নিজেদের সার্বভৌমত্ব হারায়। ব্রিটেনের সাথে ইরান প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করায় রাশিয়া ইরানের উত্তরাঞ্চলে সসৈন্যে হাজির হয়। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেয়া ব্রিটেন নিশ্চুপ থাকে। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের গোপন চক্রান্তে ইরান রাশিয়ার সাথে তুর্ক মানচাই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে উত্তর ইরানে রুশ দখলকে বৈধতা দেয়। এভাবে এ শতাব্দীর মুসলিম শাসকরা শুধুমাত্র নিজেদের গদিরক্ষার জন্য দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদতলে বলি দিয়ে জনগণকে অবর্ণনীয় শোষণ-নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে।

মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্য এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা যখন ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের উপর নীতি-নৈতিকতাহীন মুসলমান নামধারী জালেম শাসক চেপে বসে। অতঃপর উক্ত জালেম শাসক নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে চুক্তি করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেয়। এমতাবস্থায় দেশের আলেম সমাজ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী মুসলমানরা অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। পুনরুদ্ধারের পর আলেম ও বুদ্ধিজীবী সমাজ যখন রাজনীতিবিমুখ হয়ে যায় অথবা সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য দরবারী আলেমে পরিণত হয় তখনই পুনরায় পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের পতন শুরু হয়।

ইরান-ব্রিটেন ১৮১২ সালের চুক্তি ও ইরান-রাশিয়া তুর্কমানচাই চুক্তির মাধ্যমে ইরান যখন দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশে পরিণত হয় তখনই ইরানের আলেমগণ ও ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ সংগ্রাম থেমে থেমে ইমাম খোমেনীর 'মারজা' হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ দীর্ঘ সংগ্রামে বিজয়ী না হওয়ার কারণ ছিল যুগোপযোগী ও দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব এবং জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করতে না পারা। ইমাম খোমেনী উপরোক্ত কারণসমূহ অনুধাবন করে সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেন এবং জনগণের সাংস্কৃতিক শক্তি ও ইরানী সমাজের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি প্রদান করে সাফল্য লাভ করেন। সর্বোপরি সাফল্য লাভের পর তিনি উপরোক্ত আলেমদের ন্যায় রাজনীতি থেকে দূরে সরে না গিয়ে জীবনের

www.pathagar.com

শেষদিন পর্যন্ত বিপ্লবের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর মিশন অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্য নেতৃত্ব রেখে যান।

ইরানের ইসলামী আন্দোলন দমনে সরকারি কার্যক্রম

ইমাম খোমেনী ১৯৬২ সালে 'প্রধান মারজা' নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে তিনি আলেম সমাজ ব্যতীত সাধারণ জনগণের নিকট প্রায় অপরিচিত ছিলেন। 'মারজা' হওয়ার পর তিনি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার নির্দেশনায় পরিচালিত ইরান সম্রাটের ইসলামবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং দ্রুত জনমত গঠন করেন। ৫ জুন ১৯৬৩ সালে কোমের ফায়জিয়া মাদ্রাসায় এরূপ একটি প্রতিবাদ সভা চলাকালে শাহী পুলিশ ও সামরিক বাহিনী জনগণের উপর পৈশাচিক হামলা করে। এতে শত শত লোক নিহত হয়। এরপর থেকেই এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইরানী বিপ্লব জনগণের আত্মদানের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। সরকার উত্তরোত্তর দমন-নিপীড়ন-হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি করে এবং জনতার আন্দোলন ইমাম খোমানীর দিক-নির্দেশনা ও শহীদী রক্তের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যায়।

সরকারের দমন নীতি

১. আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ইমাম খোমেনীকে প্রথমে গ্রেফতার করা হয় অতঃপর কয়েকমাস পর মুক্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দরবারে ডাকা হয়। ইমাম খোমেনী প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিমত পোষণ করায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর মুখে থাপ্পড় দেন। এই থাপ্পড়ের প্রতিশোধ হিসেবে তাঁর অনুসারীরা কিছুদিন পর প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করে। অতঃপর ইমাম খোমেনীকে ইরান থেকে বহিষ্কার করে দীর্ঘ ১৪ বছর নির্বাসনে থাকতে বাধ্য করা হয়।

২. উক্ত গণহত্যার পর সরকার সামরিক আদালত গঠন করে প্রহসনের বিচারের ব্যবস্থা করে কিছুসংখ্যক বিপ্লবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করে। ইমামের ঘনিষ্ঠ অনুসারী তেহরানের ২ জন শীর্ষস্থানীয় আলেমকে জনসমক্ষে ফাঁসি দিয়ে জনমনে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করা হয়।

শাহ সরকারের রাজনৈতিক তৎপরতা

১. ৫ জুনের হত্যাকাণ্ডের পর শাহ পুরোপুরি আমেরিকার আশ্রিতায় পরিণত হয়। তখন থেকে শাহের নিরাপত্তার নামে প্রকাশ্যে ও দ্রুততার সাথে ইরানী সশস্ত্র বাহিনী, অর্থনৈতিক সেক্টর ও সামাজিক সেক্টরে মার্কিন উপদেষ্টারা কর্তৃত্বের আসন দখল করে। মার্কিন ও ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা ঝড়ের গতিতে ইরানে এসে ইরানের খনিজসম্পদ পাচারে লিপ্ত হয়।

www.pathagar.com

২. শাহ মার্কিনীদের অনুমোদন সাপেক্ষে রাশিয়া ও প্রাচ্যের সাথে সীমিত সম্পর্ক গড়ে তোলে।

৩. আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ইরানের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের বুকে শাহ শাসিত ইরান হয়ে উঠে ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষক এবং মার্কিনীদের বন্ধুদের বন্ধু ও মুসলিম বিপ্লবীদের দুশমন।

৪. **এ সময় ইরানে কোনো প্রকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। বাংলাদেশের ৫ জানুয়ারি ২০১৪ নির্বাচনের ন্যায় নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট বা মজলিশ গঠন করা হতো। মজলিশ ও গঠিত সরকার ছিল আমেরিকার লিখিত নাটকসমূহের নাট্যমঞ্চ মাত্র। নিজের সুবিধার জন্য ও জনগণকে প্রতারিত করার জন্য তা ভেঙ্গে দেয়া হতো—আবার গঠন করা হতো।**

৫. সরকার তেল বিক্রির অর্থ পারিবারিক ভোগবিলাস ও শহরগুলিকে চাকচিক্য করার কাজে ব্যয় করত, যাতে জনগণ মনে করে যে, ইরানের উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু গ্রাম এলাকার জনগণ চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয়ে গৃহহীন ও ভূমিহীনে পরিবর্তিত হচ্ছিল।

৬. ৫ জুনের উদ্ভূদ জনবিক্ষোভকে দমন করার জন্য শাহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আসাদুল্লাহ আলমকে পদচ্যুত করেন ও তদস্থলে নবগঠিত কানুনে মোতারাককী দলের হোসেন আলী মানছুরকে নিয়োগ করা হয়। ইমামের মুখে থাপ্পড় মারার কারণে বিপ্লবী শহীদ মোহাম্মদ বোখারায়ী ও শহীদ সাইয়্যেদ আলী আন্দার্যগুর প্রধানমন্ত্রী হোসেন আলীকে হত্যা করার পর তার সরকারের অর্থমন্ত্রী বাহাই ধর্মাবলম্বী আমীর আব্বাস হোভায়দাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তার সরকারের আয়ুষ্কাল ছিল দীর্ঘ ১৩ বছর।

৭. দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক ও ইসলামবিদ্বেষী আমীর হোভায়দা দীর্ঘ ১৩ বছর যাবৎ ইরানে মার্কিন এজেন্ডা বাস্তবায়নে রত ছিল। তার আমলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল নিম্নরূপ—

ক. ১৩/০৪/১৯৬৫ সালে শাহের একজন মুসলমান দেহরক্ষী শাহকে হত্যা করার জন্য গুলি করলে গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়। তখন শাহের পুত্রের বয়স ছিল পাঁচ বছর। এমতাবস্থায় শাহের স্ত্রীকে শাহের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে মজলিশ কর্তৃক সংবিধান সংশোধন করে তা অনুমোদন করা হয়।

খ. শাহী ব্যবস্থার প্রতি জনগণের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে হোভায়দা বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান-প্রধান অনুষ্ঠানগুলি ছিল—সিংহাসন আরোহণের রজতজয়ন্তী উৎসব, শাহের

www.pathagar.com

মুকুট ধারণ উৎসব, শাহী ব্যবস্থার আড়াই হাজারতম বার্ষিকী উৎসব ও শাহের পিতা রেজা খানের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। উল্লেখ্য, রেজা খান ছিল উত্তর ইরানে রুশ দখলদারী বজায় রাখার জন্য গঠিত কাজজাক বাহিনীর ছোটখাটো সেনাকর্মকর্তা (৬০ গুলির অধিকারী কর্মচারী) উক্ত তথাকথিত আড়াই হাজারতম বার্ষিকী উৎসবে এতবেশি জাঁকজমক ও অর্থব্যয় করা হয় যে, শাহী রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হয়ে পড়ে।

গ. হোভায়দা বেশ কয়েকটি ফরমায়েসী রাজনৈতিক দল গঠন করে, তন্মধ্যে মিল্লিউন (জাতীয়তাবাদী) মারদেম (Democrates) ও হেযবে ইরান নাভীদ অন্যতম।

ঘ. ১৯৭৪ সালে হোভায়দা সব দলকে একত্রিত করে একটি দল গঠন করে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে এই দলের সদস্য হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। এ দলের নাম ছিল 'হেযবে রাস্তাখীযে মিল্লাতে ইরান'। দল গঠনের পর শাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, "যে কেউ সার্বজনীন ও জাতীয়ভিত্তিক এ দলের সদস্য হতে চাইবে না সে যেন পাসপোর্ট সংগ্রহ করে ও দেশ ত্যাগ করে। ফলে সরকারের মন্ত্রী-আমলাসহ সবাই এই দলের সদস্য হয়। ১৯৭৫ সালে বিরোধী দল সৃজনের জন্য এ দলকে দুভাগে বিভক্ত করা হয় ও ১৯৭৮ সালে এ দলটি বিলুপ্ত করা হয়।

(বাংলাদেশী পাঠকগণ : উপরোক্ত তথ্যে আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শাহের অনুকরণে 'বাকশাল' গঠন করেছিলেন এবং সব বাঙালিকে এ দলে যোগদান বাধ্যতামূলক করে আদেশ জারি করেছিলেন। ইরানের শাহ তাঁর বানানো 'বাকশাল' বিলুপ্ত করেছিলেন কিন্তু আমাদের শাহ সে সময় পাননি)।

দমন-পীড়নে পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর তৎপরতা

১. সি.আই.এ ও মোসাদ-এর তত্ত্বাবধান ও ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থা সাভাক (সয়মনে এত্তে লঅৎ আমনীয়াতে কেশভার) গঠন করা হয়। এদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ও নির্যাতনযন্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এরা দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারসমূহে ব্যাপক গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ওলামায়ে কেরাম, শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করে জেলখানায় চরম নির্যাতন করা হতো।

২. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরকারবিরোধী ছাত্র -শিক্ষকদের দমনের জন্য 'গার্দে

www.pathagar.com

দানেশ গাহ' নামক একটি সুসজ্জিত প্রকাশ্য বাহিনী গঠন করা হয়। এরা বড় বড় বাজারগুলো নিয়ন্ত্রণ করত এবং দোকান বন্ধ থাকা অবস্থায়ও যাতে দোকানের অভ্যন্তরে দেখা যায় তার জন্য দোকানের বিভিন্ন অংশে ছিদ্র করে দিত।

৩. কাউকে শাহবিরোধী হিসাবে সন্দেহ করা হলে তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নির্যাতন করা হতো, সামরিক আদালতে বিচারের প্রহসন করে শাস্তি দেয়া হতো, মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো। কারাগারের নির্যাতনে এ সময় ইরানের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নিহত হয়।

৪. গণবিরোধী নির্যাতন চরমে উপনীত হলে বিপ্লবীরা সশস্ত্র হয় এবং ইরানের রাস্তায় রাস্তায় সাভাকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

শাহ্ সরকারের সাংস্কৃতিক তৎপরতা

১. আলেম সমাজ সরকার বিরোধিতায় অগ্রগামী হওয়ায় শাহ আলেম ও ইসলামকে নিজের প্রধান প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে। ফলে শাহ সরকার ইরানে প্রাক-ইসলামী সংস্কৃতি আমদানি ও চর্চা করার ব্যবস্থা করে, যাতে ইরানী জনগণ নিজেদেরকে মুসলমান মনে না করে প্রাক-ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক-বাহক মনে করে।

২. ইসলাম-পূর্ব ইরানের বিখ্যাত সম্রাট সাইরাস এবং দারিয়ুসের পোশাক চালু করা হয় এবং প্রাক-ইসলামী সংলাপগুলি গণমাধ্যমের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চালু করা হয়।

৩. ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে তথাকথিত শাহানশাহী সংস্কৃতি চালু করা হয়। ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রতিনিধিত্বকারী শিল্পকলা, হস্তশিল্প, অলঙ্কারাদির প্রচলন ও প্রদর্শন শুরু করা হয়। নামকরণ, আনন্দ উৎসব, পাঠ্যপুস্তকের বক্তব্য, চলচ্চিত্র ও পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির বিপরীতে ইসলাম-পূর্ব যুগের সংস্কৃতিকে শাহানশাহী সংস্কৃতি নামে চালু করা হয়।

৪. রাসুল (সঃ)-এর হিজরতের বছরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইরানে যে ফার্সী সন (হিজরী শামসী) চালু ছিল তা বাতিল ঘোষণা করা হয়। শাহের সিংহাসন আরোহণের ২৫০০ বছর পূর্বে এ পঞ্জিকার সূচনা সাব্যস্ত করা হয় এবং হিজরী শামসী পঞ্জিকাকে অ-ইরানী ঘোষণা করা হয় এবং ইরানী জাতির সাথে ইসলামের সম্পর্ক অস্বীকার করা হয়। ৯৮% মুসলমানের দেশে শাহের এ পদক্ষেপ শাহকে জনগণ থেকে মুছে ফেলতে সহায়তা করে। ইহুদী ও বাহাই সম্প্রদায় শাহের একান্ত সুহৃদে পরিণত হয়।

৫. তরুণ সমাজ যাতে শাহবিরোধী চিন্তা করার সময় না পায় এ জন্য শাহ

www.pathagar.com

ইরানে অশ্লীল চলচ্চিত্র চালু করে এবং রেডিওতে যৌন উত্তেজক গান বাজনা চালু করে। নেশাদ্রব্য সহজলভ্য করা হয়, যাতে যুবসমাজ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

৬. বাহাই সম্প্রদায়ভুক্ত ইরানী প্রধানমন্ত্রী আমীর হোভায়দা তরুণ-তরুণীদেরকে উশৃঙ্খলতা ও বেল্লেল্লাপনায় নিমজ্জিত করার লক্ষ্যে দেশের বড় বড় জনসমাগম কেন্দ্রে 'তরুণদের প্রাসাদ' নামে অনেকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এসব কেন্দ্রে উশৃঙ্খল তরুণ-তরুণীদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা প্রদান করা হতো। এই তরুণ-তরুণীরা পশ্চিমা পোশাক পরিধান করে পশ্চিমা নগ্নতা ও বেহায়াপনা চালু করে এবং পরবর্তীতে স্কুল-কলেজে ইসলামী পোশাক পরিহিত তরুণীদেরকে প্রবেশে বাধা দিত।

৭. **দেশের তরুণ সমাজ যেন স্বদেশের শোষিত-বঞ্চিত জনগণকে বিজাতীয় শক্তির গোলামী থেকে উদ্ধার করার চিন্তা করতে অক্ষম হয় এজন্য উক্ত 'তরুণদের প্রাসাদ' এর তত্ত্বাবধানে সারা দেশে অসংখ্য মদের দোকান চালু করা হয়। মদের প্রকাশ্য দোকান লাইব্রেরির চেয়েও বেশি ছিল। বিনোদন ক্লাব, জুয়া খেলার আসর, মাদকের আসর, অশ্লীল ছবি, সিনেমা, ভিডিও, ব্লুফিল্মের ক্যাসেট, রেডিওতে প্রচারিত অশ্লীল গান ইরানী তরুণ-তরুণীদের বিপুল অংশকে যৌনতা, অনৈতিকতা ও অপকর্মে নিমজ্জিত করেছিল।**

৮. এতদসত্ত্বেও যেসব তরুণ-তরুণী উপরোক্ত বেলেল্লাপনার প্রতি আগ্রহী হতো না তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিতর্কমূলক বই ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হতো। এসব বিতর্কের বিষয় ছিল প্রধানত প্রাচীন সাহিত্য (ইসলাম-পূর্ব) বনাম বর্তমান সাহিত্য, আধুনিক কবিতা বনাম গতানুগতিক (ইসলামী) কবিতা, গতানুগতিক (ইসলামী) সংস্কৃতি বনাম আধুনিক (শাহানশাহী) সংস্কৃতি এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ক বিতর্ক।

সরকারি কর্মপন্থার বিপরীতে দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী ও আলেমদের কর্মপন্থা

সরকারি কর্মপন্থার বিপরীতে জনগণের সংগ্রামকেও তিনভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। বিষয়গুলি হলো—১. রাজনৈতিক সংগ্রাম, ২. সশস্ত্র সংগ্রাম, ৩. সাংস্কৃতিক সংগ্রাম।

রাজনৈতিক সংগ্রাম

৫ জুন ১৯৬৩ সালে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে পরিচালিত রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের

www.pathagar.com

পর ইরানে সরকারবিরোধী সকল কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইতিপূর্বে ইরানী জনগণের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য মিল্লী (National Front) নামক রাজনৈতিক সংগঠন কার্যক্রম পরিচালনা করত। এ দলটি জাতীয়তাবাদী দলের ন্যায় ছিল। আজাদী আন্দোলনে ইসলামকে সম্পৃক্ত করতে এরা দ্বিধান্বিত ছিল। ১৯৬০ সালে এ দল থেকে বেরিয়ে এসে মরহুম আয়াতুল্লাহ তালেকানী, ইঞ্জিনিয়ার মেহেদী বাযারগান ও ড. সাহাবী 'নাহযাতে আযাদী' (ইরান মুক্তি আন্দোলন) নামক দল গঠন করেন। এ দল স্বাধীনতা সংগ্রামে ইসলামকে সম্পৃক্ত করার পক্ষে কাজ করেছে।

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে পরিচালিত ১৫ খোরদাদের (৫/৬/১৯৬৩) রক্তাক্ত গনঅভ্যুত্থানের পূর্বেই সরকার নাহযাতে আযাদী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করে। ১৫ খোরদাদের পর গঠিত সামরিক আদালত এ দলের অনেককে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৫ খোরদাদের গণঅভ্যুত্থানের পর ইমাম খোমেনী ইরানের মুসলিম জনগণের দৃষ্টিতে শীর্ষস্থানীয় নেতায় পরিণত হন। এ সময় থেকে জনগণ ইরানে অবস্থিত বিভিন্ন মারজা থেকে এবং মারজার সাথে জড়িত আলেম ও ছাত্রদের নিকট থেকে ইমাম খোমেনীর ফাতওয়া, ঘোষণাপত্র, বাণীর নির্দেশ ও ক্যাসেটে তাঁর বক্তব্য শুনে আন্দোলন পরিচালনা করত। শাহী সরকার ইরানের দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাদ্রাসা পরিচালনার চালিকাশক্তি তথা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এমতাবস্থায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় মাদ্রাসাগুলি চালু রাখা হয়।

ইমাম খোমেনীর ছাত্রদের দ্বারা গঠিত আন্দোলনের নিউক্লিয়াসই আন্দোলনের পরিচালিকা শক্তি ছিল।

এ যুগে শাহ কর্তৃক বহিষ্কৃত বুদ্ধিজীবী, আলেম ও বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্ররা প্রবাসে বিভিন্ন সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। এ সকল সমিতি সরকারের ভোগ, বিলাস, আরাম-আয়েশ, আমোদ-ফুর্তি-অপচয়ের কথা, দেশবিরোধী চুক্তি ও কর্মকাণ্ডের কথা, সরকারের জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন নিপীড়নের কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতেন।

সশস্ত্র সংগ্রাম

প্রকাশ্যে ভিন্নমত পোষণ করার সুযোগ না থাকায় এ যুগে প্রতিবাদী জনগণ বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ গঠন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

১. **ইসলামী কমিটিসমূহের ফেডারেশন**—প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলে ইমামের নির্দেশে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা পরিচালনার লক্ষ্যে

www.pathagar.com

এটি গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে শাহী সরকার ইমামকে দেশ থেকে বহিষ্কার করলে এ কমিটি একটি সামরিক শাখা গঠন করে। শাহী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও নীতি-নির্ধারকদের হত্যা করা ছিল সামরিক শাখার লক্ষ্য। এ শাখাই প্রধানমন্ত্রী আলী মানছুরকে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের পর শাহী সরকার ফেডারেশনের অসামরিক শাখার শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তন্মধ্যে ৪ জনকে সামরিক আদালত মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে এবং ইমামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বিপ্লবের অন্যতম নেতা হাজী মাহদী এরাকী'কে দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

২. **হেযবে মেলালে ইসলামী**—এ গ্রুপটি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সংগঠনে গঠিত হয়। এরা সশস্ত্র গেরিলা তৎপরতা গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে তেহরানের পার্বত্যাঞ্চলে এ গ্রুপের সাথে সরকারি বাহিনীর রক্তাক্ত লড়াই সংগঠিত হয়, এ গ্রুপের অনেকে নিহত হয় এবং ৫৫ জন গ্রেফতার হয়। সামরিক আদালতের মাধ্যমে এদের বিচার করা হয়। এ গ্রুপটি সফল না হলেও এদের কার্যকলাপে জনগণ উজ্জীবিত হয়।

৩. **মুজাহিদীনে খালক**—নেহযাতে আজাদীর কিছু সদস্য এবং একদল মুসলিম যুবক এ দলটি প্রতিষ্ঠা করে। সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার বিরুদ্ধে এ দল গঠিত হয় এবং গোপন ও সশস্ত্র তৎপরতা গ্রহণ করে। এরা ইসলামকে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার সাথে গুলিয়ে ফেলে। এরা আলেমদের সাথে যোগাযোগ রাখত কিন্তু কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পদ্ধতি গ্রহণ করে চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। এরা দীর্ঘদিন শাহী সরকারের বিরুদ্ধে গোপন সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনা করে অবশেষে সরকার ১৯৭৩ সালে এদেরকে চিহ্নিত করে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অবশিষ্ট সদস্যরা ১৯৭৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদেরকে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট হিসাবে ঘোষণা দেয় ফলে জনমন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৪. **ফেদায়িয়ানে খালক**—এটি একটি সশস্ত্র মার্ক্সবাদী গেরিলা গ্রুপ। ১৯৭১ সালে সরকার এর সন্ধান পায় এবং এদেরকে সিয়াকোলের জঙ্গলে অবরোধ করে। উভয় পক্ষে সংঘর্ষের পর এদের অনেকে নিহত হয় এবং গ্রেফতার হয়। ১৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৭০ থেকে '৭৫ সালের মধ্যে সরকার অনেকগুলি সশস্ত্র মার্ক্সবাদী গ্রুপের সন্ধান পায়, ফেদায়িয়ানে খালক ও এসব গ্রুপ সাভাকের অনেক সদস্যকে অতর্কিত হামলায় হত্যা করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৬ সাল নাগাদ সরকার এদের

www.pathagar.com

অনেককে দমন করে ফেলে। ১৯৭৭ সালে এসব গ্রুপের অবশিষ্টাংশরা আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধের ঘোষণা করে এবং বাম রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। মূলত বামপন্থীদের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের সহানুভূতি না থাকায় এরা গণভিত্তি অর্জন করতে না পেরে ব্যর্থ হয়।

৫. ১৫ খোরদাদের গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়ায় ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি ছোট ছোট ইসলামপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ আত্মপ্রকাশ করে। জনগণের সহানুভূতি লাভে সফল হওয়ায় এরা শাহী সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব-পূর্ব পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

সাংস্কৃতিক সংগ্রাম

ইমাম খোমেনী তাঁর দৃঢ়তা, আপোষহীনতা, তাকওয়া, পরহেযগারী দ্বারা তাঁর নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থান ও তাঁর জীবনাচার দ্বারা ইসলামী সংস্কৃতিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও মূর্তিমান করে তুলেছিলেন। ফলে শাহী সরকারের শত অপতৎপরতা সত্ত্বেও আলেমদের যুগোপযোগী নেতৃত্বে ইসলামী সংস্কৃতি অনৈসলামিক সংস্কৃতির উপর বিজয় লাভ করে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এ লড়াইয়ে ইরানের মুসলিম জনগণের বিজয়ের মূল কারণ ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সত্যতা, যথার্থতা, শক্তি ও মৌলিকত্ব। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের লড়াইয়ে ইরানের মুসলিম জনগণের বিজয় যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তখনই ইমাম শাহী সরকারের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার আহ্বান জানান। ইরানের মুসলিম জনগণের সাংস্কৃতিক সংগ্রামই ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের পথকে সম্ভব করে তুলেছিল।

ক. **সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে বিজয়ের সোপানসমূহ**—নির্বাসনে থাকাকালীন ইরাকের নাজাফে দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রে ইমাম যে সব রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করতেন তাঁর সমষ্টি ছিল 'বেলায়েতে ফকীহ' (মুজতাহিদ আলেমের শাসন) নামক বইটি। উক্ত গ্রন্থটি নাজাফে পাঠ্য করা হয় এবং ইমামের অনুসারীরা তা ইরানের দ্বীনি কেন্দ্রসমূহের উচ্চতর পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইসলামী হুকুমতের মূলনীতি ও ভিত্তি, ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং হুকুমত প্রশ্নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

খ. কুরআন মজীদের তথ্যাবলী ও শিক্ষাসমূহ এবং ইসলামী মূল্যবোধসমূহ উপস্থাপন, তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করে তোলা এবং ইসলামের কাঠামোর উপর আরোপিত বিভিন্ন বিদআত, কুসংস্কার ও বিকৃতি চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের শিক্ষা প্রদান। এ বিষয়ে সবচেয়ে সফল শিক্ষক ছিলেন শহীদ

www.pathagar.com

অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মোরতাজা মোতাহহারী। তিনি ইমামের ছাত্র ছিলেন।

গ. **দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানোন্নয়ন**—এজন্য যুগোপযোগী সিলেবাস, পরিকল্পনা ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। আল্লামা মোহাম্মদ হোসেন তাবাতাবায়ী, শহীদ আয়াতুল্লাহ কুদ্দুসী ও শহীদ আয়াতুল্লাহ বেহেশতী এ বিষয়ে সর্বাধিক অবদান রাখেন।

ঘ. পুঁজিবাদী, পাশ্চাত্যবাদী-সমাজবাদী ও কম্যুনিস্টদের বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারাসমূহের অসারতা ও অযথার্থতা প্রমাণ করে ইসলামের যথার্থতা তুলে ধরে প্রবন্ধ রচনা ও বক্তব্য প্রদান।

ঙ. প্রাক-ইসলামী ইরানের তথাকথিত শাহানশাহী সংস্কৃতির অসারতা ও অগ্রহণযোগ্যতা জনগণের সামনে যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরা।

চ. শাহী সরকার প্রবর্তিত অনাচার ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

ছ. **আলেম ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীরা দ্বীনি কেন্দ্র এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ রচনা করে, সাহিত্য সাময়িকী, অনুবাদ সাহিত্য প্রচার করে, নাটক, কবিতা রচনা করে ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধকে শিক্ষিত সমাজের নিকট তুলে ধরতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিতদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করতে সক্ষম হন ড. আলী শরীয়তী।**

বিপ্লবের রক্তাক্ত বিজয়

বিজয় পূর্ববর্তী অবস্থা

১. শাহের তথাকথিত শ্বেতবিপ্লব, শাহানশাহী ব্যবস্থা ও শাহ কর্তৃক প্রচলিত অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আলেম ও বুদ্ধিজীবীরা যতই সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছিল শাহ সরকার ততই তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করছিল। আলেমদের বক্তৃতা করার সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

২. ১৯৭১ সাল থেকে ইরান তেল রফতানি শুরু করায় শাহের সহযোগীরা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হতে থাকে। তারা শাহের সকল অপকর্মে সহায়তা দিত, পক্ষান্তরে ধনী-গরীবের ব্যবধান দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় জনগণ দলে দলে শহরমুখী হতে থাকে কাজের খোঁজে।

৩. শাহী সরকারের তৎপরতায় সশস্ত্র গ্রুপসমূহ নির্মূল হলেও নিরস্ত্র বিপ্লবীদের দ্বারা কারাগারসমূহ পূর্ণ হয়ে যায়।

৪. মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের নির্দেশে শাহ তাঁর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং ঘৃণিত প্রধানমন্ত্রী হোভায়দাকে অপসারণ করে জামশিদ আমুযেগারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। পত্র-পত্রিকাকে সীমিত স্বাধীনতা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

৫. সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে শাহ ভালোমানুষীর ভাব করলেও শাহ তাঁর প্রধান শত্রু নাজাফে অবস্থানরত ইমাম খোমেনীকে ভুলতে পারেননি। তিনি ইমামকে দমন করার লক্ষ্যে ইমামের দীর্ঘ প্রবাস জীবনের সহচর তাঁর পুত্র মুজতাহিদ আলিম পুত্র মোস্তফা খামেনীকে হত্যার ব্যবস্থা করে।

৬. মোস্তফা খামেনীর শাহাদাতের খবর ইরানে পৌঁছালে সমগ্র ইরানের দ্বীনি কেন্দ্রসমূহ, মসজিদ মক্তব, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে আলোচনা সভা, শোকগাথা ও শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রবাসী ইরানীরা বিভিন্ন দেশে শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করে শাহের অপকর্ম তুলে ধরে। মোস্তফা খামেনীর শাহাদাতের ৩য় দিবস, ৭ম দিবস ও চল্লিশতম দিবসে দেশব্যাপী শোকানুষ্ঠান আয়োজন করে শাহবিরোধী গণজোয়ার সৃষ্টি করা হয় এবং নির্বাসিত নেতা ইমাম খোমেনী ইরানী জনগণের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।

৭. মোস্তফা খামেনীর শাহাদাতের চল্লিশতম দিবসে ইমাম খোমেনী নাজাফে তাঁর নিকট সমবেত লোকদেরকে বলেন, "মোস্তফার শাহাদাত আল্লাহ্ তায়ালার প্রচ্ছন্ন দয়া ও অনুগ্রহের অন্যতম। এর মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম, মাদ্রাসাছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা উজ্জীবিত হয়েছে। ইরানে গণসংগ্রামের উপযুক্ত সময় এসেছে।... আজ একটি নিষ্ক্রমণ পথ সৃষ্টি হয়েছে। এ শাহাদাত ইরানী জাতির জন্য সৌভাগ্যের আকর বয়ে এনেছে, আপনারা লিখুন, প্রতিবাদ করুন।... আজকে এমন একটি দিন এসেছে যেদিন মুখ খুলতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে।... আপনারা এ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। যদি এ সুযোগ হাতছাড়া করেন এবং শাহ সরকার ও মার্কিনীরা গুছিয়ে নিতে পারে তবে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের উপর চরম আঘাত হানবে।

৮. মোস্তফা খামেনীর শাহাদাতের মাধ্যমে ইরানে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়—জনগণ ইমাম খোমেনীকে তাদের প্রধান নেতা হিসাবে ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় ইমাম খোমেনীর জনপ্রিয়তা হ্রাস করতে সরকার ৬ জানুয়ারি ১৯৭৮ সালে 'দৈনিক এত্তেলাআতে' আহমদ রশীদি মোৎলাকের ছদ্মনামে ইমামের সম্মান ও মর্যাদাহানিকর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এ প্রবন্ধ আগুনে ঘি ঢালার কাজ সম্পন্ন করে। ধাপে ধাপে এ আগুন বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামে-শহরে অভ্যুত্থান সৃষ্টি করে, পরবর্তী ১ বছরের অব্যাহত রক্তাক্ত গণআন্দোলনের মুখে শাহ দেশ থেকে পালায় এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হয়।

৯. উত্তাল আন্দোলনের এক পর্যায়ে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখে ইমাম

www.pathagar.com

খোমেনী দেশব্যপী অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট আহ্বান করেন। বিপ্লবের বিজয় পর্যন্ত এই ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। অক্টোবর ১৯৭৮ সালে ইমামকে ইরাক থেকে ফ্রান্সে নির্বাসনে পাঠালে বিপ্লব আন্তর্জাতিক রূপ পায়।

১০. ইমাম খোমেনীর অবর্তমানে বিপ্লবকে বিজয়ী করার জন্য যেসব নেতৃবৃন্দ ইমামের নির্দেশনা মোতাবেক ইরানে কাজ করেছেন তাঁরা হলেন— আয়াতুল্লাহ তালেকানী, শহীদ জাভেদ বহোনার, আয়াতুল্লাহ মুসাভী আরদেবেলী, আয়াতুল্লাহ মাহাদাভী কানী ও হুজ্জাতুল ইসলাম হাশেমী রাফসানজানি। উনাদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল ওলামায়ে কেরামের কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ।

১১. ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে ইমাম খোমেনী দেশবাসীর প্রতি যেসব বাণী প্রেরণ করেছেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল :

১. যেসব হত্যাকাণ্ড ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে তার সবই শাহের নির্দেশে হচ্ছে। (৯/১/১৯৭৮)

২. সকল দুর্নীতি ও অনাচারের মূল উৎস হচ্ছে শাহ। (৯/১/১৯৭৮)

৩. জনগণের ঐক্য ও সমঝোতা হচ্ছে উপনিবেশবাদের মূলোৎপাটনের হাতিয়ার। (৯/১/১৯৭৮)

৪. চিন্তার ঐক্যের হেফাজত করুন এবং নিজেদের মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ থেকে দূরে থাকুন। (২২/১/১৯৭৮)

৫. মানবাধিকার সনদের সাক্ষরকারীরাই প্রধানত মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। (১৮/২/১৯৭৮)

৬. কোমের দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র ইসলাম ও ইরানকে জিন্দা করেছে। (১৮/২/১৯৭৮)

৭. বিজাতীয়রাই দ্বীন ও রাজনীতি পৃথকীকরণ তত্ত্বের প্রচারক। (১৮/২/১৯৭৮)

৮. আমেরিকা ও ইসরাইলের এজেন্ট শাহ মধ্যপ্রাচ্যের মানবদরদী? (১৮/২/১৯৭৮)

৯. পাহলভী বংশের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইরানী জাতি সংগ্রাম থেকে বিরত হবে না। (২৭/২/১৯৭৮)

১০. ইসলাম ও কোরআনের স্লোগান সহকারে সংগ্রামী জনতার কাতারসমূহকে ঘনসন্নিবেশিত করুন। (২৪/৩/১৯৭৮)

১১. শহীদদের রক্তের প্রতিটি ফোটাই উপনিবেশবাদের বৃক্ষে অগ্নিসংযোগ করছে। (২৪/৩/১৯৭৮)

www.pathagar.com

১২. ইসলামবিমুখ লোকদেরকে নিজেদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিন। (২৪/৩/১৯৭৮)

১৩. মুসলমানদের বড় বড় দুর্যোগ-বিপর্যয়ের উৎস হচ্ছে ইহুদীবাদী আমেরিকা। (২৪/৩/১৯৭৮)

১৪. আমরা এমনকি শাহের পতন ঘটানোর জন্যও বামপন্থীদের সাথে সহযোগিতা করবো না... তারা সুযোগ পেলে আমাদের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করবে। (৬/৫/১৯৭৮)

১৫. শাহ তাঁর অপকর্ম ও অপকৌশলের দ্বারা জনগণের মধ্যে সংঘটিত বিস্ফোরণের মোকাবেলা করতে চায়। (১৩/৫/১৯৭৮)

১৬. আপনারা আপনাদের অভ্যুত্থানকে সুসংঘটিত করুন। (১৩/৫/১৯৭৮)

১৭. ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনি নেতৃবৃন্দবিহীন গোষ্ঠীগুলোর কানাকড়িও মূল্য নেই। (১৩/৫/১৯৭৮)

১৮. ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী ইসলামী হুকুমত কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম থেকে বিরত হব না। (১৯/৫/১৯৭৮)

১৯. আমাদের সকল দুঃখ-দুর্দশার উৎস হচ্ছে আমেরিকা। (৩১/৫/১৯৭৮)

২০. আপনারা একবাক্যে শাহের পদত্যাগ দাবি করুন। এ ব্যাপারে শৈথিল্য ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা স্বরূপ। (৩১/৫/১৯৭৮)

২১. শাহ পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। (১০/৬/১৯৭৮)

২২. শাহ দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়াচ্ছে এবং কমিউনিস্ট ধারাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। (১০/৬/১৯৭৮)

২৩. শান্তি ও আপোষকামিতার গান গাওয়া এখন নিন্দনীয়। (১০/৬/১৯৭৮)

২৪. জনগণকে শাহবিরোধী অভ্যুত্থানের পথ থেকে বিচ্যুতকারী যে কোনো স্লোগানই শয়তানী মাত্র। (৪/৭/১৯৭৮)

২৫. জনগণের বিক্ষোভ শাহের প্রতি গোটা জাতির বিরোধিতাকেই প্রমাণ করেছে। (২৭/৭/১৯৭৮)

২৬. বর্তমান পরিস্থিতিতে নীরবতা অবলম্বন এবং নীরবতার নির্দেশ দান ইসলামের স্বার্থের পরিপন্থী। (২৭/৭/১৯৭৮)

২৭. সশস্ত্র বাহিনী এবং পদস্থ ব্যক্তিদের সত্যের বাহিনীর কাতারে এসে দাঁড়ানো উচিত। (১৩/৮/১৯৭৮)

২৮. শাহবিরোধী ইসলামী স্লোগানকে সমুন্নত রাখুন। (১৩/৮/১৯৭৮)

www.pathagar.com

২৯. উপনিবেশবাদের অনুচর স্বৈরশাসকের সাথে আপোষের পরিণাম হচ্ছে জাতিকে বন্দীত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এবং দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া।... জালেম ও শক্তি মদমত্ত সরকারের বিলুপ্তি পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখুন এবং বেআইনি সরকারের কোনো অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতির প্রতি কর্ণপাত করবেন না। (৩০/৮/১৯৭৮)

৩০. ৮ অক্টোবর ১৯৭৮ সালে ইমাম খোমেনী ইরানের স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে বাণী প্রেরণ করেন তা হলো :

"আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের পরিবেশে সচেতনভাবে ও নিষ্ঠার সাথে উত্থান কর, পরস্পরের সাথে যোগাযোগ কর এবং ইসলাম ও দেশের মুক্তির জন্য চেষ্টা কর।

সর্বাগ্রে ইসলামের পবিত্র হুকুম-আহকামের অনুসরণ কর, কারণ এসব আহকাম হচ্ছে জাতিসমূহের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা প্রদানকারী। যেসব উপদল বিজাতীয়দের প্রচারণার ফলে প্রতারিত হয়েছে, বিভিন্ন মতাদর্শকে গ্রহণ করেছে ও সেসবের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে তাদেরকে দুশমনের প্রতারণা ও অপকৌশল সম্পর্কে সচেতন কর এবং বিকৃত মতাদর্শসমূহের প্রচারক নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস করে দাও। দেশকে মুক্তি দানের লক্ষ্যে অনৈক্য ও বিভেদ থেকে কঠোরভাবে দূরে থাক।

ইরানের সন্তানগণ, আমাদের মহানজাতি শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতি কোনোভাবেই ঝুঁকে পড়তে চায় না। এ কারণেই এ জাতি ডানপন্থী বামপন্থী হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণেই প্রতিদিন এরা উভয়ের হাতে নিহত হচ্ছে। তোমরা শুধু নিজ জাতির সাথে তোমাদের বন্ধনকে সুদৃঢ় কর।"

৩১. ১৯৭৮ সালের শেষদিকে পবিত্র মুহররম মাস আগমনের প্রাক্কালে ইমাম জাতির উদ্দেশ্যে যে বাণী প্রেরণ করেন তা হলো : "মুহররম মাসের আগমনে গৌরব গাথা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মাস শুরু হলো, যে মাসে তলোয়ারের উপর অশ্রুজলের বিজয় ঘটে, যে মাসে সত্যের শক্তি বাতিলকে চিরদিনের জন্য নিন্দিত করে দিয়েছে, জালেম-অত্যাচারীদের জোট ও শয়তানী হুকুমতসমূহে বাতিলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। যে মাস সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে

www.pathagar.com

বর্শা ফলকের উপর বিজয়ী হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছে, যে মাসে ইমাম হোসাইন (রাঃ) আমাদেরকে ইতিহাসের জালেম নিপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ প্রদর্শন করেছেন। ...

মুহররম মাস ইসলামের সৈনিকদের, মহান ওলামায়ে কেরামের, সম্মানিত খতিবগণের সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইনের মর্যাদাবান অনুসারীদের হাতে এক খোদায়ী তলোয়ারের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, আপনারা এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করুন। আপনারা দেশবাসীকে শাহের পৈশাচিক কার্যকলাপ ও নিরীহ লোকদের হত্যা করা সম্পর্কে অবহিত করুন।... আর এটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই যে, মহররম উপলক্ষে আয়োজিত শোকসভাসমূহ আয়োজন করতে হবে স্বাধীনভাবে, শাহের পুলিশ বা নাশকতাবাদী নিরাপত্তাবাহিনীর অনুমতি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সরকার যদি শোকসভায় বাধা দেয় তবে আপনারা মাঠে-ময়দানে, রাস্তায়, চৌরাস্তায় অলিতে-গলিতে সমাবেশ করুন এবং শাহী সরকারের দেশদ্রোহীতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন, সরকার কর্তৃক সংগঠিত ইসলাম ও মুসলমানদের বিপদ-মুছিবত সম্পর্কে সতর্ক করুন।

ইরানের মহান জনগণ স্বীয় ইসলামী শক্তি দ্বারা শাহ ও তাঁর সহযোগীদের উপর মুষ্ঠাঘাত হেনেছেন দেখে আমি আন্তরিকতার সাথে আপনাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমি সত্যের রাস্তায় ও খোদায়ী লক্ষ্যে শাহাদাত বরণকে গৌরব ও চিরন্তনত্ব লাভ বলে মনে করি। যেসব তরুণ ইসলামের রাস্তায় ও মুক্তির চেতনায় রক্তদান করেছে আমি তাদের পিতা-মাতাদেরকে মোবারকবাদ জানাই। যেসব বীর তরুণ আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের প্রতি আমার ঈর্ষা হয়।... আপনাদের সক্ষম হাতে ইসলামী হুকুমতের গৌরবময় পতাকা বিশ্বের সকল প্রান্তে উড্ডীন হবে ইনশা' আল্লাহ।"

যুক্তরাষ্ট্রের শেষ প্রচেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্র তার গোলাম শাহকে নিরাপদে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলো। পরিকল্পনাটি ছিল এই যে, ৫০-এর দশকে ইরানের জনপ্রিয় দল ন্যাশনাল ফ্রন্ট-এর নেতা শাহপুর বখতিয়ারকে ৬/১/১৯৭৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হলো। জনগণ যাতে ইসলামী

www.pathagar.com

হুকুমত প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে বিচ্যুত হয় এজন্য জাতীয়তাবাদী শাহপুর বখতিয়ারের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত ব্যতীত জনগণের অন্যান্য দাবি পূরণের ব্যবস্থা করতেই বখতিয়ারকে ক্ষমতাসীন করা হয়। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বখতিয়ার এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করে যে—

১. শাহ দেশ থেকে চলে যাবেন।
২. বখতিয়ারের শাসন হবে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক।
৩. ইসলামের হুকুম-আহকাম রীতিনীতি মেনে চলা হবে।
৪. ওয়াক্‌ফসমূহ ওলামায়ে কেরামের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে।
৫. সাবেক অত্যাচারী প্রধানমন্ত্রী হোভায়দা, সাভাক প্রধান নাছিরীসহ সাবেক সরকারের সকল রাজনৈতিক ব্যক্তি ও আমলাদের বিচার করা হবে।
৬. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।
৭. সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে।

উক্ত প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর বখতিয়ার এই মর্মে হুমকি দেন যে, আমি যদি দেশ চালাতে সফল না হই তাহলে সশস্ত্র বাহিনী অভ্যুত্থান করবে এবং ইরানে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। ইরানের উপর কম্যুনিজম চেপে বসবে, ইরান রুশদের হাতে পড়বে এবং বিভক্ত হয়ে যাবে।

উপরোক্ত ঘোষণার পর পাশ্চাত্যসৃষ্ট বুদ্ধিজীবীরা বখতিয়ারের পক্ষে এবং 'ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক' এ মতবাদের পক্ষে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে। কিন্তু দূরদর্শী ইমাম খোমেনী আমেরিকার এই চালাকী অনুধাবন করে বখতিয়ারের সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করে জনগণকে আন্দোলন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় বখতিয়ারের মুখোশ খসে পড়ে এবং বিক্ষোভকারী জনতার রক্তে নিজেকে রঞ্জিত করে।

ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ গঠন

১৩ জানুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ইমামের একটি বাণী পড়ে শোনানো হয়। ঐতিহাসিক সে বাণীটি ছিল—

"ইরানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আমার প্রতি যে আস্থাজ্ঞাপক রায় প্রদান করেছে তদানুযায়ী শরয়ী অধিকারে জাতির ইসলামী লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আমি উপযুক্ত, দ্বীনদার, নিষ্ঠাবান ও নির্ভরযোগ্য লোকদের নিয়ে অস্থায়ীভাবে 'ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি পরিষদ গঠন করেছি, যা তার কাজ শুরু করবে। এ পরিষদের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। পরিষদের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করা এবং প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। যখনই সময় যথাযথ বলে বিবেচিত হবে তখনই জাতির সামনে অস্থায়ী সরকার উপস্থাপন করা হবে ও তা কাজ করতে শুরু করবে।"

শাহের পলায়ন

বিপ্লবী পরিষদ ঘোষণার পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে শাহ একটি 'রাজকীয় পরিষদ' গঠন করে তার নিকট অস্থায়ীভাবে শাহী ক্ষমতা হস্তান্তর করে ১৬/১/১৯৭৯ তারিখে গোপনে দেশ থেকে পলায়ন করে।

ইমামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শাহের দেশ থেকে পলায়নের কয়েকদিন পর ইমাম স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন। এ খবর শুনে প্রধানমন্ত্রী বখতিয়ার ইমামের দেশে ফেরা প্রতিহত করার ঘোষণা দেন এবং বিমানবন্দরসমূহ বন্ধ করে দেন। এমতাবস্থায় বিপ্লবের শীর্ষস্থানীয় নেতারা তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে উপস্থিত হন এবং জনতাও তাদের অনুসরণ করে। এ সময় তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দ জনগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে থাকেন।

জনতার দাবির মুখে অতঃপর প্রধানমন্ত্রী বখতিয়ার ইমামের দেশে ফেরায় সম্মতি প্রদান করেন এবং ইমাম ১/২/১৯৭৯ তারিখে তেহরানের মেহেরাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে শহীদদের গোরস্থানে গিয়ে জেয়ারত করেন। জিয়ারত শেষে তিনি উপস্থিত জনতার মহাসমুদ্রে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন—

"আমি সরকার মনোনীত করব, আমি বখতিয়ার সরকারের মুখে মুষ্ঠাঘাত হানব, আমি এ জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার গঠন করব।"

অস্থায়ী সরকার গঠন

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে ইমাম ভিন্নদলের নেতা মেহেদী বাযারগানকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে তাঁকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন। ৪/২/১৯৭৯ থেকে ইরানে ২টি সরকার কার্যকর ছিল। একটি ছিল শাহ মনোনীত বখতিয়ার সরকার অপরটি ছিল ইমাম মনোনীত মেহেদী বাযারগান সরকার। বিপ্লব সমর্থক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বখতিয়ার সরকারের মন্ত্রীদেরকে তাদের মন্ত্রণালয়ে বা অফিসে প্রবেশ করতে দেয়নি।

www.pathagar.com

বিপ্লবের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ

অস্থায়ী সরকার ঘোষণার পর জনগণ দলে দলে ইমামের সাথে দেখা করতে আসতে লাগলো। সেনা ছাউনি থেকে অনেক সৈনিক ইমামের নিকট এসে আনুগত্য ঘোষণা করল। বিমান বাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তারা ইউনিফর্ম পরে এসে 'সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক ইমাম খোমেনী' স্লোগান দিয়ে ইমামের হাতে বায়আত হতে লাগলো।

৯ ফেব্রুয়ারি রাতে শাহী গার্ডবাহিনী তেহরানের বিমান ঘাঁটি ঘেরাও করে বিমান বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করলে জনতা স্রোতের মতো বিমান ঘাঁটি ঘেরাও করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত জনতা বিমান ঘাঁটিতে প্রবেশ করলে বিমান বাহিনীর লোকেরা অস্ত্রের গুদাম খুলে দিল। জনতা সশস্ত্র হলো।

সামরিক শাসন ঘোষণা

১১/২/১৯৭৯ তারিখ বিকেল ২টায় শাহী বাহিনীর দখলে থাকা রেডিও স্টেশন থেকে সামরিক শাসনের ঘোষণা প্রদান করা হলো। ঐদিন বিকেল ৪টা থেকে সামরিক শাসন বলবৎ হওয়ার ও জনগণ যাতে ঘর থেকে বের না হয় তাঁর নির্দেশ দেয়া হলো। ঘোষিত সামরিক শাসন বলবৎ হওয়ার পূর্বে ইমাম সামরিক শাসন ঘোষণা বাতিল করে লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। এ বিবৃতি জনগণের হাতে হাতে মুখে মুখে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। ইমাম এ ঘোষণায় বললেন—

"আজকের সামরিক শাসনের ঘোষণা একটি প্রতারণা ও শরীয়তবিরোধী কাজ। জনগণ যেন কোনো অবস্থাতেই এ ঘোষণার প্রতি কর্ণপাত না করে। প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আপনারা ভয় পাবেন না, কেননা আল্লাহর ইচ্ছায় সত্য বিজয়ী।"

বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়

সশস্ত্র জনগণ ও তাদের সাথে যোগদানকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা শাহী গার্ড বাহিনী, ট্যাংক বাহিনী, সামরিক কেন্দ্র ও পুলিশ ব্যারাকে হামলা শুরু করল। হাজার হাজার শহীদানের রক্তের বিনিময়ে জনগণ বিজয়ী হলো এবং শাহী বাহিনী থেকে রেডিও স্টেশন দখল করে নিয়ে জনগণ বিপ্লবের বিজয়বার্তা ঘোষণা করল। ইসলামের প্রথম যুগের ১৪০০ বছর পর বিশ্বের বুকে পুনরায় একটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলো।

শাসন কাঠামো নির্মাণ

- সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে গণভোটের মাধ্যমে তা অনুমোদন করা হয়।

www.pathagar.com

- সংবিধান অনুযায়ী আয়াতুল্লাহ খোমেনী সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে মনোনীত হলেন।
- একটি অভিভাবক পরিষদ গঠিত হয়। অভিভাবক পরিষদের কাজ হলো সংসদে প্রণীত নতুন আইন ইসলামসম্মত কিনা তা যাচাই করা, ইসলামসম্মত না হলে ভেটো প্রদান। সংসদ বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যারা প্রার্থী হবেন তারা ইসলামপন্থী, সৎ ও চরিত্রবান কিনা, বিপ্লবের ক্ষতি করতে পারে এমন কোনো ব্যক্তি কিনা তা যাচাই করে মতামত প্রদান। মতামত নেতিবাচক হলে উক্ত ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।
- সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।
- নির্বাচিত জাতীয় সংসদ।
- কাম্যতা নির্ধারণ পরিষদ (Expectency Council) সংসদ ও অভিভাবক পরিষদ কোনো বিষয়ে মীমাংসায় সক্ষম না হলে এ কাউন্সিল হস্তক্ষেপ করবে।

বিপ্লব সংরক্ষণে কর্মসূচি

- সমগ্র ইরানী সমাজকে ইসলামীকরণের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করা হয়। ইসলামী মূল্যবোধবিরোধী প্রকাশনা ধ্বংস করা হয় এবং মূল্যবোধের পক্ষে সাহিত্য রচনা করা হয়।
- বিপ্লববিরোধী দল, গোষ্ঠী, সশস্ত্র গ্রুপ, দমন করা হয়।
- প্রশাসন থেকে ইহুদী ও বাহাইদের অপসারণ করা হয় এবং বাহাই মতবাদ দমন করা হয়।
- প্রাচ্য পাশ্চাত্যের লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র গ্রুপসমূহ নির্মূল করা হয়।
- শাহের পরিবার ও শাহের পুঁজিপতি সহযোগীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, স্বল্প আয়ের লোকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে ভূমিবন্টন করা হয়।
- ইসরাইল ও তার দোসর মিসরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়।
- তেহরানস্থ মার্কিন দূতাবাস দখলের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক মার্কিন এজেন্টদের বিচারের সম্মুখীন করা হয়।
- **বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসম্পন্ন পাঠ্যক্রম, সিলেবাস, শিক্ষকের ব্যবস্থা করে তিন বছর পর পুনরায় তা চালু করা হয়।**
- বিপ্লবী ছাত্র যুবকদের নিয়ে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি 'বিপ্লবী

www.pathagar.com

রক্ষীবাহিনী' গঠন করা হয়।

- নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট গোপনে বিপ্লববিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে তাকে বরখাস্ত করা হয়।
- সেপাহে পাসদারানে এনকেলাবে ইসলামী বা ইসলামী রেভ্যুলেশনারী গার্ড করপস গঠন।
- জেহাদে সায়েন্দেগী বা Jihad of Construction সংস্থা গঠন।

সতর্কতা : পুঁজি বা সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিরা যেন ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো এবং নীতি নির্ধারণে কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে সে বিষয়ে ইমাম সবাইকে সতর্ক করেছেন। কেননা সম্পদশালী ব্যক্তিরা ইসলামী রাষ্ট্রের নীতিমালাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলে রাষ্ট্রের আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে না।

সাংস্কৃতিক নীতি : দেশে শরীয়া আইন চালু করা হয়। নারী-পুরুষের পোশাকের ব্যাপারে ড্রেস কোড চালু করা হয়। মহিলাদের জন্য শালীন পোশাক ও মাথা ঢেকে রাখার আইন করা হয়। পুরুষদের শর্টড্রেস পরা নিষিদ্ধ করা হয়। মাদকদ্রব্য, পশ্চিমা ভাবধারার সিনেমা, নারী-পুরুষের একসাথে সাঁতার কাটা এবং সূর্যস্নান নিষিদ্ধ করা হয়। ইসলামিক রেভুলেশনারী গার্ড ও অন্যান্য সংস্থাকে এসব বিষয় তদারকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। যৌন আবেদনমূলক সংগীত নিষিদ্ধ করা হয়। 'Committee for Islamaisation of Universities' গঠন করে সকল স্তরের শিক্ষা কারিকুলাম ইসলামসম্মত করা হয়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় জনগণকে বস্তুবাদী সভ্যতা, বস্তুবাদী সমৃদ্ধি ত্যাগ করে আত্মত্যাগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে আহ্বান জানান।

অর্থ ও বাণিজ্য নীতি : শাহের ইরান ১৯৭০ সাল থেকে তেল রপ্তানি শুরু করে। শাহের সহযোগিরা এ তেলের অর্থে একটি পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে তোলে। বৈদেশিক শোষণ ও দেশীয় পুঁজিপতিদের শোষণে সাধারণ জনগণ গৃহহীন ও ভূমিহীন শ্রেণীতে পরিণত হয়। বিপ্লবের পর পর সাম্রাজ্যবাদ ও আরব রাজতন্ত্রসমূহ ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের মাধ্যমে ইরানের উপর ৮ বছরব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ায় নতুন সরকারের জন্য অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও দেশ পুনর্গঠন দুরূহ হয়ে পড়ে। তদপুরি শাহ সমর্থক পুঁজিপতিরা নিজেদের পুঁজি নিয়ে দেশ ত্যাগ করা শুরু করে। ইসলামিক বিপ্লব ও ইরাক-ইরান যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে শিল্প উদ্যোক্তা, টেকনিশিয়ান ও দক্ষ কারিগরদের মধ্যে ২০ থেকে ৪০ লক্ষ লোক ইরান ত্যাগ করে অন্যন্য দেশে চলে যায়। ফলে জনগণের ব্যক্তিগত আয় কমে যায়, সরকারি ঋণ ও

www.pathagar.com

মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়। যুদ্ধের প্রথম ৬ বছরের মাথায় দারিদ্র্যের হার ৪৫% শতাংশে পৌঁছে। এতদসত্ত্বেও ইমাম খোমেনী প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আল্লাহর সাহায্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান। **তিনি অবশিষ্ট পুঁজিপতিদের পুঁজি বাজেয়াপ্ত করেন, যাতে তারা পুঁজি নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে না পারেন, তেল রপ্তানি বৃদ্ধি করেন এবং দেশীয় শ্রমিকদেরকে দক্ষ কারিগর হিসাবে গড়ে তোলেন। ফলে বর্তমান ইরান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর দেশে পরিণত হয়।**

তিনি জনগণকে বলতেন, যেসব লোক শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে, উত্তম খাদ্য ও বাসস্থানকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছে তাদের সাথে পশুদের চিন্তাধারার পার্থক্য নেই। যারা জনগণের গুণগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির চেয়ে অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে বেশি গুরুত্ব দেয় তাদেরকে তিনি গাধা সাব্যস্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, A donkey too considers economy as its only infrastructure.

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, যে পুঁজিবাদ অত্যাচারী, বেহিসাবী এবং মজলুম জনগণকে বঞ্চিত করে, ইসলাম সে পুঁজিবাদকে নিন্দা করে এবং ন্যায়বিচারের বিরোধী বলে মনে করে, ইসলাম সে পুঁজিবাদকে সমর্থন করে না। কোরআন ও সুন্নাহ এ ধরনের পুঁজিবাদকে নিন্দা করে এবং ন্যায়বিচারের বিরোধী বলে মনে করে। একইভাবে ইসলাম কম্যুনিস্ট সরকার ও তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও বিরোধী। কারণ কমিউনিজম ব্যক্তিমালিকানার বিরোধী এবং অভিন্ন মালিকানায় বিশ্বাসী। এ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি প্রতিভা বিকশিত হতে পারে না। ইসলাম এই দুইয়ের মাঝামাঝি পন্থা তথা সীমিত মালিকানাকে সমর্থন করে। উপনিবেশবাদী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে ইমাম বলেছেন, "উপনিবেশবাদীরা মুসলিম দেশগুলিতে যে অন্যায্য অর্থব্যবস্থা চালু করেছে তাতে জনগণ দুটি অংশে বিভক্ত হয়েছে। এক অংশে রয়েছে পুঁজিবাদের সহযোগী জালেম পুঁজিবাদী শ্রেণী, অন্য অংশে রয়েছে মজলুম বা নির্যাতিত শ্রেণী। এ ব্যবস্থার ফলে একদিকে কোটি কোটি মুসলমান ক্ষুধার্ত, স্বাস্থ্য সেবা ও সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অন্যদিকে অর্থ ও সম্পদের অধিকারী অল্প সংখ্যক লোক বিলাসিতা ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিত মানুষেরা উন্নত জীবন-যাপনের আশায় লুটেরা শাসকদের জুলুমের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু অল্প সংখ্যক শাসকশ্রেণী ও তাদের শাসনযন্ত্র তাদেরকে দমন প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এ অবস্থায় নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো এবং জালেমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আমাদের দায়িত্ব।

www.pathagar.com

তাঁর দৃষ্টিতে শুধু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য নয়; বরং এর লক্ষ্য হলো সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, সাম্য বা সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী অর্থনীতি তৌহিদভিত্তিক, ইসলামের দৃষ্টিতে সবকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ এবং মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ সব কাজেরই লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী সমাজের যিনি শাসক তার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সমাজের সব চেয়ে নিচু পর্যায়ের ব্যক্তির চেয়ে বেশি হবে না বরং সমান হতে হবে। তাঁর মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো—ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে দেয়া এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বৈষম্যগুলো দূর করে প্রত্যেক মানুষকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দেয়া।

সুদ প্রথার কঠোর বিরোধিতা করে তিনি বলেন, "সুদ কল্যাণকর অর্থনৈতিক তৎপরতায় বাঁধা সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক তৎপরতাকে কমিয়ে দেয়। সুদের ফলে ধনীরা আরও ধনী এবং গরীবরা আরও গরীব হয়। সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে গরীব ব্যক্তি ও দেশ ঋণের জালে আটকা পড়ে যার থেকে বেরুনোর কোনো উপায় থাকে না। সুদ মানব সমাজে কল্যাণকামিতার চেতনা কমিয়ে দেয় এবং সুদখোর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দিন দিন বেশি স্বার্থপর হতে থাকে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সুদ গ্রহণকে আল্লাহর সাথে যুদ্ধের শামিল উল্লেখ করেছেন। ইমাম খোমেনী বিপ্লবের পর ইরানের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী আইন অনুযায়ী ঢেলে সাজান।

ভারসাম্যহীন বাণিজ্য সম্পর্কের দ্বারা দেশ যাতে সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদে না পড়ে, এ ব্যাপারে তিনি জাতিকে সতর্ক করেছেন। তিনি ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য বিনিময়ের নীতি অনুসরণ করেছেন, যাতে কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি কৃষি খাতকে অন্য সকল খাতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে, একটি জাতি যদি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে, তবে সে জাতি সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত থেকে নিজেকে রক্ষা করে অন্যান্য খাতেও স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কৃষি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনকে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

তিনি ইরানী জাতিকে স্বনির্ভর শিল্পনীতি প্রতিষ্ঠার দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিল্প স্থাপনে পরনির্ভরতা পরিহার করার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলেছেন এবং দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিল্প স্থাপন, যন্ত্রপাতি নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ফলে ইরান বর্তমানে সকল প্রকার সামরিক-বেসামরিক শিল্প ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। খোমেনীর আদর্শে উজ্জীবিত ইরানীরা

www.pathagar.com

বর্তমানে সকল ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সরকার জনগণের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করায় এটি সম্ভব হয়েছে।

তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটানোর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিতেন। সমাজ বা দেশ তার সব শক্তি যেন শুধু অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন কিংবা ভোগ-বিলাসের জন্য নিয়োজিত না করে সে ব্যাপারে তিনি সবাইকে সতর্ক করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেন পরাশক্তির উপর নির্ভরশীল না হয় সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অর্জিত না হলে অন্য সকল উন্নয়ন হবে ভারসাম্যহীন ও ত্রুটিপূর্ণ। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ব্যতীত সার্বিক উন্নয়ন হবে ভারসাম্যহীন ও ত্রুটিপূর্ণ। তিনি মানব সম্পদ উন্নয়নকে রাষ্ট্রের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। সমাজের জনগণকে সব বিষয়ে সচেতন ও সুশিক্ষিত করাকে তিনি উন্নয়ন জোরদারের প্রধান পন্থা মনে করতেন। পুঁজি বিনিয়োগে হারাম-হালাল বিবেচনা করা এবং ইসলামসম্মত পুঁজি বিনিয়োগকে তিনি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পুঁজির বিপদ সম্পর্কেও তিনি জাতিকে সতর্ক করেছেন।

ইমাম খোমেনীর অবদান

ইরানের ইসলামী বিপ্লব অনেক সংস্কৃতি বা মূল্যবোধের পুনর্জন্ম দিয়েছে। এই মহাবিপ্লব ও আদর্শ তুলে ধরেছে যে, রাজনীতি থেকে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে নির্বাসিত করা উচিত নয়। শরীয়া আইনের মানদণ্ডে উন্নীত হওয়া ব্যতীত কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপ গ্রহণযোগ্য নয়—এ সত্যটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজনীতিবিদ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদেরকে ন্যায়বিচারকামী, সৎ ও খোদাভীরু হতে হবে—যাতে বিশ্বের সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের প্রাণসঞ্জীবনী শিক্ষায় উদ্দীপ্ত ইরানের ইসলামী বিপ্লব শাহাদাতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। এ বিপ্লব পুনরায় বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

ইরানী বিপ্লবের অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্পেনের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপক কিলবাস বলেছেন—"ইরানের ইসলামী বিপ্লব ধর্মকে আবার জীবনদান করেছে। ফলে প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যগুলি পুনরায় গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্ব মুক্তির আশায় ও সামাজিক সম্পর্ককে সুন্দর করার লক্ষ্যে পুনরায় ধর্মের শক্তি ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েছে। ইমাম খোমেনীর ধর্মীয় বিপ্লবের আহ্বানই বিশ্বের চিন্তাজগতে এতসব পরিবর্তন এনেছে।"

www.pathagar.com

ইসলামের শত্রুদের তিনি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং বিজাতীয় সকল মতবাদকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি পুঁজিবাদী আমেরিকা ও সমাজবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'বড় শয়তান' ও 'ছোট শয়তান' আখ্যায়িত করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এক চিঠিতে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভকে লিখেছেন—"সমাজতন্ত্র একটি ব্যর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এর থেকে সরে আসা উচিত। অচিরেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে বিশ্ব ইতিহাসের জাদুঘরে স্থান করে নেবে।" তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের দেড়-দুই বছরের মধ্যেই বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙে পড়ে।

ইমাম খোমেনী প্রবর্তিত একটি বিখ্যাত স্লোগান ছিল : Not East Not West—Islam Islam. তিনি মুসলমানদেরকে শিয়া-সুন্নী বা মাজহাবী ফেরকায় আবদ্ধ না থেকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং ঐক্যবদ্ধ মুসলিম ব্লক গড়ে তোলার আহ্বান জানান। শিয়া চিন্তাধারার অনেক বিষয়কে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তা, সামরিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট হামিদ গুল লিখেছেন, "ইসলামের উদিত সূর্য যখন অস্তমিত হলো—তখন থেকে সমগ্র মুসলিম জাতির সামনে একটি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিল আর তা হলো জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অনেক থাকলেও কাজে-কর্মে অর্থাৎ আমল-আখলাকে সমৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা খুব কমই ছিল, জেহাদী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ ছিল না বললেই চলে। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মহাপরিবর্তন সংগঠিত হলো, ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি পেল এবং জনগ্রাহ্য হয়ে উঠল, মুজাহিদরা সংগঠিত হতে শুরু করল। ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে ইসলাম পরাজিত হয়নি। মুসলমানদের উপর ব্যাপক আঘাত এসেছে এবং এখনও আঘাত করা হচ্ছে, তারপরও এটা এই শতাব্দীর এক অলৌকিক ঘটনা যে, এমন বহু মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যারা জিহাদ এবং আমলকে পুনর্জীবন দান করেছেন। যে ব্যক্তিত্বের কথা এ প্রাবন্ধিকের স্মৃতিতে সদা জাগ্রত রয়েছে তিনি হলেন ইসলামী ইরানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনী (রহঃ)।"

ইমাম খোমেনী (রঃ) খালি হাতে এবং কোনো সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্য ছাড়া মার্কিন সামরিক ছত্রছায়ায় থাকা পাহ্লভি রাজতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটান। তাঁর সূচিত বিপ্লব, যাতে মুসলিম বিশ্বে বিশেষভাবে আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও রাজতান্ত্রিক আরব দেশগুলি ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের মাধ্যমে ইরানের উপর ৮ বছরব্যাপী ব্যাপক

www.pathagar.com

ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। এতেও খোমেনীর নেতৃত্বাধীন ইসলামী ইরান বিজয়ী হয় ও স্বনির্ভরতা অর্জন করে।

মাজহাবী পার্থক্য ভুলে মুসলমানরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হয় এ লক্ষ্যে তিনি সকল শ্রেণীর মুসলমানদের নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঐক্যসপ্তাহ কর্মসূচি পালনের প্রথা চালু করেন। মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল-আকসা মসজিদ পুনরুদ্ধারে মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রতি বছর 'বিশ্ব কুদ্‌স দিবস' কর্মসূচি পালনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর কর্মসূচি নির্যাতিত ফিলিস্তিনীদেরকে বর্তমানে এরূপ শক্তিশালী করেছে যে, যায়নবাদী ইসরাইল বর্তমানে ইসলামী ইরান সৃষ্ট হিজবুল্লাহ ও হামাসের ভয়ে তটস্থ। বহুসংখ্যক ইহুদী বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতার কারণে স্থায়ীভাবে ইসরাইল ত্যাগ করছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন আপোষহীন। রাসূল (সঃ)কে অবমাননা করে লিখিত স্যাটানিক ভার্সেস-এর লেখক সালমান রুশদীকে তিনি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। তাঁর অনুসারীরা ইতিমধ্যে এ বইয়ের জাপানি অনুবাদককে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু সালমান রুশদী এখনও পাশ্চাত্যের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে প্রায় বন্দী জীবন যাপন করছে।

ইমাম খোমেনী (রঃ) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নারী সমাজকে ইসলামের পথে পরিচালনা, দেশ পুনর্গঠন, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা, অর্থ ও শিল্পনীতির ইসলামীকরণ, যুবসমাজকে জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন।

ইমামের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র

ইমাম খোমেনী (রঃ) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি উক্ত দুই মহান ব্যক্তির আদর্শ ধারণ করেছিলেন বিধায় বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি উন্নত জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল (সঃ)-এর পর হযরত আলীকে মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে মনে করেন। যুদ্ধে ও শান্তিতে, সংযম সাধনায়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়, দুর্বল ও বঞ্চিতদের প্রতি দয়ায় এবং যুদ্ধের ব্যাপারে নির্ভীকতায় তিনি ইসলামের মৌলিক আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। প্রয়োজনের সময় কঠোরতা বা কোমলতা এবং অন্যায়ের সাথে আপসহীনতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি জালেম, শোষক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী ছিলেন। তিনি নির্ভীকচিত্তে গভীর আস্থা নিয়ে বলতেন—"আমেরিকা আমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।"

www.pathagar.com

অপরদিকে গভীর স্নেহধারায় ধন্য করতেন যুবসমাজ ও শিশুদেরকে। তাঁর পুত্র ও ইরানের বর্তমান সুপ্রীম লিডার আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী ইমাম খোমেনী সম্পর্কে বলেছেন, "ইমাম খোমেনীর চরিত্রের মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল ঈমানী শক্তি ও সৎকর্মের, নৈতিকতার সাথে প্রজ্ঞার, আধ্যাত্মিক পবিত্রতার সাথে বিচক্ষণতার, বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বের সাথে স্নেহ, দয়া ও মায়ার।"

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল কালোচোখ বিশিষ্ট, সক্রিয় মনের তীক্ষ্ণ মেধাবী জ্ঞানী ব্যক্তি। খালি হাতে তিনি তৎকালীন পৃথিবীর শক্তিশালী ও আগ্রাসী সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন। বাহ্যিকভাবে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ, কঠোর ও বেপরোয়া। ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা নিয়েই তাঁর চারপাশে লোকেরা সমবেত হতো। মাদ্রাসায় শিক্ষকতার সময় বা মঞ্চে ভাষণ দেয়ার সময় তিনি কখনো হাসতেন না এবং সমালোচকরাও তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাষায় সমালোচনা করত। খোমেনীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেও তারা বলত খোমেনী ঐতিহ্যবাহী ইরানী জাতির মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি (প্রবন্ধকার) ইমাম খোমেনীর আবেগশূন্যতা ও প্রচণ্ড সাহসিকতা দেখে মুগ্ধ। ১৪ বছর নির্বাসনে থাকার পর তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী শাহপুর বখতিয়ারের বিরোধিতা সত্ত্বেও তেহরানে ৫০ লক্ষ ভক্তের সম্মুখে বিমান থেকে নেমে আসেন তখন বিদেশী সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—"১৪ বছর নির্বাসনে কাটিয়ে মাতৃভূমিতে বিজয়ীর বেশে আসতে পারায় আপনার অনুভূতি কি?" তখন তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন—"আমি কিছুই অনুভব করছি না।" ইমাম খোমেনী যখন তেহরান বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর নিরস্ত্র ভক্তগণ ব্যতীত বাকি যারা তেহরানে ছিল তারা তাঁর প্রবল শত্রুপক্ষ সরকার, সশস্ত্র পুলিশ, সরকারের শক্তিশালী সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা। এতদসত্ত্বেও তিনি এর তিনদিন পরেই বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেন। ঘোষণাপত্রে তিনি উল্লেখ করেন—"ইরানী জাতির ম্যান্ডেট পেয়েই আমি এ সরকার ঘোষণা করছি। আমার ঘোষিত সরকারই বৈধ সরকার।" এরপরে তিনি অন্যান্য যেসব সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে সফল হয়েছেন তাঁর তুলনা একমাত্র তিনি।

প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সময়জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদর্শীতা ও অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাকে আল্লাহ পরিচালিত ব্যক্তিত্ব (Divinely Guided Figure) হিসাবে ইরানীদের নিকট প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটিই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের চমৎকারিত্ব।

পাশ্চাত্যের বিশ্লেষকরা আলৌকিক এ ইমামের স্বীকৃতি দিতে গিয়ে

www.pathagar.com

বলেছেন, "একজন উচ্চ পর্যায়ের ধর্মতত্ত্ববিদ, একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে রাজনীতিবিদদের চেয়েও বেশি শক্তিমান বা প্রভাবশালী হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আয়াতুল্লাহ খোমেনী।" বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলোতে লন্ডনের দৈনিক টাইমস লিখেছে, "ইমাম খোমেনী তাঁর কথার মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি জনগণের সাথে অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায় কথা বলেন এবং নিজের সমর্থকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেন। তিনি জনগণের নিকট এটা প্রমাণ করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তির বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানো যায় এবং এই ধরনের শক্তিকে ভয় করার কিছু নেই।" ফ্রান্সের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক মিশেল ফুকো বলেছেন, "আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ব্যক্তিত্ব কিংবদন্তী বা রূপকথার তুল্য। কোনো সরকারপ্রধান ও রাজনৈতিক নেতা নিজ নিজ দেশের সমস্ত গণমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এবং নিয়ে জনগণের সাথে এত গভীর ও শক্তিশালী সম্পর্ক রাখার দাবি করতে পারে না।"

ফ্রান্সের প্যারিসে ইমাম খোমেনীর নির্বাসিত জীবনযাপনকালে তাঁর সেবায় নিয়োজিত এক সৌভাগ্যবতী নারী ইমাম সম্পর্কে বলেছেন, "ইমাম তাঁর জীবনব্যাপী যেভাবে অপরের অধিকার সংরক্ষণ করতেন তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। আমার মনে পরে, 'নৌফেল লুশাতুতে' যখন ছিলাম, আশুরার সময় বহু ইরানী ইমামের সাথে দেখা করতে এসেছিল। ইমাম অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। এর ফলে তাঁর আশপাশের লোকজনও তাঁর অনুসরণে সাদামাটা জীবন যাপন করতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তিনি খাদ্য বলতে যা খেতেন তা হলো রুটি, পনির, টমেটো এবং ডিম। মাঝে মাঝে স্যুপও খেতেন।"

তাঁর বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি

১৯২৯ সালে তিনি তেহরানের একজন আলেমের ১৬ বছর বয়সী কন্যা খাদীজা সাকাফীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০০৯ সালে তাঁর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। এ দম্পত্তির ৭টি সন্তান হয়েছিল তন্মধ্যে ২ জন বাল্যকালে মারা যায়। বড় ছেলে সাইয়্যেদ মোস্তফা খামেনী ইমামের নাজাফে নির্বাসনকালে ১৯৭৭ সালে ইরানের সাভাক গোয়েন্দা সংস্থার হাতে নিহত হন। ছোট ছেলে আহমদ খোমেনীও ১৯৯৫ সালে চক্রান্তকারীদের হাতে নিহত হন। মেঝ ছেলে আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী বর্তমানে ইরানের সুপ্রীম লীডার। জীবিত একমাত্র মেয়ে জাহরা মোস্তাফাভী তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ইমামের নাতি-নাতনীর সংখ্যা ১৫ জন।

www.pathagar.com

তাঁর লিখিত বিখ্যাত বইসমূহ

তিনি পবিত্র কোরআনের শিক্ষা, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী আইনের মূলনীতি, ইসলামী মূল্যবোধ, দর্শন, কবিতা, সাহিত্য, সূফীবাদ, রাজনীতি ও সরকার বিষয়ক দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত বইগুলি হলো :

১. হুকুমতে ইসলামী : বেলায়েতে ফকীহ।
২. চল্লিশ হাদীস।
৩. নামাজের আদব।
৪. জিহাদে আকবর।
৫. তাহরীর আল ওয়াসীলাহ।
৬. তৌজি আল মাসায়েল।

তাঁর ইন্তেকাল ও জানাজা

তিনি দীর্ঘদিন যাবত ক্যান্সার ও হৃদরোগে ভুগছিলেন। অবশেষে ১৯৮৯ সালের মে মাসের শেষদিকে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাত্র ১০ দিনে তাঁর ৫ বার হার্ট এটাক হয়। অবশেষে ০৩/০৬/১৯৮৯ইং তারিখের মধ্যরাতের পূর্বে তিনি তাঁর সংগ্রামী দুনিয়াবী জীবন সমাপ্ত করে প্রভুর সান্নিধ্যে উপনীত হন (আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নসীব করুন, আমীন)। তাঁর ইন্তিকালের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জনতা চতুর্দিক থেকে তেহরান অভিমুখে ছুটে আসে। প্রিয় নেতাকে একবার দেখার জন্য, শেষবারের মতো স্পর্শ করার জন্য জনতার ভীড় এমন বেসামাল হয় যে, সামরিক বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের কঠিন বেষ্টনী সত্ত্বেও শবযাত্রা বার বার বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল। ভীড় কমানোর জন্য সৈন্যরা আকাশে বার বার ফাঁকা গুলি ছুড়ছিল। এতদসত্ত্বেও ভীড়ের চাপে ১০ জন দর্শনার্থী পদপিষ্ট হয়ে মারা যান, ৪০০ জন গুরুতর আহত ছাড়াও কয়েক হাজার ব্যক্তি আহত হয়।

তাঁর জানাজা-পূর্ব দৃশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের জন কিফনার লিখেন, "জনতার ভীড়ে ইমাম খোমেনীকে বহনকারী কফিন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাঁর লাশ মাটিতে পড়ে যায়, উন্মুক্ত জনগণ এমতাবস্থায় লাশের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অবশেষে সৈন্যরা মুহুর্মুহু ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে জনগণকে দূরে সরিয়ে দিয়ে একটি হেলিকপ্টার এনে তাতে লাশ তোলা হয়। হেলিকপ্টার উড়ার সময় জনতা হেলিকপ্টারের ল্যান্ডিং গীয়ার ধরে ঝুলে পড়ে অবশেষে প্রবল ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়ে। এমতাবস্থায় কবর দেওয়ার স্থান পরিবর্তন করা হয় এবং উত্তর তেহরানের বেহেশ্‌তে যাহ্‌রা নামক

www.pathagar.com

কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এ জানাজায় ২৫-৩০ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটেছিল।" বর্তমান ইরানে তাঁর সমাধিসৌধটি ইরানী জাতির তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

বিবিসি রেডিও ইমাম খোমেনীর ইন্তেকালের খবর প্রচারের সময় উল্লেখ করে যে, "আজ এমন এক ব্যক্তি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন যাঁর মৃত্যুতে পাশ্চাত্যের অনেকেই প্রশান্তিতে ঘুমাতে পেরেছেন।"

সেদিন অনেকে ভেবেছিল, ইমাম খোমেনীর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের মৃত্যু ঘটবে এবং বিশ্বব্যাপী অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধের ধারা সূচিত হয়েছে তা স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর আড়াই দশক অতিবাহিত হলেও তাঁর চিন্তা, চেতনা ও আদর্শের প্রভাব কমেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। ইমামের আদর্শ ইরানসহ গোটা বিশ্বকেই প্রভাবিত করেছে। গোটা বিশ্বের স্বাধীনচেতা মানুষগুলি সত্যের পথে চলার ক্ষেত্রে নতুন করে সাহস ও দিক নির্দেশনা পেয়েছে।

বিশ্বে এখন ধর্ম ও আ্যাত্মিকতার প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই এই পরিস্থিতিকে ইমামের অবদান বলে মনে করেন। ইমাম বলতেন, "বিশ্বের জাতিগুলো আজ চিরন্তন ঐশী মূল্যবোধের তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আছে। ঐশী মূল্যবোধের সাথে তাদের পরিচিত করানো গেলে তারা সেদিকেই ঝুঁকে পড়বে। ইমামের সুরে সুর মিলিয়ে মার্কিন লেখক রবার্ট মাকওয়ানা একবিংশ শতাব্দীকে আধ্যাত্মিকতা অনুসন্ধানের শতাব্দী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও উদাহরণ তুলে ধরে বলেছেন, "বর্তমান শতাব্দী ধর্ম থেকে অনুপ্রাণিত হবার শতাব্দী এবং এই শতাব্দীতে আর কোনো সামাজিক শক্তিই ধর্মের মতো প্রভাবশালী নয়।"

চট্টগ্রাম, ২৫ জানুয়ারি ২০১৫

www.pathagar.com

স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিনের রূপকার শায়খ আহমদ ইসমাইল হাসান ইয়াছিন

যায়নবাদী ইহুদীদের তল্পীবাহক খ্রিস্টান শক্তিসমূহ সুয়েজখালের উপর নিজেদের চিরস্থায়ী দখল অব্যাহত রাখতে মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করতে এবং অতীতের শত শত বছরের ক্রুসেডের বদলা নিতে ভূগুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন ভূমিতে অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ যেভাবে নিজ জমিদারী এলাকার মুসলমানদের শান্তি নষ্ট করতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অপরাধপ্রবণ হিন্দুদেরকে এনে মুসলমানদের প্রতিবেশী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল তদ্রুপ ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে খ্রিস্টানবিশ্ব ঐতিহাসিকভাবে অপরাধপ্রবণ ইহুদীদেরকে শান্তির দেশ ফিলিস্তিনে পুনর্বাসন করে ইসরাইল নামক রক্তপিপাসু একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করেছে।

১৯৪৮ সালে এই অবৈধ যায়নিস্ট রাষ্ট্রের বুলডোজারসমূহ যখন ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক শহর আশকেলনের ঘরবাড়িসমূহ গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, বাধাদানকারীদের হত্যা করছিল, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল তখন শায়খ ইয়াছিন ছিলেন ১০ বছরের বালক। পরিবারের সবার সাথে উদ্বাস্তু হিসাবে তিনি ঠাঁই পান তৎকালীন মিশরের গাজা অঞ্চলে। ইহুদীবাদী আক্রমণকারীদের দ্বারা বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনিও তখন প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশী মুসলিম দেশসমূহে আশ্রয় নেয়। অপর কোনো দেশে আশ্রয় নেয়া বা ফিলিস্তিনে থেকে যাওয়া ফিলিস্তিনিরা তাদের প্রধান শত্রু ইসরায়েলের প্রতিপক্ষ হয়ে স্থায়ীভাবে রুখে দাঁড়াতে পারেনি, স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিশালী অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে

www.pathagar.com

পারেনি, ভবিষ্যৎ বৃহত্তম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি 'নিউক্লিয়াস' প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কেবলমাত্র বাংলাদেশের ঢাকা শহরের সমান আয়তনবিশিষ্ট মহান গাজাবাসী এ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে। যে ব্যক্তির উপলব্ধি, পরিকল্পনা, আত্মবিশ্বাস, কর্মপরিকল্পনা গাজাবাসীকে এ অসাধ্য সাধনে সক্ষম করেছে তাঁর নাম হলো শায়খ আহমদ ইসমাইল হাসান ইয়াসিন। যাকে ১৯৪৮ সালে নিজ পিতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিল যায়নবাদী ইহুদীরা।

১৯৩৮ সালের ১ জানুয়ারি ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক আশকেলন শহরের ক্ষুদ্র মহল্লায় এই মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। (অনেকেই তাঁর জন্ম সাল ০১/০১/১৯৩৭ লিখেন কিন্তু তিনি তাঁর জন্ম সন ১৯৩৮ উল্লেখ করেছেন)। তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইয়াছিন, যিনি শায়খ আহমদের জন্মের তিন বছর পরেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতার চার স্ত্রী ছিল। তাঁর মায়ের নাম ছিল সাদা-আল-হাবেল। প্রতিবেশিরা তাকে চিহ্নিত করত মায়ের নামে, যা ছিল 'আহমদ সাদা'। তাঁর পরিবারের সবাই ১৯৪৮ সালে গাজার 'আল-শাতী' উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। তাঁরা ছিলেন ৪ ভাই ২ বোন। আশকেলন থাকাকালীন তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেন। গাজার উদ্বাস্তু শিবিরে এসে জীবিকার তাগিদে প্রথমে তিনি গাজা-মিশর সীমান্তে গিয়ে মিশরীয় সৈন্যদের ফেলে দেয়া খাদ্য বস্ত্র কুড়িয়ে আনতেন, পরবর্তীতে তিনি একটি রেস্টুরেন্টে চাকরি নেন। কিন্তু এ অবস্থাও বেশিদিন অব্যাহত থাকেনি।

অবসর সময়ে তিনি গাজার সমুদ্র সৈকতে গিয়ে অন্যান্য ফিলিস্তিনী বালকদের সাথে শারীরিক ব্যায়ামে অংশ নিতেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি একদিন তাঁর সহপাঠী আবদুল্লাহ-আল-খতীবের সাথে কুস্তি লড়তে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত হন কিন্তু গোত্রীয় সহিংসতার ভয়ে বহু বছর বন্ধুর নাম প্রকাশ করেননি। দীর্ঘ ৪৮ দিন যাবত তাঁকে প্লাস্টার করে রাখা হয়। কিন্তু তিনি আর কোনোদিন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেননি। প্রথমে ক্রাচে ভর করে এবং পরে কয়েক বছর পর হুইল চেয়ারই হয় তাঁর সারা জীবনের চলার বাহন। তিনি তখন থেকে শারীরিকভাবে প্যারালাইজড হয়ে যান কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মানসিকভাবে ছিলেন প্রাণবন্ত, সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত, দূরদর্শী ও আত্মবিশ্বাসী মহান চিন্তাবিদ। এ চিরপঙ্গু ব্যক্তিটি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মুসলিম বিশ্বকে এবং বিশ্বের মজলুম জাতিসমূহকে মাথা উঁচু করে অসম প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার এবং নিজ অধিকার আদায় করার পথ দেখিয়েছেন। বিশ্বশাসনের অভিলাষী যায়নবাদী ইহুদীরা, বরকন্দাজ আমেরিকা-ইইউ এবং তস্য গোলাম আরব বাদশাহগণ, সেক্যুলার মুসলিম শাসকগণ, তাঁর নিকট ও তাঁর অনুসারীদের নিকট বারবার পরাজিত হয়ে তাঁর মহত্বকে আরও মহীয়ান করেছে।

www.pathagar.com

শিক্ষাজীবন : পঙ্গু হওয়ার পর পরিবারের জন্য রোজগার করা আর সম্ভব হলো না। তিনি ঘরে বসে না থেকে হুইল চেয়ারে ভর করে মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে মিসরের আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং একটি ডিপ্লোমা লাভ করেন। অতঃপর তিনি মিসরের বাতিঘর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কিন্তু শারীরিক কারণে তিনি গাজার উদ্বাস্তু শিবিরে ফিরে আসেন। ঘরে বসে তিনি ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির উপর ব্যাপক পড়াশেনা করেন এবং ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কর্মজীবন : ১৯৬০ সাল থেকে তিনি গাজার ছোট মসজিদ আল আব্বাসীর খতিব, ইমাম হিসাবে যোগ দেন এবং একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের আরবী সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও সাহসী বক্তব্য শুনে মসজিদের মুসল্লীরা তাঁর অনুসারী হয়ে পড়ে। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী পাঠদানে উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়, এতে ছাত্রদের অভিভাবকরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর গুণমুগ্ধ শ্রোতা ও ছাত্ররাই পরবর্তীতে তাঁর অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

সাংগঠনিক জীবন : ১৯৫৯ সালে মিসরের আইন শাম্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন তিনি মিসরের ইখওয়ানুল মুসলেমুন বা মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে পরিচিত হন। ইখওয়ানের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কর্মপরিকল্পনা তিনি হৃদয়ে ধারণ করেন। গাজায় ফিরে আসার সময় তাঁকে ইখওয়ানের ছোটখাটো কোনো পদে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মিসরের তৎকালীন সেকুল্যার শাসক জামাল আবদুল নাসেরের পুলিশ ইখওয়ানের সদস্য মনে করে তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারাভোগের সময় তিনি লক্ষ্য করেন যায়নবাদী ইসরাইলী শাসক ও সেক্যুলার মুসলিম শাসকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি কিছুদিন পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গাজায় ফিরে আসেন।

তাঁর উপলব্ধি : ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির উপর ব্যাপক পাণ্ডিত্যে তাঁর যে উপলব্ধি হয় তা হলো : **ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালের ইসরাইলী দখলদারিত্ব মুসলিম বিশ্বের স্থবিরতার ফসল। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে ইসলামকে সঠিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরব বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামিক সরকারের পরিবর্তে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**

ফিলিস্তিনিদেরকে আত্মনির্ভরশীল, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশস্ত্র হতে হবে। কোনো দেশ, জাতি, মুসলিম বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর নির্ভর করলে

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনিদের মুক্তি আসবে না।

তিনি নৈতিক শুদ্ধতা ও সামাজিক পুনর্জাগরণের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেন। তিনি তাঁর সংগ্রামকে শুধুমাত্র মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আবদ্ধ না করে আত্মিক পরিশুদ্ধির দিকে নিয়ে যান।

তাঁর ঘোষণা : রাজনীতি ও প্রতিরোধ শুরু করার প্রাক্কালে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে যে ঘোষণা প্রদান করেন তা ছিল—"কারো দয়ায় পাওয়া অধিকার স্বাধীনতা নয়—স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা শক্তিপ্রয়োগে আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, আমরা আমাদের নিজেদের শক্তি দিয়ে তা অর্জন করব।"

তিনি আরও বলেন, "ফিলিস্তিন ইসলামী ভূখণ্ড—কিয়ামত পর্যন্ত এটা মুসলমানদের ভূখণ্ড হিসেবে থাকবে। কোনো আরব নেতা এর অংশবিশেষ কাউকে প্রদানের অধিকার রাখে না। তথাকথিত P.L.O.-ইসরাইল শান্তি পরিকল্পনায় কোনো শান্তি নেই। এ প্রক্রিয়া জিহাদ ও প্রতিরোধের বিকল্প হতে পারে না। আমরা প্রতিরোধের পথ বেছে নিয়েছি শাহাদাত অথবা বিজয়ের মাধ্যমেই এ যাত্রা সমাপ্ত হবে।

জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ : তিনি তাঁর জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্য হলো : "ফিলিস্তিনিদের বর্তমান প্রজন্ম গাজা ও পশ্চিমতীর নিয়ে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। পরবর্তী প্রজন্ম সমগ্র ফিলিস্তিন এলাকায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। ইসরাইলের অস্তিত্ব বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে যাবে।"

লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন

পূর্বপ্রস্তুতি : তিনি নিজ জাতিকে লক্ষ্য হাসিলের জন্য উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেন। এ পদক্ষেপসমূহের শুরুতে ১৯৭৩ সালে তিনি Islamic Charitable Gaza গঠন করেন।

ক. তিনি ইয়াসীর আরাফাতের নেতৃত্বাধীন P.L.O. প্রশাসনের দুর্নীতিপরায়ণ, সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী আমলাতন্ত্রের বিকল্প একটি নতুন স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর জনগণ উভয় প্রকারের ব্যবস্থার মধ্য থেকে উত্তম হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

খ. তিনি নিজে ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির উপর ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন এবং তা তাঁর জাতির মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নতুন নতুন বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

গ. তিনি স্বীয় জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন, নিজ

www.pathagar.com

ছাত্রদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলেন এবং শুক্রবারের জুমার খুতবাকে ফিলিস্তিনের পুনর্জাগরণের কাজে ব্যবহার করেন।

ঘ. তিনি সুচিন্তিত শিক্ষানীতি, সিলেবাস, প্রণয়নের মাধ্যমে ফিলিস্তিনী সমাজকে সংস্কার করে ইসলামীকরণ করেন, ফলে ফিলিস্তিনী সমাজ নৈতিক পুনর্জাগরণের পথে এগিয়ে যায়।

ঙ. তিনি পরিচিত Muslim Brotherhood নেতৃত্বকে পাশ কাটিয়ে ১৯৭৯ সালে 'আল মুজাম্মা আল ইসলামী' নামক একটি ইসলামী সেন্টার স্থাপন করেন। নতুন একটি ইসলামী গ্রুপ গঠন করা দেখে ইসরাইল উক্ত সেন্টারকে লাইসেন্স প্রদান করে। তিনি এই সেন্টারকে তাঁর সকল কাজের কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি ইসলামকে জাতীয় সংগ্রামের আদর্শিক কাঠামো হিসাবে সাব্যস্ত করেন।

চ. তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের দাওয়াহ (প্রচার) ও সমাজ সেবার কৌশলকে গ্রহণ করেন এবং দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে এর সাথে যুক্ত করেন।

ছ. তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টার-এর মাধ্যমে তিনি অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও পাঠাগার স্থাপন করেন। তাঁর এই শিক্ষা আন্দোলনের ফলে গাজায় বর্তমানে ৬৮৩টি স্কুল স্থাপিত হয়েছে তন্মধ্যে ৩৮৩টি পরিচালিত হয় তাঁর সংগঠনের মাধ্যমে। এছাড়া গাজায় রয়েছে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, হামাস পরিচালিত অসংখ্য কিন্ডার গার্টেন স্কুল ও মক্তব। হামাস পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে ১ বেলার খাবার সরবরাহ করা হয়। গাজায় শিক্ষার হার বর্তমানে ৯৯%।

জ. এই সেন্টার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকল্প হিসাবে ইসলামী সাংস্কৃতিক গ্রুপ গঠন করে ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন।

ঝ. এই সেন্টার গাজায় ২টি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে এবং অসংখ্য ছোট-বড় হাসপাতাল, ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

ঞ. ২০০৬ সালে গাজায় আল-আকসা টিভি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়াও রয়েছে রেডিও স্টেশন 'ভয়েস অফ আল আকসা', দৈনিক পত্রিকা 'দি মেসেজ', লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'আল ফাতিহ' নামক পাক্ষিক পত্রিকা, অনলাইন, ফেসবুক, টুইটারে রয়েছে সরব উপস্থিতি।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন

(ক) ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'আল মুজাহেদুল আল ফিলিস্তিনী' নামক

www.pathagar.com

সংগঠন। সামাজিক কাজের পাশাপাশি এ সংগঠন ১৯৮২ সাল থেকে 'মাজদ' ছদ্মনামে ইসরাইলিদের উপর গেরিলা হামলা শুরু করে। ১৯৮২-৮৪ সাল নাগাদ এ সংগঠন গাজা ও পশ্চিমতীরে ইসরাইলী বেসামরিক ও সামরিক স্বার্থে বেশ কয়েকটি সফল হামলা পরিচালনা করে। ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা নতুন এই বিপদের মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করে হুইল চেয়ারে অধিষ্ঠিত শাইখ আহমদ ইয়াসিনকে। অতঃপর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ইসরাইলের সন্তানদের প্রতিশ্রুত ভূমির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অস্ত্রধারণের অপরাধে তাঁকে ১৩ বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ১ বছর পর ১৯৮৫ সালে তিনি ইসরাইল ও Popular Front for the liberation of Palestine General command (PFLP)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত বন্দী বিনিময় চুক্তির আওতায় জেল থেকে মুক্তি পান।

(খ) হামাস প্রতিষ্ঠা

১৯৮৭ সালে শাইখ আহমদ ইয়াসিন, সহযোগী ডা. আবদেল আজিজ রানতিসি, গাজার একদল বিখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ একত্রিত হয়ে 'হারকাত আল মুকাওয়ামা আল ইসলামিয়া' বাংলায় ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন ও ইংরেজিতে Islamic Resistant Movement সংক্ষেপে 'হামাস' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এর শাখা থাকে ২টি। সমাজকল্যাণ শাখা ও রাজনৈতিক শাখা, ১৯৯১ সালে উক্ত ২ শাখার সাথে যোগ করা হয় সামরিক শাখা। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সেনাদের গুলিতে নিহত প্রতিরোধ নেতা ইজেজদ্দিন আল কাসসামের নামানুসারে সামরিক শাখার নাম রাখা হয় কাসসাম ব্রিগেড।

হামাসের ঘোষিত নীতি ছিল—

হামাস তালিবান ও আল-কায়েদার মডেলকে গুরুত্ব দেয় না। রজব তাইয়েব এরদোগানের পরিচালনাধীন তুরস্ক হামাসের পছন্দনীয় মডেল। সবার জন্য শিক্ষা, সেক্যুলারদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ধর্মীয় গ্রুপগুলির সাথে সুসম্পর্ক, মানবাধিকার সমুন্নত রাখা, উদার সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

হামাস প্রতিষ্ঠার পর পরই ফিলিস্তিনীরা পূর্ণ উদ্যোমে দখলদার ইসরাইলীদের প্রতিহত করতে গাজা ও পশ্চিমতীরের রাস্তায় নেমে পড়ে। ফিলিস্তিনী শিশুরা ইটপাটকেল ছুঁড়ে ইসরাইলী সেনাদেরকে প্রতিরোধে নেমে পড়ে। নিরস্ত্র শিশু-কিশোরদের এই প্রতিরোধ ইসরাইলকে ও বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত করে। নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণের উপর ক্যামেরার সামনে গুলি চালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনের এই গণজাগরণ বা ১ম ইন্তেফাদা

www.pathagar.com

'মসজিদের বিপ্লব' হিসাবে পরিচিতি পায়। মসজিদ কেন্দ্রিক হামাস নেতারাই এ আন্দোলন পরিচালনা করে।

এ গণজাগরণে ফিলিস্তিনী শিশু-কিশোররা পাথর হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং হামাস ইসরাইলী সেনাদের উপর গেরিলা হামলা পরিচালনা করে। উভয় পক্ষে অনেক হতাহত হয়। ইসরাইল হাজার হাজার ফিলিস্তিনীকে বন্দী করে নির্যাতন করে। ইন্তিফাদার পর এর মূল পরিকল্পনাকারী হিসাবে শাইখ আহমদকে অভিযুক্ত করে তাঁর গাজার বাড়ি তছনছ করে এবং তাঁকে লেবাননে নির্বাসনে পাঠানোর হুমকি দেয়। হুমকিতে কোনো কাজ না হওয়ায় অবশেষে ১৯৮৯ সালে তাঁকে গ্রেফতার করে চরম নির্যাতন করে। ইসরাইলী সেনাদেরকে হত্যা করা, কিডন্যাপ করা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস প্রতিষ্ঠা করার অপরাধে তাঁকে ৪০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

কারাগারের ভয়াবহ নির্যাতন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে তাঁর ডান চোখ অন্ধ হয়ে যায়, বাম চোখের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়। ফুসফুস, হার্ট, কান, পাকস্থলী ও বৃহদান্ত্রে সমস্যা দেখা দেয়। কেবলমাত্র তাঁর প্রখর মেধাশক্তি, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, আল্লাহর উপর নির্ভেজাল ঈমান অবশিষ্ট থাকে।

তাঁকে মুক্ত করার জন্য কাসসাম ব্রিগেডের প্রচেষ্টা : ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে কাসসাম ব্রিগেড এক সফল অপারেশনে এক ইসরাইলী সেনাকে আটক করে এবং উক্ত সেনার মুক্তির বিনিময়ে তাদের নেতার মুক্তি দাবি করে। ইসরাইল এই দাবি মেনে না নিয়ে উক্ত সেনাকে মুক্তির লক্ষ্যে ভয়াবহ কমান্ডো হামলা পরিচালনা করে। পাল্টা হামলায় কাসসামের তিন যোদ্ধা শহীদ হন, আটক ইসরাইলী সেনা, কমান্ডো ইউনিটের প্রধানসহ তিনজন কমান্ডো এ হামলায় নিহত হয়।

শায়খ আহমদ ইয়াসিনের মুক্তি ও বিজয়

১৯৯৭ সাল, হামাসের রাজনৈতিক প্রধান খালেদ মাশাআল তখন জর্দানের রাজধানী আম্মানে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন, ইসরাইল তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যার জন্য ২ জন স্পেশাল এজেন্টকে আম্মানে পাঠায়। একজন কানাডীয় গুপ্তচরসহ তিনজন অতর্কিতে খালেদ মাশআলের কানে বিষ প্রয়োগ করে। ইসরাইলের ল্যাবরেটরীতে তৈরি এই বিষে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খালেদ মারা যাবেন। খালেদের দেহরক্ষীরা ২ জন ইসরাইলী এজেন্টকে আটক করে জর্দান সরকারের হাতে তুলে দেয়। জর্দানের বাদশাহ হাসান ইসরাইলকে এই মর্মে বার্তা পাঠায় যে, যদি খালেদ মাশাআলের কোনো ক্ষতি হয় তবে ইসরাইলী এজেন্টদের হত্যা করা হবে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা

www.pathagar.com

মোসাদ তাদের ল্যাবরেটরীতে পুনরায় উক্ত বিষের এন্টিডোট প্রস্তুত করে তেল আবিব কারাগার থেকে হামাস নেতা ইয়াসিনকে সঙ্গে করে হেলিকপ্টারে আম্মানে আসেন। বিষের এন্টিডোট ও শায়খ ইয়াসিনকে হামাসের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এন্টিডোটের সাহায্যে খালেদ মাশআল পুনরায় সুস্থ হয়ে যান এবং জর্দানের হাসপাতালে চিকিৎসা নেন আহমদ ইয়াসিন। অতঃপর উভয় নেতা জর্দানের বিমানে চড়ে বিজয়ীর বেশে প্রিয় ভূমি গাজায় ফিরে আসেন। তাঁর এই প্রত্যাবর্তনে গাজা ও পশ্চিমতীরের মানুষ আবেগে আপ্লুত হয় এবং আগামী দিনের স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের নেতাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

দ্বিতীয় ইন্তেফাদা বা গণজাগরণ

মুক্তি পাওয়ার পর থেকে শাইখ আহমদ ইয়াসিন পূর্ণ উদ্যমে প্রতিরোধের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত হন। গাজায় একাধিক হাসপাতাল ও ট্যানেল নির্মিত হয়, বহির্বিশ্ব থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। তারপর ২০০০ সালে শক্তিশালী ২য় ইন্তেফাদা শুরু করা হয়। ইন্তেফাদার শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধানোর কৌশল নিয়ে অগ্রসর হয়। ইসরাইলী সেনাবাহিনী ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের মূল ভবন ঘেরাও করে ফেলে। ফিলিস্তিনী কতৃপক্ষ যেন হামাস নেতাদেরকে বন্দী করে ও ব্যবস্থা নেয় তাঁর জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ হামাসের অসংখ্য নেতাকে গ্রেফতার করে ও শায়খ আহমেদকে তাঁর গাজার বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল আশা করেছিল এর মাধ্যমে হামাস-ফাতাহ লড়াই শুরু হয়ে উভয় পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু শায়খ ইয়াসিন ফাতাহর সাথে সংঘর্ষে না জড়াতে হামাসকে নির্দেশ প্রদান করায় ফিলিস্তিনীরা গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু অভিন্ন শত্রু ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় ইন্তেফাদার কারণ এবং হামাস ইসরাইল কার্যক্রম

ইসরাইল-ফাতাহ অসলো চুক্তির মাধ্যমে তথাকথিত শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ১ম ইন্তেফাদার অবসান হয়েছিল। নিজেদের নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য আরাফাত ও PLO চোখ বুঁজে OSLO চুক্তি সম্পাদন করে। হামাস এই চুক্তি মেনে নেয়নি, শায়খ ইয়াছিন চুক্তির বিনিময়ে PLO'র অস্ত্র সমর্পণকে 'লজ্জাকর আত্মসমর্পণ' হিসেবে অভিহিত করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসী মেনাহিম বেগিন ও ইয়াসির আরাফাত যৌথভাবে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করে। PLO ইসরাইলকে সীমানাবিহীন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

www.pathagar.com

উক্ত চুক্তির পর ইসরাইল অদ্যাবধি নিরাপত্তার নামে, ইহুদি বসতির নামে ফিলিস্তিনীদের উচ্ছেদ করছে ও বসতি নির্মাণ করছে।

এমতাবস্থায় ফিলিস্তিনীদের নাগরিক অধিকার হরণ ও ভূমি দখলের প্রতিবাদে ২য় ইন্তেফাদা শুরু করা হয়। এ প্রতিরোধ আন্দোলন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। উদ্বাস্তু বস্তিকে কেন্দ্র করেই এ আন্দোলন শুরু করা হয়।

২য় ইন্তেফাদায় ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল—

১. অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে দখলদার শক্তিকে সহযোগিতা করা বন্ধ করা।
২. ইসরায়েলের দেয়া আইডি কার্ড ছুঁড়ে ফেলা।
৩. ইসরাইলী কর্তৃপক্ষকে ট্যাক্স দেয়া বন্ধ করা।
৪. শিশু-কিশোরদের পাথর যুদ্ধ।
৫. মানবিক সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত ও বিপ্লবী সঙ্গীত রচনা ও চর্চা করা।
৬. প্রত্যেক শহীদের জন্য গান রচনা ও যুদ্ধ নৃত্য পরিবেশন।
৭. ঘরে ঘরে স্কুল প্রতিষ্ঠা।
৮. বিজয় সঙ্গীত রচনা ও চর্চা করা।
৯. রণসঙ্গীত ও তরবারী নৃত্য পরিবেশনা।
১০. ইসলামী মিউজিক গ্রুপ প্রতিষ্ঠা।
১১. বীরত্বের প্রতীক হিসেবে হযরত আলী (রাঃ)কে স্থাপন।
১২. শিশু-কিশোরদের পাথরের সাথে মলোটভ ককটেল যুক্ত করা।
১৩. ইসরাইল নিয়োজিত ফিলিস্তিনী গুপ্তচরদের দমন।
১৪. অবৈধ ইহুদী বসতি উচ্ছেদ।
১৫. আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার ও ইসরাইলী সেনা হত্যা।
১৬. আহতদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।
১৭. ইসরাইলের কারাগারে বন্দী ফিলিস্তিনী কর্তৃক সিগারেটের কাগজে বন্দী নির্যাতনের খবর বাইরে পাচার করা।
১৮. শহীদদের 'মা'দের গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগানো।
১৯. ইসরাইলী গ্রেফতার এড়াতে ভূগর্ভে ট্যানেল নির্মাণ।

২য় ইন্তেফাদা দমনে দখলদার ইসরাইলীদের পদক্ষেপসমূহ—

১. যেসব ব্যক্তি দখলদার ইসরাইলকে ট্যাক্স দিত না সেসব ব্যক্তি ও পরিবারের ঘরের মালামাল, ফার্নিচার, টিভি নিয়ে যেত ইসরাইলী বাহিনী।
২. যেসব কারখানার মালিক ইসরাইলকে ট্যাক্স দিত না সেসব কারখানার

www.pathagar.com

যন্ত্রপাতি নিয়ে যেত ইসরাইল।

৩. যেসব গাড়ির ট্যাক্স দেয়া হতো না সেসব গাড়ির চালক ও মালিককে গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হতো এবং গাড়ি জব্দ করা হতো।

৪. যেসব নাগরিকের ইসরাইলী আইডি কার্ড থাকতো না তাদেরকে গ্রেফতার ও নির্যাতন।

৫. ফিলিস্তিনী শিশু-কিশোরদের পাথরের জবাবে বুলেট ছুড়ত ইসরাইলী বাহিনী।

৬. ফিলিস্তিনীদের পরিচালিত স্কুলসমূহ বন্ধ করে দেয়া।

৭. প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রদেরকে পরীক্ষার হল থেকে ধরে নিয়ে যেত ইসরাইলী বাহিনী, যাতে তার একটি বছর নষ্ট হয়ে যায়।

৮. ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা সিনবেথ অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনী বন্দীদেরকে হত্যা অথবা পঙ্গু করত।

৯. ফিলিস্তিনী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ঘেরাও করে অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করা।

১০. নেতৃস্থানীয় ২৪৫ জন হামাস নেতাকে দক্ষিণ লেবাননে বহিষ্কার করা।

যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি মদদপ্রাপ্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে সূচিত ২য় ইন্তেফাদায় উভয় পক্ষের যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এ সময় ৯৫০ জন সামরিক-বেসামরিক ইহুদী নিহত হয় এবং ২৮০০ জন ফিলিস্তিনী শাহাদাত বরণ করেন।

হামাস হিজবুল্লাহ সম্পর্ক স্থাপন

হামাস ও হিজবুল্লাহ সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন সংগঠন। হামাসের সবাই সুন্নী মুসলিম, হিজবুল্লাহর সবাই শিয়া মুসলিম। এতদসত্ত্বেও উভয় গ্রুপের কমন শত্রু সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও যায়নবাদী ইসরাইল। হিজবুল্লাকে দমন করার জন্য ইসরাইল দক্ষিণ লেবানন দখল করে। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে দমন করতে না পেরে ইসরাইল নতুন ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে শিয়া-সুন্নী যুদ্ধ শুরু হয় এবং তা আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল এ ষড়যন্ত্র অদ্যাবধি অব্যাহত রেখেছে। আরব বিশ্বের বর্তমান রক্তপাতের পিছনে মূলত এ ষড়যন্ত্রই প্রধানত দায়ী। উক্ত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে ইসরাইল তার অধিকৃত দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহ এলাকায় ১৯৮৯ সালে ৪০০ জন হামাস নেতাকে এবং ১৯৯২ সালে ৪১৫ জন হামাস যোদ্ধাকে নির্বাসনে পাঠায়। শাইখ আহমদ ইয়াসিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত এসকল হামাস নেতা ও যোদ্ধারা উক্ত নির্বাসনকে শাপে-বর হিসেবে দেখে। নির্বাসিত এসব নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ লেবাননে অবস্থানরত হিজবুল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে এবং হিজবুল্লাহর নিকট থেকে

www.pathagar.com

অত্যাধুনিক যুদ্ধকৌশল ও সাংগঠনিক জ্ঞান অর্জন করে। পরবর্তীতে এসব হামাস নেতা ফিলিস্তিনে ফিরে এসে হিজবুল্লাহর আদলে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে।

শায়খ আহমদ ইয়াসিনের হত্যা প্রচেষ্টা ও শাহাদাত

১২ বছর বয়স থেকে পঙ্গু এবং ইসরাইলী নির্যাতনে প্রায় অন্ধ ও বধির হয়ে যাওয়া, চরম অসুস্থ ও বৃদ্ধ হামাস নেতাকে কোনোভাবে দমন করতে না পেরে ইসরাইল অবশেষে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সংক্রান্ত ঘটনাপরম্পরা নিম্নরূপ :

২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত ফাতাহ-ইসরাইল আকাবা শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলকে শায়খ আহমদ ইয়াসীন প্রত্যাখ্যান করেন এবং একটি একতরফা যুদ্ধবিরতির ঘোষণা প্রদান করেন। ৩ জুলাই ২০০৩ সালে হামাসের আত্মঘাতীরা জেরুজালেমে বাসে হামলা চালিয়ে ২১ জন ইহুদীকে হত্যা করার পর যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে যায়। ২০০৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ইসরাইলের জঙ্গী এপাচি হেলিকপ্টার ও F16 যুদ্ধ বিমান গাজার একটি ভবনে উপর্যুপরী মিসাইল হামলা চালায়। হামলায় শাইখ ইয়াসিন সামান্য আহত হন কিন্তু তার সঙ্গী সাথীদের অনেকে হতাহত হয়। হামলার পর তিনি মিডিয়াকে বলেন, "আগামী দিনে প্রমাণিত হবে— ইসরাইলী হত্যাকাণ্ড হামাসকে অবদমিত করতে পারবে না। হামাস নেতারা মৃত্যুভয়ে ভীত নয় বরং তারা শহীদী মৃত্যুর প্রত্যাশা নিয়ে লড়াই করে। যতদিন আমরা শহীদ না হব অথবা বিজয়ী না হব ততদিন জিহাদ অব্যাহত থাকবে। হামাস ইসরাইলকে এমন শিক্ষা দেবে, যা ইসরাইল কখনো ভুলতে পারবে না।"

উক্ত হামলার পর তিনি আর কখনও আত্মগোপন করেননি তবে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। তিনি যথারীতি হুইল চেয়ারে করে মসজিদে যেতেন এবং সাংবাদিকদেরকে নিজ বাসায় সাক্ষাৎকার প্রদান করতেন।

১৪ জানুয়ারি ২০০৪ সালে ইসরাইল-গাজা সীমান্তের ইরেজ ক্রসিংয়ে আত্মঘাতী হামলায় ৪ জন বেসামরিক ইসরাইলী নিহত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় শাইখ আহমদ ইয়াসিন মিডিয়াকে বলেন "আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা আমি না করলেও আত্মঘাতী জিহাদীরা নিজেদের মনোবাসনা পূর্ণ করেছে।"

এ ঘটনা ও বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ইসরাইলের উপপ্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে ইয়াসিনকে হত্যা করার ঘোষণা প্রদান করেন। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন শাইখ আহমদ ইয়াছিনকে গণহত্যাকারী ও সন্ত্রাসীদের Master Mind

www.pathagar.com

হিসাবে আখ্যায়িত করেন। হামাস কর্তৃক ডজন-ডজন আত্মঘাতী হামলা ও পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডকে শাইখ আহমদের কর্মকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেন। ইসরাইলের সরকারি ওয়েবসাইটে লিখা হয় "হামাসের সকল হামলার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে ইয়াছিন, ইসরায়েলের আভ্যন্তরীণ শহরে কাসসাম রকেট হামলার নির্দেশদাতাও ইয়াছিন, সন্ত্রাসী স্থাপনার মূলেও রয়েছে ইয়াছিন।" জবাবে ইয়াছিন এক বিবৃতিতে বলেন, "বেসামরিক ফিলিস্তিনীদের হত্যার বদলা হিসাবেই বেসামরিক ইসরাইলীদের হত্যা করা হয়। ইসরাইলকে অবশ্যই তার কর্মফল ভোগ করতে হবে।"

তাঁর শাহাদাত

২২ মার্চ ২০০৪ তারিখে ফজরের নামাজ আদায় শেষে হুইল চেয়ারে করে ঘরে ফেরার পথে রাস্তায় ইসরাইলী AH-64 এপাচি হেলিকপ্টার থেকে ৫৫০ পাউন্ড ওজনের Hell fire missile নিক্ষেপ করে শায়খ আহমদ ইয়াসিনকে হত্যা করা হয়। হামলায় তাঁর তিনজন দেহরক্ষী ও ৬ জন পথচারী নিহত হয়। তাঁর ডেপুটি আবদেল আজিজ রানতিসি ও তাঁর দুই সন্তানসহ ১৩ জন পথচারী আহত হয়। হামলায় তাঁর দেহ ও হুইল চেয়ার টুকরা টুকরা হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ এগিয়ে এসে তাঁর দেহের টুকরাসমূহকে একত্রিত করে দাফনের ব্যবস্থা করে। তাঁর জানাজায় ২ লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর ডেপুটি আবদেল আজিজ রানতিসী হামাসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী ২৬ দিনের মাথায় একই প্রকারে হামলা করে রানতিসীকেও হত্যা করে ইসরাইলী এপাচি হেলিকপ্টার, এর পর হামাসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নির্বাসিত নেতা খালেদ মাশআল।

শায়খ আহমদ ইয়াছিন হত্যার প্রতিক্রিয়া

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান, জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, আফ্রিকান ইউনিয়ন ও আরবলীগ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানায়। বেসামরিক নাগরিকদেরকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব আনা হয়। প্রস্তাবের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয়, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়, রুমানিয়া ভোটদানে বিরত থকে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনে একইরূপ প্রস্তাব আনা হলে প্রস্তাবের পক্ষে ৩১ ভোট, ভোটদানে বিরত ছিল ১৮টি দেশ, প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় ২টি দেশ, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়।

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনে প্রতিক্রিয়া

ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করে, স্কুলসমূহ বন্ধ ঘোষণা করে। হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া বলেন, "ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন নরকের দরজা উন্মুক্ত করেছে, এখন সময় এসেছে শায়খ আহমদ ইয়াছিনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার।" ইসরাইল দেশব্যাপী সতর্কাবস্থা জারি করে। হত্যাকাণ্ড পরবর্তী ২ সপ্তাহের মধ্যে হামাস এই প্রথম সমগ্র ফিলিস্তিনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। হামাসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে আবদেল আজিজ রানতিসি ঘোষণা করেন, "ইসরাইল সকল স্থানে সকল উপায়ে হামলা পরিচালনার রাস্তা খুলে দিয়েছে।" ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাউল মোফাজ প্রকাশ্যে শায়খ ইয়াছিন হত্যার পক্ষে তার দেশের অবস্থান ঘোষণা করে।

৩১ আগস্ট ২০০৪ সালে হামাসের আত্মঘাতী হামলায় বীরসেবায় ২টি ইসরাইলী বাস বিধ্বস্ত হয়, এতে ১৫ জন ইসরাইলী নিহত হয় এবং ৮০ জন আহত হয়। এই হামলাকে প্রকাশ্য রাজপথে স্বাগত জানায় ২০ হাজার সশস্ত্র হামাস যোদ্ধা। হামাসের চোরাগোপ্তা হামলায় টিকতে না পেরে ইসরাইল গাজা এলাকা থেকে ২০০৫ সালে সেনা প্রত্যাহার করে।

২০০৫ সালে হামাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কট করে এবং ইয়াসির আরাফাত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে পশ্চিম তীর ও গাজায় মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। হামাস এ স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে ইয়াসীর আরাফাতের ফাতাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১/৩ ভাগ মিউনিসিপালিটিতে জয়লাভ করে সবাইকে হতবাক করে দেয়।

আরাফাত ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্বের বিনিময়ে ফিলিস্তিনের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া সত্ত্বেও ইহুদীবাদীরা বিষপ্রয়োগে ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করে। মাহমুদ আব্বাস ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইয়াসির আরাফাত জীবনের বেশিরভাগ অংশ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করেছেন। অবশেষে খ্রিষ্টান তরুণী 'সুহাকে' বিয়ে করে ইহুদী খ্রিষ্টানদের বন্ধু হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর অতীত কার্যকলাপের জন্য ফিলিস্তিনীরা তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর মৃত্যুর পর শোকাভিভূত ফিলিস্তিনীদের জন্য ২০০৬ সালে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ আশা করেছিল Sympathy vote পেয়ে ইয়াসির আরাফাতের দল ফাতাহ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করবে। এমতাবস্থায় সেক্যুলার ফাতাহকে দিয়ে ধর্মীয় দল হামাসকে দমন করা যাবে। জাতিসংঘের তদারকিতে ও পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হামাস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হয়। ১৩২ আসনের সংসদ নির্বাচনে হামাস লাভ করে ৭৬টি আসন, ফাতাহ ৪৩টি আসন।

www.pathagar.com

হামাসের নিরঙ্কুশ বিজয়ে তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালাদের বিষদাঁত বেরিয়ে পড়ে। জাতিসংঘ, রাশিয়াসহ পাশ্চাত্য হামাসের সরকার গঠনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ সৃষ্ট ও তাবেদার সেক্যুলার ফাতাহ গোষ্ঠীও গণতন্ত্র ভুলে গিয়ে দখলদারদের পক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে হামাস ফাতাহ সংঘর্ষ-সংঘাত শুরু হয়। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ হলো :

১. ২০ মার্চ ২০০৬ তারিখে হামাস নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ফাতাহর সদস্যরা হামাস সরকারের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে।

২. ২৮ জুন ২০০৬ তারিখে ইসরাইলী সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের ৮ জন মন্ত্রী, ২০ জন সংসদ সদস্য ও ৬৪ জন হামাস কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে।

৩. সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় মক্কায় হামাস-ফাতাহ ঐক্যচুক্তি সম্পাদিত হয় ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে এবং মার্চে ঐক্য সরকার গঠিত হয়। এতদসত্ত্বেও ফাতাহর অসহযোগিতার ফলে সরকারি কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ২০০৭-এর জুনের শুরুতে গাজায় হামাস-ফাতাহ সংঘর্ষ শুরু হয়। ফাতাহকে বিতাড়িত করে হামাস গাজার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। মাহমুদ আব্বাস কেন্দ্রে হামাস সরকারকে বরখাস্ত করে। এ সংঘর্ষে ৬০০ ফিলিস্তিনী নিহত হয়।

৪. হামাসের সরকার গঠনের পর থেকে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্য ও তাদের তাবেদার আরব রাজা-স্বৈরশাসকরা গাজার উপর সর্বাত্মক অবরোধ বজায় রেখেছে এবং ইসরাইল বারবার গাজা দখলের জন্য রক্তাক্ত ও নৃশংস হামলা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। সর্বশেষ ২০০৬ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইসরাইল গাজায় যেসব সর্বাত্মক হামলা পরিচালনা করেছে সেগুলি হলো :

   ক. ২৮ জুন ২০০৬ তারিখে 'Operation Summer Rains'.

   খ. ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে ইসরাইল যে হামলা শুরু করে তার নাম দেয় Operation Cast Lead. এই হামলা থেমে থেমে ১৭ জানুয়ারি ২০০৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ হামলায় হামাসের হিসাবে ৪৫০ জন ফিলিস্তিনী যোদ্ধা এবং ইসরাইলের মতে, ৭০৯ জন ফিলিস্তিনী যোদ্ধা নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে গাজার পুলিশ প্রধান তৌফিক জাব্বার, নিরাপত্তা প্রধান সালাহ আবু শ্রাখ, প্রবীণ ধর্মীয় নেতা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিজার রাইয়ান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাঈদ শেয়াম অন্যতম।

   গ. ৮ জুলাই ২০১৪ তারিখ থেকে ইসরাইল গাজার উপর Operation

www.pathagar.com

Protective Edge নামক এক সর্বাত্মক হামলা শুরু করে। ইসরাইল ও তার অপকর্মের সহযোগিদের ধারণা ছিল হামাসের একঘরে অবস্থায় হামাসের উপর হামলা করে গাজা দখল করবে। কেননা হামাসের সবচেয়ে বড় অর্থের যোগানদাতা সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের চাপে ২০০৪ সাল থেকে অর্থপ্রদান বন্ধ রেখেছে, ২য় অর্থের যোগানদাতা ইরান অবরোধের কারণে ২০০৯ সাল থেকে অর্থপ্রদান কমিয়ে দিয়েছে, সিসির অভ্যুত্থানের কারণে মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুড হামাসকে অর্থ যোগান দিতে সক্ষম নয়, হামাসের অপর একটি সাহায্যদাতা দেশ সিরিয়া গৃহযুদ্ধের কারণে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত তদপুরি কাতার ছাড়া সকল আরব দেশ (ওমান ব্যতীত) ইতিমধ্যে ইসরাইলের সহযোগী হওয়ায় হামাস সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন।

সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি হামাসের প্রতিকূলে এবং ইসরাইলের অনুকূলে থাকায় ইসরাইল ও তার প্রকাশ্য মদদদাতা যুক্তরাষ্ট্র এ অভিযানে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গাজায় হামাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক ফাতাহকে ক্ষমতাসীন করবে এবং ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে গাজায় নির্বাসিত করে সমগ্র পশ্চিমতীরে নিরঙ্কুশ ইসরাইলী দখলদারিত্ব সম্প্রসারণ করবে—এই ছিল যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের লক্ষ্য। কিন্তু দূরদর্শী নেতৃত্বের পরিচালনাধীন হামাস সকল শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ইসরাইলী বাহিনীকে ৫০ দিনের রক্তাক্ত লড়াইয়ে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। বিশ্বের ১নং পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও ৫ম শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিকারী ইসরাইল ছোট একটি জনপদের নিকট পরাজিত হওয়ায় ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ISIL-কে মদদ দিচ্ছে মুসলিম বিশ্বে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ২০১৪ সালের এই যুদ্ধে গাজায় ২১০১ জন ফিলিস্তিনী নিহত হয়, তন্মধ্যে ১৪৬০ জন বেসামরিক নাগরিক এবং অবশিষ্ট ৬৪১ জন হামাস যোদ্ধা। অপরদিকে ৭২ জন ইসরাইলী সেনা ও ৭ জন বেসামরিক ইসরাইলী এ যুদ্ধে নিহত হয়। তবে হামাসের দাবি আড়াই শতাধিক ইসরাইলী সেনা এ যুদ্ধে নিহত হয়।

শায়খ আহমদ ইয়াছিনের ভবিষ্যৎবাণী ও প্রত্যয় যা ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে

এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে পাঠকদের পুনরায় শায়খ আহমদ ইয়াসিনের উপলব্ধি ও ঘোষণা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তা হলো—

১. তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"ফিলিস্তিনীদেরকে আত্মনির্ভরশীল,

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশস্ত্র হতে হবে। কোনো দেশ, জাতি, মুসলিম বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর নির্ভর করলে ফিলিস্তিনীদের মুক্তি আসবে না।" ২০১৪ সালের ইসরাইলী হামলায় হামাসের বিজয় তাঁর এই উপলব্ধির সঠিকতা প্রমাণ করেছে।

২. তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"কারো দয়ায় পাওয়া অধিকার স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা শক্তি প্রয়োগে আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, আমরা আমাদের শক্তি দিয়ে তা অর্জন করব।" ২০০৭ সাল থেকে হামাস কর্তৃক গাজার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ তাঁর এ ঘোষণার বাস্তবতা। অপর দিকে দখলদার ও সাম্রাজ্যবাদের দয়ায় পাওয়া পশ্চিমতীরের অধিকার ফাতাহর জন্য কোনো স্বাধীনতা এনে দেয়নি। ইসরাইল অব্যাহতভাবে পশ্চিমতীরে অবৈধ বসতি নির্মাণ করে ফিলিস্তিনীদের বাস্তুচ্যুত করছে এবং যখন যা ইচ্ছা তা করছে। অথচ ইসরাইল গাজা ভূখণ্ডে যা ইচ্ছা তা করার অধিকার ও শক্তি রাখে না।

৩. তিনি তাঁর জাতির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন এইভাবে—"ফিলিস্তিনীদের বর্তমান প্রজন্ম গাজা ও পশ্চিমতীর নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। পরবর্তী প্রজন্ম সমগ্র ফিলিস্তিন এলাকায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে।" গাজায় স্বাধীন-সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছার আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে। আশা করা যায় আগামী দিনে তাঁর ভবিষ্যতবাণী পূর্ণতা পাবে।

আত্মঘাতী হামলার পক্ষে শায়খ আহমেদের বক্তব্য

একজন ইহুদী বসতি স্থাপনকারী জেরুজালেমের হেবরন মসজিদে অতর্কিত গুলি চালিয়ে ৩০ জন মুসল্লিকে হত্যা করার পর তিনি হামাসকে আত্মঘাতী হামলার নির্দেশ প্রদান করেন। এরূপ হামলার পক্ষে তিনি বলেন—

১. "ফিলিস্তিনীদের শাহাদাতের মাধ্যমেই দীর্ঘমেয়াদে বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে। আত্মঘাতী হামলাকারী ফিলিস্তিনীরা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে জাতীয় মর্যাদাকে সমুন্নত করছে।"

২. "আত্মঘাতী শহীদগণ মৃত্যু-পরবর্তী সুখী জীবনকে বেছে নিয়েছেন। নিজেদের শাহাদাতের মাধ্যমে নিজ জনগণের জন্য সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচন করছেন।"

জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী

১. তিনি ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনার বিরোধিতা করে

www.pathagar.com

বলেন—"অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্র ও ইহুদীদের সাথে আপোষ করা মহাপাপ। অবৈধ রাষ্ট্রটি অবশ্যই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড ইসলামী ভূখণ্ড হিসেবে কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। আমরা যে পথ অবলম্বন করেছি তাতে আমরা শহীদ হব অথবা বিজয়ী হব।"

২. আমরা প্রতিরোধের কঠিন পথ বেছে নিয়েছি। শাহাদাত অথবা বিজয়ের মাধ্যমেই এ যাত্রা সমাপ্ত হবে।

৩. তিনি প্রায়ই বলতেন—"আমি জানি আমাদের এই পথ বড়ই কঠিন, রক্তপিচ্ছিল, বিপদসংকুল কিন্তু ভবিষ্যৎ আমাদেরই ইনশা'আল্লাহ।

৪. ফাতাহ-ইসরাইল OSLO চুক্তিকে তিনি 'বিরাট প্রতারণা' ও 'লজ্জাকর আত্মসমর্পণ' হিসাবে অভিহিত করেন। শান্তি প্রক্রিয়ার নামে PLOর আত্মসমর্পণ উপলক্ষে তিনি বলেন, "শান্তি প্রক্রিয়ায় কোনো শান্তি আসবে না, অবৈধ ইসরাইলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। ইহুদীদের কোনো আত্মরক্ষার অধিকার নেই, স্বীকৃতি তো দূরের কথা।"

হামাসের জনপ্রিয়তার কারণ

১. হামাস নেতৃত্ব দূরদর্শী, সাহসী, দেশপ্রেমিক, ইসলামপ্রিয় এবং সাচ্চা ইসরাইলবিরোধী।

২. সততা, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা ও সরলতা হামাস নেতৃত্বের বৈশিষ্ট। হামাস স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতাসমৃদ্ধ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩. হামাস উপকারী সামাজিক কর্মসূচি ও উচ্চমানের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে প্রতিটি ফিলিস্তিনীকে শিক্ষার আলোদানের ব্যবস্থা করেছে।

৪. ইসরাইলী গবেষকদের মতে, হামাসের ৯০% হলো সামাজিক শিক্ষা বিস্তার, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ।

৫. ফিলিস্তিনীদের নিকট হামাস 'সংকট মোচন' সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

হামাসের অর্থের উৎস

প্রথমদিকে মিসরের ইসলামী ব্রাদারহুড, জর্দান ও লেবাননের নির্বাসিত ফিলিস্তিনী ব্যবসায়ীরা হামাসের অর্থের যোগানদাতা ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত সৌদি আরব হামাসের শীর্ষ অর্থ যোগানদাতা ছিল। হামাসের প্রতিষ্ঠা থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ইরান ২য় বৃহত্তম অর্থ যোগানদাতা ছিল। ইরান ও সিরিয়াই মূলত হামাসের অস্ত্র ও প্রযুক্তির যোগানদাতা। হিজবুল্লাহ হামাসকে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। মুসলিম বিশ্বের ইসলামপ্রিয় দানবীর ব্যক্তিরা

www.pathagar.com

সবসময় হামাসকে সহাযোগিতা করে। নির্বাসিত ফিলিস্তিনীরা সবসময় হামাসকে সহায়তা করে। বর্তমানে কাতার ও তুরস্ক হামাসের অর্থের প্রধান যোগানদাতা।

[ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির উপর তাঁর স্বউপার্জিত জ্ঞান তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সমৃদ্ধ করায় তিনি তাঁর নিজের জাতির ও মুসলিম বিশ্বের সমস্যাগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এর সার্বিক সমাধানের সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তাঁর জাতির কৃতিত্ব এই যে, তাঁর জাতি সঠিক ব্যক্তিকে চিনতে সক্ষম হয়েছিল। এজন্য জাতি ইয়াসির আরাফাতের ন্যায় আপাত বিখ্যাত ব্যক্তির নেতৃত্বের চেয়ে একজন পঙ্গু, বধির, প্রায়ান্ধ কিন্তু জ্ঞানী, মেধাবী, দূরদর্শী ও ঈমানদার লোককে নিজেদের নেতা হিসাবে বরণ করে নিয়েছিল। ফিলিস্তিনীরা যদি সঠিক নেতা চিনতে ভুল করত, তবে ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর সাথে সাথে ফিলিস্তিনী জাতির সংগ্রাম ও অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।]

তাঁর আর একটি বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট সেক্যুলারিস্ট, কমিউনিস্ট এবং শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই নীতির কারণেই শিয়া ইরান সবসময় হামাসকে সাহায্য করেছে এবং শিয়া হিজবুল্লাহ হামাসকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। মুসলিম বিশ্বকে চলমান গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করে অজেয় শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাঁর অনুসৃত ঐক্য প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র হামলা থেকে রক্ষা পেতে ও বিজয়ী হতে তাঁর সমরকৌশলের ও সামাজিক প্রশিক্ষণকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। ১০৯৫ সাল থেকে পরবর্তী ২০০ বছর ধরে খ্রিষ্টান বিশ্বের সম্মিলিত শক্তির চাপিয়ে দেয়া ক্রুসেডে মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার মূলমন্ত্রও ছিল শিয়া-সুন্নী ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। সর্বগ্রাসী তাতারী হামলা থেকে মুসলিম বিশ্বের ঘুরে দাঁড়ানোর মূলমন্ত্রও ছিল এই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস।

মুসলিম বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেয়া বর্তমান ইহুদী, খ্রিষ্টান ও বর্ণবাদী হিন্দুদের অঘোষিত ক্রুসেড থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে, ঘুরে দাঁড়াতে হলে, বিজয়ী হতে হলে ইরানের বিপ্লবী নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী এবং ফিলিস্তিনের শায়খ আহমদ ইয়াসিনের আদর্শ ও কর্মপন্থাকে কাজে লাগাতে হবে। এই দুই মহান ব্যক্তির আদর্শই বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছে।

মুসলিম বিশ্বের যুবকদের প্রতি সতর্কবার্তা এই যে, মুসলিম যুবশক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ বর্তমানে সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে বিভিন্ন জেহাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। **ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যে, আল**

www.pathagar.com

কায়েদা, আলশাবাব, বেকো হারাম, ISIL, জেএমবি, ও টিটিপি সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ইসলাম নামধারী সন্ত্রাসী সংগঠন। আরবী নামধারী ইহুদীরা এসব সংগঠনের নেতা। এদের নেপথ্য পরিচালক হচ্ছে যায়নবাদী ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ ও ভারত। মুসলমানদেরকে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করা, মুসলিম যুবশক্তিকে ধ্বংস করা, সঠিক ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের ইমেজ নষ্ট করে ইসলামী প্রতিরোধ শক্তিকে ধ্বংস করে মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা এ অপকৌশল গ্রহণ করেছে। এ ফিতনা থেকে বাঁচতে প্রয়োজন ব্যাপকভাবে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা, তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করা এবং কোনো দল বা ব্যক্তিকে অনুসরণ করার পূর্বে যাচাই বাছাই করা ও এর চৌদ্দ গোষ্ঠীর খোঁজখবর নেয়া। নিজ জাতিকে নেতৃত্বশূন্যতা থেকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন সঠিক শিক্ষানীতি, সিলেবাস প্রণয়ন করা এবং ব্যবসা করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম যোগ্য নেতৃত্বের বৈশিষ্ট হবে এরূপ—

১. জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী ব্যক্তি।
২. সৎ, যোগ্য, সাহসী, দূরদর্শী, নির্লোভ, আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও আপোষহীন ব্যক্তি।
৩. ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তি।
৪. Public Life ও Private Life-এর মধ্যে বৈপরীত্য নেই—এমন ঈমানদার ব্যক্তি।
৫. প্রতিপক্ষের কৌশলসমূহের মোকাবিলায় কাউন্টার তত্ত্ব ও কৌশল উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়নে পারদর্শী ব্যক্তি।

তথ্যসূত্র

উইকিপিডিয়া, ইসরাইলী পত্রিকা, আলজাজিরা Inside Story এবং রেডিও তেহরান।

২ জানুয়ারি ২০১৪

www.pathagar.com

শাহাদাতে কারবালার ঘটনাবলী ও শিক্ষা

হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমানরা জেরুজালেমসহ সমগ্র সিরিয়া-ফিলিস্তিন জয় করে রোমান সম্রাটের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে। হযরত ওমর (রা.) আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন। তখন থেকে হযরত আলী (রা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত মুয়াবিয়া (রা.) সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর ইন্তেকালের পর মুয়াবিয়া (রা.) ইসলামী বিশ্বের বেশির ভাগ অংশে নিজের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করেন। মুগীরা ইবনে শুবার প্ররোচণায় আমীর মুয়াবিয়া (রা.) স্বীয় পুত্র ইয়াজীদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। এরূপ খলিফা নির্বাচন প্রথা ইসলামের নীতি-আদর্শবিরোধী হওয়ায় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বক্কর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র এবং হযরত ইমাম হোসইন (রা.) এর বিরোধিতা করেন।

এ বিষয়ে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের মন্তব্য ছিল—"আমিরুল মু'মেনীন মুয়াবিয়া (রা.) পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতি নয়; বরং রোম সম্রাট কায়সার বা পারস্য সম্রাট কিসরার রাজতান্ত্রিক পদ্ধতি। অতএব তাআমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন, "এই নির্বাচন পদ্ধতি মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নয়, বরং তাদের ধ্বংসের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এতে 'খিলাফতে ইসলামিয়া' কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করবে। অর্থাৎ পিতার পর পুত্রই খিলাফতের অধিকারী হবে।"

হিজরি ৬০ সনের ২২ রজব বৃহস্পতিবার ৭০ বছর বয়সে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) ইন্তেকাল করেন। ইয়াজীদ তখন দামেস্কের বাইরে শিকারে ব্যস্ত ছিল। কয়েকদিন পর ইয়াজীদ দামেস্কে এসে খলিফা পদে আসীন হয়। তিনি তাঁর খিলাফতের পক্ষে বায়আত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সে সময়ে জীবিত অনেক সাহাবী ইয়াজীদের প্রতিনিধির হাতে

www.pathagar.com

বায়আত গ্রহণ করেননি এবং মক্কা ও মদীনার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সাহাবীসহ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াজীদকে বৈধ খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। ইতিমধ্যে ইয়াজীদের নিয়োগকৃত মদিনার শাসক ইয়াজীদের পক্ষে বায়আত গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ-ভীতি প্রদর্শন করায় ইমাম হোসাইন (রা.)সহ অনেকে মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান।

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর মদিনা ও মক্কায় অবস্থানকালে কুফা ও বসরার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইমাম হোসাইনকে কুফায় গিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শত শত চিঠি প্রেরণ করেন। ইয়াজীদের বিভিন্ন দুষ্কর্ম প্রত্যক্ষ করে ইমাম হোসাইন (রা.) কুফার পথে রওয়ানা হন। কিন্তু কুফার সন্নিকটে কারবালা নামক স্থানে পৌঁছার পর ইয়াজীদের সৈন্যবাহিনী তাঁকে তাঁর সঙ্গীগণ ও পরিবার-পরিজনসহ ঘেরাও করে ফেলে। ইমাম হোসাইনের কাফেলায় ৭০ জন মতান্তরে সর্বোচ্চ ২৪০ জন নারী-পুরুষ ছিল। অপরদিকে ইয়াজীদের পাঠানো সেনাসংখ্যা ছিল ৫ হাজার। ইয়াজীদের বায়আত গ্রহণ করে বশ্যতা স্বীকার করার জন্য উক্ত সেনাদল ইমামকে দীর্ঘ ৮ দিন কারবালায় অবরুদ্ধ করে রাখে এবং এক পর্যায়ে ফোরাত নদী থেকে পানি সংগ্রহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াজীদের হাতে বায়আত গ্রহণ করার পরিবর্তে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়াকে বেছে নেন। ফলে ৬১ হিজরি সনের ১০ মহররম সকাল থেকে যুদ্ধ শুরু হয়।

যুদ্ধের বর্ণনা

সর্বপ্রথম ইয়াজীদ বাহিনীর যে যোদ্ধা ইমাম হোসাইনকে আঘাত করতে এগিয়ে আসে তাকে তার ঘোড়া পিঠ থেকে সজোরে ফেলে দেয় এবং সে নিহত হয়। ইয়াজীদের ১টি সেনাদলের প্রধান হুর ইবনে ইয়াজীদ তামিমী ইমাম হোসাইনের কাছে এসে ক্ষমা চায় ও তওবা করে এবং ইমাম হোসেনের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। এরপর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথমে ইমাম হোসেনের সঙ্গী-সাথীরা যুদ্ধ করে শহীদ হন। অতঃপর ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ৪ ভাই যথাক্রমে আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, জাফর ও ওছমান যুদ্ধ করে শহীদ হন। অতঃপর তাঁর কিশোর পুত্র মুহাম্মদ কাসিম বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হন। ইমাম হোসাইন (রা.) এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের আপনজনদের করুণ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন। এরপর ইমাম হোসাইন (রা.) নিজে একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সম্মিলিত শত্রুবাহিনী ইমাম হোসাইন (রা.)-এর উপর হামলা করে। হামলায় তাঁর ঘোড়া মারা গেলে তিনি পদব্রজে যুদ্ধ শুরু করেন। এই অসম যুদ্ধে তিনি অনেক শত্রুসেনাকে হত্যা করেন। ইতিমধ্যে তাঁর শরীরে ৪৫টি তীর বিদ্ধ

www.pathagar.com

হয়। ৩৩টি বর্শা ও তরবারির ৪৩টি আঘাত লাগে। এতেও পরাজয় স্বীকার না করায় তৎকালীন কুফা ও বসরায় ইয়াজীদের নিয়োগকৃত শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানের পাঠানো ঘাতক বাহিনীর প্রধান সিমার যিল জাওশান আরো ছয় ব্যক্তিকে নিয়ে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর উপর হামলা করে। তাদের একজন ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বাম হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং অপরজন সিনান ইবনে আনাস নারঈ পিছন থেকে তাঁর পিঠে বর্শা দিয়ে আঘাত করে, যা তাঁর পেট ভেদ করে বেরিয়ে যায়। উক্ত সিনান উক্ত বর্শা টেনে বের করার সাথে সাথে ইমাম হোসাইন (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ও সিমার এর নির্দেশে তাঁর মাথা কেটে নেয়া হয় এবং উক্ত উবায়দুল্লাহর নির্দেশে বারোটি ঘোড়া দ্বারা পদদলিত করে তাঁর পবিত্র দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করা হয়।

ইমাম হোসাইন (রা.)কে নিজের শাহাদাত এবং অন্যান্য যাবতীয় বিপদ থেকেও মর্মান্তিক যে দৃশ্যটি কারবালা প্রান্তরে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল তা হলো—তিনি তাঁর চোখের সামনে তাঁর সঙ্গী-সাথী, ভাই ও আপন ছেলেদের শহীদ হতে দেখেছেন এবং দেখেছেন আপন পরিবারের বোন-স্ত্রী ও কন্যাদেরকে তাদের জন্য হা-হুতাশ করতে। তাঁর শাহাদতের পর তাঁবুতে অসুস্থ শিশুপুত্র জয়নুল আবেদীন ছাড়া নবীবংশে আর কোনো জীবিত ব্যক্তি রইল না। ইমাম হোসাইনের সঙ্গী এবং তাঁর বংশের লোকেরা একদিকে যেমন বীরত্বের অপূর্ব নমুনা পেশ করেছেন। অন্যদিকে তেমনি স্থাপন করেছেন বিশ্বস্ততা ও আত্মোৎসর্গের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

কারবালার শিক্ষা

ক. অবৈধ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী, দুঃশ্চরিত্র ও জালেম সরকারের বিরোধিতা করা মুসলমানদের জন্য ফরজ। এ প্রসঙ্গে ইমাম হোসাইনের বক্তব্য ছিল—

প্রথমত, ইয়াজীদের খলিফা নির্বাচিত হওয়া ছিল শরীয়তবিরোধী, তাই তার হুকুমতও ছিল শরীয়তবিরোধী।

দ্বিতীয়ত, তার স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। সে খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদ ও নৃত্য-গীত নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সে মদ্যপান করত।

খ. অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী জালেম ও দুঃশ্চরিত্র শাসকদের ব্যাপারে মুসলিম জনগণের করণীয় সম্পর্কে ইমাম হোসাইন (রা.) কারবালার পথে ইয়াজীদের সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে যে ভাষণ প্রদান করেন তা হলো—

www.pathagar.com

"লোকসকল, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন বাদশাহকে দেখল—যে অত্যাচারী, আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল করে, আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, রাসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা করে, আল্লাহর বান্দাদের উপর পাপাচার ও জবরদস্তিমূলক শাসন চালায়—অথচ সে ব্যক্তি যদি উক্ত শাসকের বিরোধিতা না করে অথবা উক্ত শাসককে ঘৃণা না করে আল্লাহর এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি ঐ বাদশার পরিবর্তে নীরব দর্শক হয়ে থাকা লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তোমরা ভালোভাবে বুঝে নাও। এসব নিষ্ক্রিয়-নীরব লোকেরা শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে। এরা ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিসমূহ অকেজো করে দিয়েছে। তারা অন্যায়ভাবে মালে-গনিমতে ভাগ বসিয়েছে এবং আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু হারাম করেছেন সেগুলোকে হালাল এবং যে সমস্ত বস্তু হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করেছে। অতএব, এসব ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের ঈমানী চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়ার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে।"

গ. পাপাচারী ব্যক্তি মুসলমানদের শাসক হলে যে ক্ষতি হয় তা হলো—ইয়াজীদ বাস্তব জীবনের যে নমুনা জনসাধারণের সামনে পেশ করেছে তা ছিল পাপাচার ও শরীয়তবিরোধী। এর দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও আমলে জিন্দেগী দারুণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। দুর্বল ঈমানের লোকেরা রাজকীয় পাপাচারের নমুনা দেখে নিজেরাও নীতি-নৈতিকতাবিরোধী কাজকর্মে বেপরোয়া হয়ে উঠে। ইয়াজীদের আদর্শহীনতা মুসলমানদেরকে গান-বাজনা ও মদ্যপানের প্রতি আকৃষ্ট করে। অথচ ইতিপূর্বে মুসলিম বিশ্বে এসবের অস্তিত্ব ছিল না।

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্ত ও আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখলকারী, চরিত্রহীন ও জালেম শাসক যেন মুসলিম দেশে ক্ষমতাসীন হতে না পারে তার জন্য সকল মুসলমানকে সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে। অন্যথায় নিষ্ক্রিয়তার জন্য জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে হবে। স্বেচ্ছায় শাহাদাত বরণের মাধ্যমে ইমাম হোসাইন (রা.) আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজের ও নিজের পরিবারের জীবন দিয়ে হলেও জালেম শাসককে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই জালেম শাসকের বশ্যতা স্বীকার করা চলবে না।

ইয়াজীদ ইবনে মুয়াবিয়া যে জালেম ছিল তার নমুনা সে কারবালার ঘটনার মাধ্যমে ও পরে প্রমাণ করেছে। ইয়াজীদ নিজের জবরদখল সম্প্রসারণ করার জন্য পবিত্র মক্কা ও মদিনার উপর সশস্ত্র হামলা করে। হিজরি ৬৩ সনের ২৭

www.pathagar.com

জিলহজ্ব ইয়াজীদের সেনাবাহিনী মদিনায় প্রবেশ করে। তারা মদিনায় অবাধ হত্যাকাণ্ড চালায়। এতে তিন শতাধিক কুরায়শ ও আনসারসহ সহস্রাধিক মুসলমান নিহত হন। এ যুদ্ধে ইয়াজীদ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল মুসলিম ইবনে উকবা। যুদ্ধের পর মক্কায় হামলা করার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে সে মারা যায়। এরপর হুসাইন ইবনে নুমায়র ইয়াজীদ বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে। ৬৪ হিজরি সনের ২৭ মহররম থেকে পবিত্র মক্কার উপর হামলা শুরু হয়। ইয়াজীদের বাহিনী কাবা ঘরের নিকটস্থ পাহাড়ে মিনজানিক (পাথর ছোঁড়ার কামান) বসিয়ে কাবা ঘরের উপর হামলা শুরু করে।

এই পাথর হামলা ৫ সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। ৬৪ হিজরির ৩ রবিউল আউয়াল তারিখে ইয়াজীদের বাহিনী কামানের সাহায্যে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে কাবাঘরের উপর। কাবার গিলাফ ভস্মীভূত হয়। কাবাঘর ছাদসহ ভেঙ্গে পড়ে। এ অবস্থা চলতে থাকার সময় ১০ রবিউল আউয়াল ইয়াজীদ মৃত্যুবরণ করে। এতে ইয়াজীদ বাহিনী ফিরে যায়।

বিগত ১৪০০ বছর যাবত ১০ মহররম আসে। আমরা উক্ত দিনে ভালো-মন্দ খাই। ছোটবড় মাহফিল করি। কিন্তু শাহাদাতে কারবালার শিক্ষার উপর আমল করি না। আমরা মুখে শোক প্রকাশ করি কিন্তু কারবালার শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করি না। এ জন্যই মুসলিম বিশ্বে এত অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হয়েও আমরা বর্তমানে ভিন্ন জাতির ফুটবলে পরিণত হয়েছি।

আল্লাহ আমাদেরকে শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা হৃদয়ে ও কর্মে ধারণ করার তৌফিক দিন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

ইসলামের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), মূল : মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী। অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী, মাওলানা আবদুল্লা বিন সাঈদ জালালাবাদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা।

ডিসেম্বর ২০১৪

www.pathagar.com

আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই—বিজয়ের শর্তাবলী

আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই শুরু হয়েছিল ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন থেকে। সেদিন পলাশীর আমবাগানে ব্রাহ্মণ্যবাদী চাণক্যের দল, ব্রিটিশ বেনিয়া ও আমাদের ক্ষমতালোভী সেনাপতি মীরজাফরের ত্রিমুখী ষড়যন্ত্রে আমরা আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অস্তিত্ব, মর্যাদা, বাদশাহী হারিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই অশিক্ষিত, ভূমিহীন, ভিখারী, সন্ত্রাসী ও বিদেশী হয়ে গেলাম। আমাদের পূর্বপুরুষরা সে সময় প্রতিবেশীদের প্রেমে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়েছিল যে, প্রতিবেশীরা আমাদেরকে নেশায় মাতিয়ে রেখে একসময় আমাদের বুকে চেপে বসে, কিছুদিন পর আমরা আবিষ্কার করলাম নিজেদেরকে তাদের পায়ের নিচে এরপর আমরা হয়ে গেলাম যবন (বিদেশী) নেড়ে (ন্যাড়া মাথা) ও মল (বিষ্ঠা)-এর চেয়েও তুচ্ছ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ। তখন থেকে এই ম্লেচ্ছদেরকে সরকারি চাকরি থেকে, সেনাবাহিনী থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব থেকে, জমিদারী থেকে বিতাড়িত করে আরবে অথবা পরপারে চালান করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এমন ঘনঘোর অমানিশার রাত্রিতে আলোর মশাল নিয়ে এগিয়ে এলেন সম্বিৎ ফিরে পাওয়া নবাব মীর কাশেম, ফকির মজনু শাহ ওরফে নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জং, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ ইছমাইল শহীদ, হাজী শরীয়তউল্লা, তিতুমীর, সাইয়্যেদ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী, নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব আলী চৌধুরী, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং তাদের সাথে যোগ দিলেন ভোরের পাখিসদৃশ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দীনসহ অসংখ্য বীরপুরুষগণ। ইতিমধ্যে আমাদের প্রতিবেশীরা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করায় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের প্রতিপক্ষের সহযোগী হওয়ায় আমরা আমাদের হারানো ভারত সাম্রাজ্য ফিরে পাইনি, আমাদেরকে বিশাল ভারতের দুই প্রান্তে নিজেদের জন্য ক্ষুদ্র আবাসভূমি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আমাদের ১৯৪৭-এর এই অর্জন ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অর্থাৎ আমরা

www.pathagar.com

আমাদের ধর্মের উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছিল ১৯৪৭ সালের খণ্ডিত বিজয়। আমরা আমাদের এই আংশিক বিজয়ে সন্তুষ্ট হলেও আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের '৪৭-এর অর্জনকে কখনো মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা ১৯৪৭ থেকেই আমাদের অর্জনকে গ্রাস করার লক্ষ্যে আমাদের মধ্য থেকে একদল লোক রিক্রুট করে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তিতে নিমজ্জিত রেখেছে।

মহাভারতের গল্পে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী মুনি-ঋষিরা ইঁদুর ছানাকে মানুষে এবং মানুষকে ইঁদুর ছানায় রূপান্তর করতে পারে। ১৯৪৭-এর পর আমরা দেখলাম—মুনি-ঋষিরা নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিকরাই এখন আমাদের কিছুসংখ্যক ইঁদুর স্বভাব (ইঁদুরের স্বভাব হলো সে যে গৃহস্থের ঘরে থাকে সে ঘরের সবকিছু কেটেকুটে ধ্বংস করে এবং উক্ত ঘরে এমন গর্ত করে যাতে বাইরের সাপ উক্ত গর্তের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করে ঘরের মালিককে হত্যা করে)-এর লোককে রিক্রুট করে নেতায় পরিণত করে এবং উক্ত ইঁদুর বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে কোণঠাসা করে। বিগত দিনে তারা আমাদের ৬২ বছরের অর্জনকে কেটেকুটে সাবাড় করেছে এবং ২০০৭ সালের দিকে দেখা গেল সম্মিলিত ইঁদুর বাহিনীর (যারা বর্তমানে এদেশের সকল সেক্টরে বিদ্যমান) কাটা খাল দিয়ে বিদেশী কুমির এদেশে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে আমরা বিদেশী কুমির ও তাদের এদেশীয় চেলা-চামুণ্ডাদের আক্রমণে আহত, ক্ষতবিক্ষত, আমাদের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব ১৭৫৮ সালের ন্যায় প্রশ্নের সম্মুখীন। এমতাবস্থায় আমাদেরকে হয় এগিয়ে যেতে হবে, নয়তো ধ্বংস হতে হবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

কোন সেই মন্ত্র? যা আমাদেরকে ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার চেতনায় ও স্বাধীনতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ও সফল করেছিল? আমাদের উক্ত সময়ের মন্ত্র বা চেতনা ছিল 'কোনো বিদেশী শাসক, কোনো স্বৈরশাসক, কোনো সামরিক শাসক আমাদেরকে শাসন-শোষণ করবে না। আমরাই হবো দেশের মালিক, আমাদের ভোটে নির্বাচিত শাসকরাই আমাদের ভালোমন্দ দেখভাল করবেন। কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন, ১৯৪৭ সালে আমরা দ্বিজাতিতত্ত্ব বা ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হলেও ১৯৭১ সালে আমাদের ঐক্যের ভিত্তি ধর্ম ছিল না। উক্ত প্রশ্নকারীকে আমি একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। উক্ত তথ্যটি হলো ১৯৭১ সালে ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ লাখ। তন্মধ্যে মুসলমান শরণার্থীর সংখ্যা ৫ লাখেরও কম ছিল; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তারাই প্রধানত অংশ নিয়েছিল আর বাকি ৮৫ লাখ শরণার্থীর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল কতজন, কয় পার্সেন্ট?

www.pathagar.com

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যদি বাঙালি-পাকিস্তানির যুদ্ধ হয় তবে উক্ত ৮৫ লাখ বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছিল কেন? তদুপরি স্বার্থগত কারণে মতপার্থক্যের জন্য মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ অতীতেও হয়েছিল, ভবিষ্যতেও হবে। এ জন্য দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা হয়ে যাবে না, ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়াও বন্ধ হবে না।

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী—সকল কালে প্রত্যেক জাতি-গোত্রের ঐক্যের মূলমন্ত্র ছিল ধর্ম। অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর দেশ ভারত ঐক্যবদ্ধ রয়েছে ধর্মের কারণে, ইউরোপের অসংখ্য ভাষাভাষী দেশ নিয়ে ইইউ গঠিত হয়েছে ধর্মীয় কারণে, মুসলমান হওয়ার অপরাধে তুরস্ককে এখনো ইইউ'র সদস্যপদ দেয়া হচ্ছে না।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ জন্যই চায় না মুসলমানরা ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হোক। এ লক্ষ্যেই তারা পৃথিবীর সকল দেশে একশ্রেণীর ধর্মবিরোধী মুসলমানকে ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাস পরিয়ে দুধ-কলা দিয়ে পোষে। তাদের এই সকল পোষা প্রাণীরাই বর্তমানে পৃথিবীর সকল মুসলমান দেশে অশান্তির কারণ। ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, আলজেরিয়া, মিসর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সবখানেই দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোই সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি বা বাহন। এদের কাটা খালের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম দেশসমূহ গ্রাস করছে।

১/১১-এর ষড়যন্ত্র বর্তমানে দেশবাসীর নিকট পরিষ্কার। কারা সাম্রাজ্যবাদের বাহন, কারা খাল কেটে কুমির আনে, কারা নিজ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-সম্পদ-মর্যাদা শুধুমাত্র সিংহাসনের লোভে বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে চায় তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। অথচ এই বোকা মানুষগুলো একবারও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। যদি তারা তাদের স্বগোত্রীয়দের ইতিহাসের দিকে তাকাতো তবে তারা এমন ভুল কখনো করতো না। মীরজাফর, নুরী আল মালিকী, হামিদ কারজাই সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় সিংহাসন পেয়েছে; কিন্তু ক্ষমতা পায়নি। তদুপরি এদের ক্ষমতালিপ্সাই গোটা জাতিকে আহত-নিহত-ক্ষতবিক্ষত-রক্তাক্ত করেছে। দেশের সকল সম্পদ ও সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়েছে।

১/১১-এর মাধ্যমে এদেশের শত্রুমিত্র চিহ্নিত হয়ে গেছে। দেশবাসী জানতে পেরেছে কারা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী আর কারা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে নিজের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে চায়। কারা নিজেদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সম্পদ, মর্যাদা রক্ষা করতে চায় আর

www.pathagar.com

কারা সাম্রাজ্যবাদের পদতলে আমাদের সকল অর্জন ও সুখ-শান্তি বলি দিতে চায়। ১/১১-এর পূর্বাপর ঘটনাবলীতে আমরা দেখতে পেয়েছি তথাকথিত মহাজোট ও সুশীল সমাজ সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশা বাস্তবায়নের সহযোগী শক্তি আর ৪ দলীয় জোট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, সম্মান ও সম্পদকে হেফাজত করতে চায়।

চারদলীয় জোট ও স্যালাইন তত্ত্ব

ইতিহাস-অন্বেষার জুলাই-২০০৫ সংখ্যার শিরোনাম ছিল 'জোট সরকার ও স্যালাইন তত্ত্ব'। তাতে বলা হয়েছিল ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদের আওয়ামী শাসনে দেশ ডায়রিয়া রোগীতে পরিণত হলে রাজনৈতিক ডাক্তারগণ আধাসের বিএনপিতে এক চিমটি জামায়াত ও এক মুষ্ঠি অন্যান্য ইসলামী দল নিয়ে যে রাজনৈতিক স্যালাইন তৈরি করে তাহাই চারদলীয় জোট। ...চারদলীয় জোট একটি সাময়িক ব্যবস্থা হলেও এর মধ্যে জাতীয় মানস অনুধাবনের শিক্ষা রয়েছে। জোটের শিক্ষা এই যে, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্য ব্যতীত জাতীয় সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব নয়। আবার নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গঠিত জোটটি ক্ষণস্থায়ী। ...অর্থাৎ ঘরে তৈরি স্যালাইন নয়—কারখানায় তৈরি ওরস্যালাইন-ই জাতীয় সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করবে।

উক্ত সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়েছিল ৪ দলীয় জোটের দুর্বলতার কারণ উক্ত দলসমূহের ভিতরেই লুকায়িত আছে। সেখানে বলা হয়েছে স্যালাইনের উপাদান পানিতে রয়েছে জীবাণু, লবণে রয়েছে কাঁকর আর গুড়ে বালি। এমতাবস্থায় সত্যিকারের শক্তিশালী, কার্যকর ও স্থিতিশীল ওরস্যালাইন প্রস্তুত করতে হলে পানিকে জীবাণু মুক্ত করতে হবে, লবণকে কাঁকর মুক্ত করতে হবে, গুড়কে বালি মুক্ত করতে হবে। ১/১১-এর মাধ্যমে আমাদের উক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ১/১১-এর সময় দেখা গেল বিএনপির জীবাণুগুলো সংস্কারপন্থী হয়েছে, জামায়াতের কাঁকরগুলো নির্জীব হয়ে পড়েছে আর ইসলামী ঐক্যজোটের বালিসমূহ ১/১১-এর পূর্বেই মহাজোটের সাথে হাত মিলিয়েছে। ৪ দলীয় জোটে যদি উক্ত দুর্বলতা না থাকতো তাহলে ১/১১-এর পরদিনই জনগণ রাস্তায় নেমে আসতো এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত একদিনেই নস্যাৎ হয়ে যেতো।

৪ দলীয় জোটকে শক্তিশালী করার উপায় : এই জোটকে শক্তিশালী করতে হলে জোটের ৩টি উপাদানে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি (বিএনপিতে সংস্কার)

১. **চালুনি দিয়ে বেছে নেয়া :** শুরু থেকেই এ দলে দলের আদর্শবিরোধী কিছু লোক ও কিছুসংখ্যক সাম্রাজ্যবাদের জীবাণু ঢুকে পড়েছিল। এমতাবস্থায় শক্তিশালী দল গঠনে এরূপ জীবাণু থেকে দলকে মুক্ত করতে হবে। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন; কিন্তু তিনি সময় পাননি। তিনি **'আমার রাজনীতির রূপরেখা'** বইতে লিখেছেন—"আমাদের অনেকের মধ্যে এখনো দ্বন্দ্ব আছে। এটা মানসিকভাবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আপনাদের মনের মধ্যে। কারণ আপনারা অনেকেই কিন্তু এমনি এসে গেছেন পার্টিতে বিভিন্ন কারণে। এখন এই দ্বন্দ্ব দিয়েই আমাদের সব ঠিক করতে হবে। হয় থাকবেন না হয় থাকবেন না। এখন আমাদের সময় এসেছে আমাদের আদর্শের চালুনি দিয়ে বেছে নিতে হবে আপনাদেরকে। (পৃষ্ঠা ৫৭, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : একে ফিরোজ নূন)।

২. **আদর্শিক নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী :** বর্তমানে যারা বিএনপির নেতাকর্মী রয়েছেন তাদের অনেকেই দলের দর্শন ভালোভাবে বুঝার এবং দর্শনকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করছেন। দলীয় দর্শন না জেনে অথবা উপেক্ষা করে উপস্থিত লাভ-ক্ষতিকে প্রাধান্য দিয়ে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। ফলে রাজনৈতিক কমিটমেন্টবিহীন এসকল নেতাকর্মী উপস্থিত লাভের বিনিময়ে নিজের, নিজের দলের ও ৪ দলীয় জোটের শরীকদের ক্ষতি করতে দ্বিধান্বিত হয় না। দলের দর্শনকে উপেক্ষা করার ফলেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিএনপি কখনো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী সংস্কৃতি চর্চা এবং বিকাশে ভূমিকা রাখেনি। বরং বিএনপি আমলে দেখা গেছে বিএনপি তাদেরকেই পৃষ্ঠপোষকতা করেছে যারা বিএনপির দর্শনের বিরোধী ছিল। এ বিষয়ে জিয়ার সতর্কবাণী ছিল—"একটা দল গড়ে উঠে একটি দর্শনকে ভিত্তি করে এবং সে আলোকেই গৃহীত হয় বিভিন্ন কর্মসূচি। সেই দর্শনকে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন দূরে থাক, সামান্য আঘাত আসলে তা সামলিয়ে উঠতে পারবো না। ...যদি দর্শনকে ঠিকভাবে বুঝে উঠতে না পারেন তবে আপনারা আগামীদিনে টিকতে পারবেন না। এতদিন যে টিকে গেছেন তা হুজুগের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এখন সময় এসেছে ব্যক্তিগত কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেককে দলে টিকে থাকতে হবে।" (সূত্র : ঐ, পৃষ্ঠা ২৬-২৭)।

৩. **ত্যাগী ও সংগ্রামী নেতাকর্মীদেরকে মূল্যায়ন :** জিয়ার গঠিত জাগদল এবং

www.pathagar.com

বিএনপির সাথে যারা ছিল তাদের অনেকেই এখন দল থেকে দূরে সরে গেছেন অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। তাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণ খুঁজে বের করে উপযুক্ত লোকদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদাপূর্ণ আসন প্রদান করতে হবে। তদুপরি ১৯৮১-৯০ সালে যারা শত প্রতিকূলতার মধ্যে দলের জন্য অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন অথচ বর্তমানে নিষ্ক্রিয় এমন লোকদের মধ্যে যারা এখনো সক্ষম তাদেরকে যথাযথ স্থানে পদায়ন করলে দল শক্তিশালী হবে।

৪. **ব্যবসায়ী নয়, শিক্ষক ও সমাজনেতাদেরকে দলে স্থান প্রদান :** বর্তমানে বিএনপির নেতৃত্ব প্রধানত ব্যবসায়ীদের নিকট চলে গেছে। ফলে বিএনপি আকারে বিশাল; কিন্তু শক্তিতে অষ্ট্রেলিয়ান গাভীর ন্যায়—যার শক্তি আছে কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করার মানসিক সামর্থ্য নেই। এ সকল ব্যবসায়ী নেতা ১/১১-এর পর নিজেদের ব্যবসা রক্ষার জন্য দিনে বিএনপি করলেও রাতে কিংস পার্টির সাথে যোগ দিতো। এমতাবস্থায় জিয়ার দর্শন বুঝে এবং দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এমন শিক্ষক ও সমাজনেতাদেরকে (মেম্বার, চেয়ারম্যান, সমাজপতি) দলের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব প্রদান করলে দল আন্দোলন-সংগ্রামে টিকে থাকবে।

বিএনপির শেষ সুযোগ : এদেশের সিংহভাগ জনগণ বিএনপির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে মূলত জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার জন্য। বিএনপি যদি সাম্রাজ্যবাদ মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়, দলকে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ মোকাবিলায় সক্ষম ও সংগঠিত করতে না পারে তবে জনগণ বিএনপির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং সাম্রাজ্যবাদ মোকাবেলায় সক্ষম অন্য দল খুঁজে নেবে অথবা সম্পূর্ণ নতুন দল গঠন করবে। বিএনপি এবং ৪ দলীয় জোটের প্রধান ব্যর্থতা হলো জনগণ তাদেরকে সংসদে চার-পঞ্চমাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী করার পরও এই জোট জনআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারেনি, দেশকে সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশা থেকে রক্ষা করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় বিএনপি ও ৪ দলীয় জোট যদি পুনরায় গতানুগতিক পন্থায় শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের জোটে পরিণত হয় এবং দেশরক্ষায় ব্যর্থ হয় তবে বর্তমান নেতৃবৃন্দ জনমানস থেকে আপনা-আপনি মাইনাস হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের জন্য আগামী ১০ বছর হবে সবচেয়ে কঠিন সময়। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ আগামীদিনগুলোতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে মুসলিম দেশসমূহ গ্রাস করতে। মুসলিম বিশ্ব ও বাংলাদেশ যদি শক্তভাবে উক্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে তবে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ইতিহাসের এই ক্রান্তি

www.pathagar.com

লগ্নে জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রয়োজন হবে দুরদর্শী, সাহসী ও সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের। এ চাহিদা পূরণে সক্ষম না হলে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

ইসলামী দলসমূহে সংস্কার কার্যক্রম

১. জামায়াতে ইসলামী : এই দলটি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় এদেশে ইসলাম কায়েম করতে চায়। তত্ত্বগতভাবে এই দলটি একটি ইসলামী দল হলেও এর রয়েছে কয়েকটি বড় ধরনের দুর্বলতা। এ সকল দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে এর সমাধান করা না হলে বা করা না গেলে এ দল কখনো বড় ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। এতদসত্ত্বেও জামায়াতের যে সফলতা দেখা যাচ্ছে তা মূলত এর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের সফলতা। ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয়ভাবে জামায়াত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলেও স্থানীয়ভাবে এই ছাত্র সংগঠনটি মুক্তভাবে কাজ করে। ফলে এরা সবসময় নতুন নতুন প্রতিভাবান ছাত্রদেরকে দলে অন্তর্ভুক্ত করে ও মানস গঠন করে। আমার ধারণা ছাত্রশিবিরের কার্যক্রমের ফলে বর্তমান বাংলাদেশের সকল সেক্টরে ইসলামের পক্ষে কথা বলার লোক পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে জামায়াত স্বীয় কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে শিবিরের অর্জিত ফসল ঘরে তুলতে পারে না। এই ব্যর্থতাই জামায়াতকে অদ্যাবধি একটি দুর্বল দলে পরিণত করে রেখেছে। এই দুর্বলতার প্রধান প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ :

- **ক্যাডার সিস্টেম :** জামায়াতে প্রথমত সমর্থক হতে হয়, তৎপর কর্মী, তৎপর রুকন। একবার রুকন হলে তার রুকনিয়ত সাধারণত বহাল রাখা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ১৯৭৮-৭৯ সালে একব্যক্তি থানা নাজিম ছিল বর্তমানে তিনিই থানা আমির আর তার পেশা একজন সাধারণ স্কুলশিক্ষক অথবা কাপড়ের দোকানদার। উক্ত স্কুলশিক্ষক ও কাপড়ের দোকানদারের যে সামাজিক অবস্থান ও যোগ্যতা সে যোগ্যতা দিয়ে তিনি তারচেয়ে অধঃস্থন কোনো ব্যক্তিকেই শুধু দলে ভেড়াতে সক্ষম, তদুপরি তার ভয় থাকে যদি তারচেয়ে অধিকতর কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে রুকন করা হয় তবে তার আমিরত্ব চলে যাবে। এই কারণে কোনো সিনিয়র লোককে, উপযুক্ত লোককে তিনি রুকন করেন না। ফলে থানা বা ইউনিয়ন কমিটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গঠিত হয় অনুপযুক্ত লোক দিয়ে। এমতাবস্থায় ছাত্রশিবিরের বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দ ছাত্রজীবন শেষে দলের সাথে সম্পৃক্ত হন না।

www.pathagar.com

- **সাংগঠনিক নেতা/জননেতা :** উপরোক্ত কারণে জামায়াতে সাংগঠনিক নেতার অভাব নেই, কিন্তু জননেতা পাওয়া যায় না। জননেতা হওয়ার জন্য যে সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকা আবশ্যক সেগুলো বেশিরভাগ সময়ে পাওয়া যায় না সাংগঠনিক নেতাদের মধ্যে। আর জননেতা ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা যায় না তা বলাই বাহুল্য।

২. **ইসলামী ঐক্যজোট :** জামায়াতে ইসলামীসহ বাংলাদেশের সকল ইসলামী দলের কিছু কমন দুর্বলতা রয়েছে। যার কারণে তাদের পক্ষে ততোদিন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছা সম্ভব হবে না, যতোদিন এসব দুর্বলতা দূরীকরণে আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করা না হবে। দুর্বলতাগুলো হলো :

- **সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন :** আল্লাহ ইসলাম প্রচারের জন্য ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল নবী-রাসূল (সা.) যে জনপদে পাঠিয়েছেন তাদের সবাইকে উক্ত সমাজে বা দেশে সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করার পর ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছিলেন। কারণ সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী ব্যক্তির আহ্বান সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়। কিন্তু বর্তমানে যারা ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তাদের অধিকাংশ সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ব্যতীত দ্বীনি কাজ করার চেষ্টা করছেন। ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হচ্ছেন। **মনে রাখতে হবে রাসূলদেরকে (সা.) উক্ত যোগ্যতা আল্লাহ স্বয়ং প্রদান করেছিলেন আর বর্তমানে যারা উক্ত দায়িত্ব পালন করতে চান তাদেরকে নিজের চেষ্টায় সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান ইসলামী দলসমূহ যদি নিজেদের নেতাকর্মীদেরকে সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ব্যবস্থা করতে না পারেন অথবা সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিদেরকে নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করে যথাযোগ্য স্থানে সম্পৃক্ত করতে না পারেন তবে তারা ব্যর্থ হবেন।**

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোধগম্য হবে। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ প্রেরিত রাসূল ছিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও আল্লাহ প্রেরিত রাসূল ছিলেন। কিন্তু উভয়ের সাফল্য এক নয়। হযরত ঈসা (আ.) সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে নিজের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি বিধায় তিনি কোনো ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি; তদুপরি তিনি নিজ সঙ্গী সাথীদের ষড়যন্ত্রে বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সময়কার সবচেয়ে

www.pathagar.com

সম্মানিত, বিশ্বস্থ, সৎ, যোগ্য, সাহসী সমাজনেতা, ব্যবসায়ী নেতা, সমর নেতা, কবি ও বুদ্ধিজীবীদেরকে নিজ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আর একটি অতীব শিক্ষণীয় কাজ করেছিলেন, যা হয়তো অনেক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়নি। সেটা হলো, তিনি নিজের চারপাশে অত্যন্ত মজবুত চারটি দেয়াল স্থাপন করেছিলেন আত্মীয়তার সূত্রে। তিনি তাঁর চার খলিফার সাথেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিরক্ষাকে অত্যন্ত মজবুত করেছিলেন। এই মজবুত প্রতিরক্ষার কারণেই সব রকম অন্তর্ঘাত ও বিশ্বাসঘাতকতার ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

- **ব্যক্তি ও সমাজজীবনে রাসূল (সা.)কে পুরোপুরি অনুসরণ না করা :** যারা ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া হতে চান তাদেরকে অবশ্যই রাসূল (সা.)কে পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। যেমন রাসূল (সা.) নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়াতেন, তিনি সমাজের বিভিন্ন বিবাদ মীমাংসায় ভূমিকা রাখতেন, অপরের পাওনা হক আদায়ে কাজ করতেন, বিপদে-আপদে জনগণের পাশে দাঁড়াতেন, সর্বাগ্রে সালাম দিতেন, বিধবার বাজার করে দিতেন, দুর্বলের মাথার বোঝা নিজে বহন করতেন। বর্তমানে যারা রাসূল (সা.)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা কিন্তু রাসূল (সা.)-এর উপরোক্ত আদর্শসমূহ মেনে চলেন না। যদি না মানেন তবে জনগণ কেন আপনাদেরকে ভোট দিয়ে নিজেদের নেতা নির্বাচন করবেন? এ জন্যই আপনারা সাংগঠনিক নেতা কিন্তু জননেতা নন। জনগণের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে আপনাদেরকে পাওয়া যায় না বিধায় জনগণ ইসলাম প্রচারক হিসেবে ভক্তিভরে ঘরের মুরগিটা, গাছের প্রথম ফলটা আপনাদেরকে উৎসর্গ করে কিন্তু ভোটটি প্রদান করে জননেতাকে।

উপরোক্ত দুর্বলতাসমূহ সত্ত্বেও ১/১১-এর পর এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে সতর্ক, সজাগ ভূমিকা রেখেছে এ দেশের ইসলামপন্থী দলসমূহ। আরো কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও ইসলামপন্থীরাই বুকের তাজা রক্ত দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে রুখে দাঁড়াবে। তবে সেরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে হয়তো বর্তমান নেতৃত্ব থাকবে না, ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠবে ইসমাইল হানিয়ার মতো কোনো নেতা, হামাসের মতো কোনো দল—আর ফাতাহর মতো দলগুলো সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অবস্থান নেবে।

দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি : আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হলে উপরোক্ত স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচিসমূহ হলো সাময়িক। পৃথিবীর বুকে একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং আমাদের অর্জন ও বিজয়কে আরো অর্থবহ করতে হলে আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে হবে। দুঃখের বিষয় পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যাবধি আমাদের নেতৃবৃন্দ জাতীয় মানস গঠনে কোনো দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল গ্রহণ করেনি বা করতে দেয়া হয়নি। এ জন্য আমাদের জাতীয় জীবনে বারবার পলাশী আসে; কিন্তু বখতিয়ার/ মুহাম্মদ বিন কাসিম বা খানুয়ার যুদ্ধ আসে না। উক্ত দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হলো নিম্নরূপ :

ক. শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস একমুখী ও যুগোপযোগী করা : পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র জাতি যাদের মধ্যে বর্ণগত, ভাষাগত, গোত্রগত, ফেরকাগত কোনো ভেদাভেদ নেই। এতদসত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনৈক্য কেন? এই কেন-এর উত্তর হলো—আমাদের বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস যা বর্তমানে তথাকথিত কিন্ডারগার্টেনের কারণে আরো বহুধাবিভক্ত হয়েছে। ধরুন আপনার ৫টি ছেলে রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি ছেলেকে ভর্তি করলেন প্রগতিশীল (ধর্মবর্জিত ও বিদেশী সিলেবাস অনুসারী) সিলেবাসের কিন্ডারগার্টেনে, দ্বিতীয়টি ভর্তি করালেন মৌলবাদীদের পরিচালিত কিন্ডারগার্টেনে, তৃতীয়টি সরকারি স্কুলে, চতুর্থটি সরকারি মাদ্রাসায়, পঞ্চমটি কওমী মাদ্রাসায়। ২০ বছর পর শিক্ষা সমাপনান্তে আপনি দেখবেন আপনার ঘরের ৫ জন ৫ দলের সাথে যুক্ত হয়েছে অথবা আপনার ছেলেদের কেউ মহাজোটের কর্মী আবার কেউ ৪ দলীয় জোটের কর্মী। সুতরাং আমরাই বিভিন্নমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখে আমাদের জাতিকে বিভক্ত করেছি। বিদেশীরা এই বিভক্তির সুযোগ নিয়ে আমাদের একটি অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে আমাদের সর্বনাশ সাধন করছে। **অথচ আপনি ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস দেখুন। সেখানে দেখবেন তাদের শিক্ষাব্যবস্থা মৌলিকভাবে একমুখী। কাঙ্ক্ষিত দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলার জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন তারা সেরূপ শিক্ষানীতি ও সিলেবাস চালু রেখেছে। ফলে উক্ত দেশসমূহে ধর্মদ্রোহী, দেশদ্রোহী ও বিদেশী দালাল খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে জাহির করলেও তাদের প্রত্যেক কাজ-কর্মে গড ও হলিক্রস বিদ্যমান থাকে। তাদের মেয়র, গভর্নর ও প্রেসিডেন্ট বাইবেল শপথ করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান মিশনারি তৎপরতায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেন। কারণ তারা জানে যে, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ধর্মের চেয়ে অধিক কার্যকর অপর কোনো সূত্র নেই।**

এমতাবস্থায় আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ জাতি চাই তবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস হতে হবে একমুখী এবং নিজ ধর্মের অনুসারী। নীতি-নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের ব্যাপারে আমাদের ধর্মেই রয়েছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আদর্শ।

www.pathagar.com

খ. নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি রচনা ও চর্চা করা : একটু খেয়াল করলে দেখবেন, আপনি বিদেশী ভাষায় যতোই দক্ষতা অর্জন করুন না কেন আপনার ভাব, কল্পনা, কামনা-বাসনা, রাগ-অনুরাগ আপনার মনে উদয় হবে আপনার মাতৃভাষায়, আপনি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করলেও আপনি কল্পনা করেন মাতৃভাষায়, স্বপ্ন দেখেন মাতৃভাষায়, আপনি কাউকে I Love You বলার আগে আপনি মনে মনে বলেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এটিই প্রাকৃতিক নিয়ম, এ নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, অপরিবর্তনীয়। ঠিক তদ্রূপ সাহিত্যের বেলায়ও একই কথা। আপনি হিটলার, মুসোলিনি, স্টালিনকে নায়ক বানিয়ে সাহিত্য রচনা করতে পারবেন; কিন্তু আপনার জাতির অন্তরে তা প্রবেশ করবে না। অথচ আপনি যদি আলী, হামজা, খালেদ, তারিক, মুসা, বখতিয়ার, সিরাজকে নায়ক বানিয়ে—হাজেরা, রাবিয়া, চাঁদসুলতানা, জুলেখা, লাইলী, শিরীকে নায়িকা বানিয়ে সাহিত্য রচনা করেন তবে দেখবেন উক্ত সাহিত্য আপনার জাতির মর্মে প্রবেশ করে জাতিকে উদ্দীপ্ত করছে। **মক্কা, মদিনা, কায়রো, কর্ডোভা, বাগদাদ, দিল্লি, আজমীর মুসলমানের মনে যে ভাব-কল্পনা, আবেগ-অনুভূতির সৃষ্টি করে হিন্দুর মনে তা করতে পারে না। আবার রাম-লক্ষণ-সীতা, দুর্গা, কালী, অযোধ্যা, মথুরা বৃন্দাবন হিন্দুর মনে যে ভাব-কল্পনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে মুসলমানদের মনে তা করতে পারে না। এটাই সাহিত্যের স্পিরিটের মূল কথা।** এ স্পিরিটের বিপরীতে আপনি সাহিত্য রচনা করতে পারেন—তবে তা আপনার জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে না। প্রত্যেক সংস্কৃতির মর্মমূলে রয়েছে সংশ্লিষ্ট জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও তৎসংশ্লিষ্ট জীবনাচরণ। ধর্মবিশ্বাসের বীজ থেকেই উৎপন্ন হয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। এর অন্যথা হলে উক্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি জাতীয় রূপলাভ করতে সক্ষম হয় না।

গ. কাঙ্ক্ষিত মানস গঠনোপযোগী নাটক ও সিনেমা : আপনি হলিউড ও বলিউডের সিনেমা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিন। তবে জানতে পারবেন 'সিআইএ' ও 'র'-এর দিকনির্দেশনা ও ছাড়পত্র ব্যতীত উক্ত দেশে নির্মিত সিনেমা আলোর মুখ দেখে না। উক্ত দুই সরকারের নীতিনির্ধারকরা এই শক্তিশালী গণমাধ্যমের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত জাতীয় মানস গঠন করতে চান। অথচ আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকগণ এ বিষয়ে বেখবর। অন্যরা যেখানে তাদের সিনেমার মাধ্যমে জাতির শত্রুমিত্র চিহ্নিত করেন ও জাতিকে সজাগ করেন আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা এ বিষয়ে চিন্তা করেন বলে মনে হয় না। ভারত যেখানে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, '৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ ও কারগিল যুদ্ধের উপর অসংখ্য সিনেমা নির্মাণ ও প্রদর্শন করেছে এবং জাতিকে সম্ভাব্য শত্রু সম্পর্কে সজাগ করেছে, আমরা কি তা করেছি? অথচ ভারতবর্ষে ও বিশ্বে

www.pathagar.com

মুসলমানরা অসংখ্য যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, বাংলাদেশ আমলে পদুয়া, রৌমারী, বড়াইবাড়ী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। অথচ এতদসংক্রান্ত কোনো নাটক-সিনেমা এদেশে নির্মিত ও প্রদর্শিত হয়নি। ফলে জাতি তার আজন্ম শত্রুকে চিনতে ভুল করছে।

স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও আমরা বিজাতীয়দের অনুকরণ করছি, ইঙ্গ-হিন্দু রচিত ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা করছি। এ জন্যই জাতীয় মানস গঠন কাঙ্ক্ষিত রূপলাভ করতে সক্ষম হচ্ছে না এবং আমাদের জীবনে বারবার পলাশী আসছে। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখতে হলে প্রথমত আমাদের জাতীয় মানস গঠন করতে হবে, তৎপর জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে এবং তৎপর সামরিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে। আমার মতে, সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার পূর্বে মানসিক ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন অপরিহার্য। কেননা দুর্বল মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিকে যতো শক্তিশালী অস্ত্রই প্রদান করা হোক না কেন সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবে অথবা উক্ত অস্ত্র নিজের সর্বনাশের কারণ হবে। **সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বিজয়ের শর্তাবলী হলো—একমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, সত্যিকারের ইতিহাস চর্চা ও শিক্ষাগ্রহণ, জাতীয় ঐতিহ্যসমৃদ্ধ সাহিত্য, সংস্কৃতি রচনা ও চর্চা করা এবং কাঙ্ক্ষিত জাতীয় মানস গঠন। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হলে ৪ দল একদল হয়ে শক্তিশালী জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠবে। ঘরে তৈরি স্যালাইনের পরিবর্তে কারখানায় তৈরি ওরস্যালাইন জাতিকে নিরাময় করবে।**

নভেম্বর ২০০৮

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

সম্রাট আকবরের তথাকথিত 'দ্বীনে ইলাহী'

রুহুল আমিন খান

আকবরী ফিত্না

আকবরের জন্ম ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি রাজত্ব করেন ১৫৫৬ খ্রিঃ থেকে ১৬০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত। আহমদ সারহিন্দীর জন্মের সময় (১৫৬৩-১৬২৪ খ্রিঃ) আকবরের রাজত্বের পূর্ণ যৌবন। আর তিনি যখন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন, তখন ছিল আকবরশাহীর চূড়ান্ত উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শান-শওকতের কাল। আর এই সময়েই আকবরী ফিত্নার ভয়াবহতাও চরম আকার ধারণ করে।

ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানব জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই—যার সমাধান ইসলাম দেয়নি। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক—প্রত্যেক দিকের প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। মানব জীবনের কোন দিককে বাদ দিলে কোন মতবাদই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না ইসলাম ছাড়া অনুরূপ কোন মতবাদই দুনিয়াতেই না জন্ম নিয়েছে, না আছে। **ইসলামে রাজনীতি ও ধর্ম অভিন্ন। এর একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করলে ইসলাম আর সত্যিকার ইসলাম থাকবে না। করলে তা হবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মের ন্যায় একটি আনুষ্ঠানিক ধর্ম। আর মুসলমানদের রাজনীতি পরিণত হবে মেকিয়াভেলীর ধোঁকাবাজির রাজনীতিতে। তাদের সমরনীতি রূপ নেবে চেঙ্গিস খাঁর হলাহল রণনীতিতে। তাদের অর্থনীতি হবে শোষণের হাতিয়ার কিংবা পেষণের স্টীমরোলার। ইসলাম আর বিশ্বনবীর সেই ইসলাম থাকবে না।**

পানি ও চিনি দিয়ে তৈরি হয় শরবত। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শরবতের উপাদান পানি ও চিনিকে পৃথক করা হলে তা আর শরবত থাকবে না। এক অংশের নাম হবে শুধু পানি, অপর অংশে থাকবে শুধু চিনি। এজন্যেই মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) বলেছেন, রাজনীতিকে ধর্ম হইতে পৃথকরূপে ভাবিলে চলিবে না, রাজনীতিকে ধর্মের অঙ্গীভূত স্বীকার করিতে হইবে।"

www.pathagar.com

ইসলামী রাজনীতির মূল কথাই হলো—আল্লাহর যমিনে তাঁরই প্রভূত্ব কায়েম থাকবে। সারে জাহানের একমাত্র মালিক তিনি, তাতে হুকুমও চলবে তাঁরই। রাজ্য যার রাজত্বও চলবে তাঁর। আর মানুষ মাথানত করবে শুধু আল্লাহর সামনে। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সামনে নয়। মানুষ তার ব্যক্তিত্ব, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে, মেনে চলবে একমাত্র তাঁরই আদেশ নিষেধ। আল্লাহকে কেবল মসজিদ-মন্দিরে আর গীর্জায়ই মানবে না, বরং সমগ্র জীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে তাঁরই বিধান মতে। এই ছিল সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত, জগতের সকল ফিরাউন, সাদ্দাদ, নমরুদদের সাথে এই দাওয়াত ও তার নিশানবাহীদের সংঘাতের মূল কারণ এখানেই। যিনি যখনই এই দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, যুগের ফিরাউনরা তখনই তাঁকে অপরাধী ও বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছে। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের উপর চালিয়েছে চরম নির্যাতন। কারণ, এরা কায়েমী স্বার্থবাদী। স্বার্থে আঘাত লাগে বলেই এই দাওয়াতকে তারা সহ্য করতে পারে না। এই সংঘর্ষ ও সংঘাত যেমন আল্লাহর নবীদের সাথে হয়েছে তেমনি নবীর পথ ধরে যাঁরাই এ কাজে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সাথেও হয়েছে। সত্য ও মিথ্যা; ন্যায় ও অন্যায় এবং হক ও বাতিলের এই সংঘাত চিরন্তন। এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি ট্রেনে করে নির্দিষ্ট কোথাও গেলে, যাওয়ার পথে তার সামনে যে যে স্টেশন পড়েছে, অপর কেউ যদি একই পথে সেই স্থানে পৌঁছুতে চায়, এর সামনেও সে সে স্টেশন অবশ্যই আসবে। এর ব্যতিক্রম হলেই বুঝতে হবে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমজনের পথে যাচ্ছে না। অন্য পথেই চলছে। বিশ্বনবী আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছেছেন যে পথে এবং এ ব্যাপারে যে যে স্টেশন পড়েছে তাঁর সামনে—অর্থাৎ সেই তায়েফ, বদর-ওহুদের ময়দান—বিশ্বনবীর ইসলাম নিয়ে যাঁরাই সে পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের সামনে পড়বে সেই ধরনের সংঘাতময় স্টেশনগুলো। এ যুগেও তা পড়বে ভবিষ্যতেও পড়তে থাকবে।

তবে কেউ যদি পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন না মানে এবং ইসলামের বিশেষ কোন অংশকে নিয়ে কাজ শুরু করে তবে তার সাথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে আঘাত না লাগার কারণে সংঘাত নাও হতে পারে। আমাদের কথা চলছে পুরো ইসলামকে নিয়ে যেসব মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদ সংস্কারমূলক কাজ করেছেন—তাঁদের সম্বন্ধে। তাঁদের সাথে এই সংঘাত অনিবার্য। সুতরাং মুজাদ্দিদে আলফেসানীর সঙ্গে স্বভাবতই এই সংঘাত হয়েছে। এই সংঘাত সম্পর্কে বর্ণনা দানের পূর্বে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা দরকার।

www.pathagar.com

সম্রাট আকবরের রাজনীতি

সম্রাট হুমায়ুন যখন শেরশাহ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সিন্ধুর মরুভূমিতে অমরকোট নামক স্থানে ১৫৪২ খ্রিঃ সম্রাট আকবর জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর ৪ মাস। তাঁর অভিভাবক হিসেবে বৈরাম খাঁ সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এরপর আকবর স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর রাজনীতি তিনটি বিরাট শক্তির সম্মুখীন হয়েছিল।

ক. পাঠান—এদের কাছে পরাজিত হয়ে সম্রাট আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ুন ভারত থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাদের মোকাবিলায় আকবরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হতো।

খ. শিয়া সম্প্রদায়—এদের কেন্দ্র ছিল ইরান। এদেরই সহযোগিতায় হুমায়ুন দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। সুতরাং দিল্লীর ওপর তাদের একটা দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গ. হিন্দুশক্তি—এ সময় মোগল সাম্রাজ্যে শতকরা ৯৫ জন ছিল হিন্দু অধিবাসী। দিল্লীর পূর্ববর্তী বাদশাহদের প্রবল প্রতাপ ও শক্তির দাপটে হিন্দুরা ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্য সংগ্রামের সাহসই তারা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে তারা চাণক্য বুদ্ধির দ্বারা কাজ করছিল।

আকবর এই ত্রিশক্তির চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং এ জন্যে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি ভাবলেন, এই অবস্থায় নিজের ধর্মের উপর অটল থাকার অর্থ হবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করা। প্রধান শত্রু পাঠানরা তো সুযোগের অপেক্ষায়ই আছে। হিন্দু এবং তাদের দমন করা অপরিহার্য। আকবর অনুভব করলেন, এই পরিস্থিতিতে হিন্দু ও শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা ও তাদের মনস্তুষ্টি বিধানই একমাত্র পন্থা ও বুদ্ধির কাজ। তাই তিনি রাজনীতিকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দিলেন এবং ইসলাম বিরোধিতায় ও ভিন্ন ধর্মীদের মন যোগাতেই মশগুল হলেন।

আকবর তাঁর এই ভাবধারা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের পালা শুরু করেন। তিনি দরবারে প্রত্যেক ধর্মের পণ্ডিত পুরোহিতদের সভা ডাকতেন। তাদের বিতর্ক শুনতেন। এটা ছিল তাঁর রাজনীতি। উদ্দেশ্য, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই যেন তাঁকে আপনভাবে। যদি ধর্ম সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকতো, তবে এই সুযোগে তিনি তাদের সামনে ইসলামী হুকুমতের নকশা পেশ করে দিতেন। তা না হলে অন্তত অধর্মচারী হতেন না। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। স্বীয় দস্তখতটা পর্যন্ত

www.pathagar.com

করতে জানতেন না। তাই সংশোধন, পরিমার্জন ও শান্তির পথ ছেড়ে তিনি ফ্যাসাদ ও অশান্তির পথই বেছে নিলেন এবং একটি নতুন ধর্মের প্রচার শুরু করে দিলেন। আর খোদাদ্রোহিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মেরই নাম রাখলেন 'দ্বীনে ইলাহী।'

দ্বীনে ইলাহীর বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে আমরা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'মুন্তাখাবুত্ তাওয়ারীখ'কেই প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করবো, সেখান থেকেই এ সম্পর্কে উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। কেননা, মোল্লা বদায়ুনী আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি আকবরের নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। সবকিছু স্বচক্ষে দেখেছেন, সবকিছু সত্য সত্য লিখেছেন বলে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কসমও করেছেন।

দ্বীনে ইলাহীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোল্লা বদায়ুনী লিখছেন, আকবর দৈনিক চারবার অর্থাৎ প্রত্যুষে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাতে সূর্যের উপাসানা করতেন এবং সূর্যের এক হাজার একটি হিন্দী নাম জঁপতেন। দৈনিক অনুরূপ চারবার সূর্যের উপাসানা করা তিনি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলেন। ঠিক দ্বিপ্রহরে সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ওসব নাম জঁপ করতেন। আপন কর্ণদ্বয় ধরে একটি চক্কর খেতেন এবং কানের লতিতে কিল মারতেন। কর্ণচ্ছেদ করে তাতে বালি লাগাতেন। এ ধরনের অন্যান্য ক্রিয়াকর্মও করতেন। প্রতিদিন মধ্যরাতে ও সূর্যোদয়ের সময় নহবত এবং নাকাড়াও বাজাতেন।

আকবর সূর্যের নামের বন্দনাকালে সূর্যকে লক্ষ্য করে বলতেন—'জাল্লাত কুদরাতুহু' অর্থাৎ তার শক্তি মহিমাময়, (নাউজুবিল্লাহ)

অনুরূপভাবেই আকবর অগ্নি, পানি, বৃক্ষ, উপকারী জীব, এমনকি গরু ও গরুর মলের পর্যন্ত পূজা করতেন এবং গায়ে চন্দন, কপালে তিলক ও গলায় পৈতা লাগিয়ে দেহ সাজাতেন। সূর্যোদয়ের সময় যোগ আসনে বসে মন্ত্র পাঠ করতেন। এই মন্ত্র তাঁকে হিন্দুরা শিখিয়েছিল। (ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা-২৬১)।

তিনি শুধু সূর্যের উপাসনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং প্রতিপালক প্রভুর মর্যাদাও তাকে দিয়েছিলেন। আকবরের মতে—

সূর্য সমগ্র বিশ্ব-উজ্জীবনকারী। সারা বিশ্বকে সে সব কিছু দান করে থাকে। বাদশাগণের অভিভাবক। বাদশাগণ তার ছায়া ও বিকাশ মাত্র। (ঐ, পৃষ্ঠা-২৬১)

বাদশা আকাশের নক্ষত্ররাজির উপাসনাও করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর থেকে চরম বাড়াবাড়ি প্রকাশ পায়। এমনকি—

বাদশা সাতটি নক্ষত্রের রঙ-এর অনুরূপ পোশাক রাখতেন। যেহেতু (তাঁর মতে) প্রতিটি দিবস কোনো একটি নক্ষত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল—

www.pathagar.com

এ জন্য যেদিনটি যে নক্ষত্রের সাথে সম্পর্কিত, সেদিন তিনি ওই নক্ষত্রের রঙ-এর অনুরূপ পোষাক পরিধান করতেন।

শূকর সম্বন্ধে হিন্দু পণ্ডিতরা বাদশাকে বুঝিয়েছেন যে আল্লাহ্ শূকরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। (নাউজুবিল্লাহ) সুতরাং শূকর একটি সম্মানীয় প্রাণী। অজ্ঞ আকবর তাদের একথা বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাকে একটি সম্মানীয় জীবের মর্যাদাও দিয়েছিলেন।

হিন্দুধর্মের বিশ্বাসের অঙ্গ জন্মান্তরবাদেও আকবর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং একে তাঁর নবপ্রবর্তিত ধর্মের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। হিন্দুদের মতে, প্রত্যেক মানুষ মৃত্যুর পর নিজের পাপ-পুণ্য ক্রিয়া-কর্ম অনুযায়ী পুনরায় শূকর, কুকুর, বিড়াল, সাপ, বিচ্ছু, উচ্চবর্ণের মানুষ, নিম্নবর্ণের মানুষ ইত্যাদি রূপে পুনঃ জন্ম নিবে। এভাবেই জন্মের ধারা চলতে চলতে একদিন চরম নির্বাণ লাভ হবে। এটাই হলো 'জন্মান্তরবাদ। (ঐ পৃষ্ঠা-২৫৮)।

বাঙলার সুবাদার (গভর্নর) আজম খাঁ বাদশার দরবারে হাজির হলে বাদশাহ তাঁকে বলেন—

আমরা জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বলিষ্ঠ যুক্তি পেয়ে গেছি। শেখ আবুল ফজল তা তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। (ঐ পৃষ্ঠা-৩০০)।

জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বাদশার সন্তোষ ও বিশ্বাস বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণরা এ সম্পর্কে তাঁকে যা বুঝাতেন, তিনি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তা-ই বিশ্বাস করতেন। তাদের পরামর্শক্রমে বাদশাহ্ মাথার শুধু মধ্যখানের চুল কামিয়ে ফেলতেন আর চারপাশের চুল রেখে দিতেন। বিশ্বাস এই ছিল যে, বাদশা আত্মসম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা (নির্বাণ) লাভ করেছে, আর—

সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আত্মা (রুহ) (মৃত্যুকালে) মাথার তালু দিয়েই বের হয়ে থাকে। এটা দেহের সুড়ঙ্গসমূহের মধ্যে দশম সুড়ঙ্গ। পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আত্মা যে সময় তালু দিয়ে বের হয়, সে সময় বজ্রের ন্যায় একটি বিকট শব্দ হয়। এই শব্দ মৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য এবং পাপস্খলন মুক্তিরই চিহ্ন। আর জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী একথারই প্রমাণ যে, ওই আত্মা কোন একজন ঐশ্বর্যশালী, ক্ষমতাবান এবং একচ্ছত্র নরপতির দেহে গিয়ে জন্ম নিবে।

হিন্দুদের মৃতদেহকে দাহ করা হয়ে থাকে। শবদাহের সময় স্বাভাবিকভাবেই মৃত ব্যক্তির মাথার তালু ফেটে একটি আওয়াজ বের হয়। সম্ভবত ব্রাহ্মণেরা এই শব্দকেই মুক্তির একটি যুক্তি ঠাওরিয়েছেন এবং বাদশাহকে তা বুঝিয়েছেন। আর বাদশাহও তা বিশ্বাস করেছেন। এতে আকবরের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি এই শান শওকতের সাথেই অপর একটি সিংহাসনে আসীন হয়ে যাবেন। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ

www.pathagar.com

তাঁকে এতটুকু পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়েছেন যে, যেহেতু আকবরের আমল থেকেই চান্দ্র বছরের স্থলে সৌরবছর গণনার রীতি চালু হয়েছে, সেহেতু এখন থেকে বাদশাহর আয়ুষ্কাল আর হ্রাস পাবে না। কেননা চাঁদের পরিক্রমণের ফলেই আয়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সুতরাং গণনার ওই রীতি যখন বাদ পড়েছে—তখন আয়ু হ্রাসের আশংকাও উঠে গেছে।

বস্তুতঃ এভাবে প্রথমে তো মৃত্যুকেই সুদূরকাল পর্যন্ত মুলতবী করে দেয়া হয় পরে তাঁর এই বিশ্বাসও জন্মিয়ে দেয়া হয় যে, ভবিষ্যতেও তাঁর আত্মা তাঁরই অনুরূপ অপর একজন বাদশাহর দেহে অনুপ্রবিষ্ট হবে। অর্থাৎ পুনরায় তিনি বাদশা হয়েই জন্মগ্রহণ করবেন। এতে বাদশাহর হতাশা লোপ পায় এবং মৃত্যুভয় চলে যায়।

মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী লিখছেন যে, এক সময় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত' অনুবাদকালে একটি কাহিনী উল্লেখ করতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর লেখনীতে কবিতার একটি চরণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। চরণটির ভাবার্থ হলো—'প্রত্যেক কাজের জন্যই পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারিত আছে।' এটি শুনে সম্রাট ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। কারণ, বদায়ুনীর এই চরণে—

"কবরে মুনকির-নকিরের সওয়াল জওয়াব, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, মিজান-পুলসিরাত ইত্যাদির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে বাদশা ধারণা করে বসেন এবং একে তাঁর জন্মান্তরবাদ সম্পর্কিত বিশ্বাসের বিরোধী বলে নির্দেশ করেন। জন্মান্তরবাদ ছাড়া অন্য কিছুতেই তাঁর আস্থা ছিল না।" (মুন্তাখাব, পৃ.-৪০০)।

এতে মোল্লা বদায়ুনী পড়লেন ভীষণ বিপদে। তাঁর বাঁচার আর কোন উপায় নেই দেখে পরিশেষে চাতুর্যের সঙ্গে চরণটির অনুবাদ করে তিনি প্রাণ রক্ষা করেন।

এভাবে বিশ্বাসগত ত্রুটি ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরিকী থাকা সত্ত্বেও আকবর তাঁর নবপ্রবর্তিত ধর্মের নাম রাখেন 'দ্বীন-ই-ইলাহী'।

আকবর নিজেও এই ধর্মে ঈমান আনেন, অন্যদেরকেও এই ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেন। যারা ঈমান আনতো, তাদেরকে তিনি রীতিমতো মুরীদ বানাতেন, বাইয়াত করতেন। বাদশাহ তাদেরকে কালেমাও পড়াতেন। নবপ্রবর্তিত ধর্মের কালেমাও ছিল অভিনব। মোল্লা বদায়ুনীর ভাষায়—

"স্থির করে দেয়া হয় যে, কালেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে 'আকবর খলীফাতুল্লাহ' বলতে হবে। (মুহাম্মদ মিয়া ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজিয়ে জাদিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪)।

"বরং এই কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, কেবলমাত্র মুরীদদের পর্যন্তই ওটা

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং প্রজা সাধারণকেও তা বলার জন্যে আইনগতভাবে বাধ্য করা হতো। (মুন্তাখাব, পৃ. ২৭৩)।

কোনো ব্যক্তি এই নতুন ধর্মে যথারীতি দাখিল হলে তাকে উপরোক্ত কালেমা পাঠের পর আর একটি শপথও গ্রহণ করা হতো। মোল্লা বদায়ুনী এই শপথনামাকে হুবহু নকল করে দিয়েছেন। তা হলো—

"আমি অমুকের ছেলে অমুক। আমি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, ঐকান্তিক বাসনায় ও আন্তরিক আগ্রহেই বাপ-দাদা থেকে চলে আসা এই কৃত্রিম ও অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম ইসলাম বর্জন করছি এবং আকবরশাহী দ্বীন-ই-ইলাহীতে দাখিল হচ্ছি। আর এই ধর্মে চরম নিষ্ঠার পরিচয়বহ চারটি স্তর যথা—জ্ঞান-বর্জন, মাল-বর্জন, ইজ্জত-বর্জন, ও দ্বীন-বর্জন—এসবকে মেনে নিচ্ছি। (মুন্তাখাব, পৃ. ৪৭৩)।

যারা দ্বীন-ই-ইলাহীতে ঈমান আনতো, তাদেরকে যোগী-সন্ন্যাসীদের ন্যায় 'চিল্লা' (চল্লিশ দিবস ব্রত পালন) দিতে হতো। এরা যাদেরকে মুরীদ বানাতো—তারা 'ইলাহী' নামে খ্যাত হতো। তারা পরস্পরের মধ্যে যেসব চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতো—সেসব পত্রের শিরোনামায় তাদেরকে অবশ্যই "আল্লাহু আকবর" লিখতে হতো। এটা তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। এই "আকবর" দ্বারা সম্রাট আকবরকেই বোঝানো হতো। সালাম দেওয়ার রীতি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ছিল। নতজানু হয়ে সিজদা দিয়ে বাদশাহর প্রতি সম্মান দেখানো হতো। মুরীদদের পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎকালে একজন বলতো—'আল্লাহু আকবর'। এটা 'আল্লাহ্ মহান' এই অর্থে নয়—বর 'সম্রাট আকবর মহান' এই অর্থেই সে উচ্চারণ করতো। এর প্রত্যুত্তরে বলা হতো 'জাল্লা জালালুহু'। অর্থাৎ সর্বোচ্চ তাঁর মহিমা। আর বাদশা আকবরের প্রকৃত নাম ছিল 'জালাল' অথচ এই বিশেষণ একমাত্র আল্লাহ্র সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

এই ধর্মে মুরীদ করার পদ্ধতি ছিল—"বার ব্যক্তির সমন্বয়ে এক একটি দল হতো। প্রত্যেক দল পর পর এসে বাদশার কাছে দীক্ষা নিত। ধর্মীয় ব্যাপারে এরা সবাই একই পন্থা অনুসরণ করতো। (ঐ, পৃ. ৩৪১)।

প্রত্যেক মুরীদকে একটি করে পাগড়ী দেয়া হতো। তা ছাড়া—"মুরীদদেরকে বাদশার একটি প্রতিকৃতি দেয়া হতো। এই প্রতিকৃতিকে নিষ্ঠার চিহ্ন, দৃঢ়তা ও সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা হতো। হীরা-মানিক খচিত একটি সুন্দর গিলাফে এই প্রতিকৃতি গেঁথে মুরীদরা তা আপন আপন পাগড়ীতে লাগাতো।"

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় সম্রাট আকবরের এই হাস্যকর ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে—"এই অদ্ভুদ ধর্মের নবী ছিলেন সম্রাট আকবর স্বয়ং...। প্রতিদিন প্রত্যুষে তিনি সমগ্র বিশ্ব উজ্জীবনকারী পরমাত্মার প্রতীকরূপী সূর্যের পূজা

www.pathagar.com

করতেন। অপরপক্ষে তিনি নিজে স্বয়ং অগণিত মূঢ় নরনারী কর্তৃক পূজিত হতেন।"

এই ছিল সম্রাট আকবরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের সর্বোত্তম পন্থা। আকবর কিভাবে মানুষকে তাঁর ভক্তে পরিণত করেছিলেন তারা কিভাবে সম্রাটের প্রতি তাদের ভক্তি নিবেদন করতো—তা আরো চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। এই ভক্তি নিবেদনের পন্থা সম্বন্ধে মোল্লা বদায়ুনী লিখেছেন—

"প্রত্যেকদিন ভোরে যে সময় বাদশা ঝরোকায় (ঝুলন্ত বারান্দায়) সূর্যের উপাসনা করতেন, সে সময় বাদশাহর মুবারক মুখমণ্ডল দেখার পূর্ব পর্যন্ত এসব মুরীদের পক্ষে দাঁতন করা ও পানাহার করা সম্পূর্ণ হারাম ছিল। প্রত্যেক অভাবী, নিঃস্ব ও ফরিয়াদী হিন্দু হোক বা মুসলমান, পুরুষ হোক অথবা নারী, সুস্থ হোক কিংবা রুগ্ন—প্রত্যেক প্রকারের মানুষের জন্যে এখানে আসার সাধারণ অনুমতি ছিল। যার ফলে প্রতিদিন এখানে একটা হাঙ্গামা হুজুগ ও লোকের হৈচৈ লেগেই থাকতো এবং একটা বিরাট মেলা বসে যেতো। বাদশা সূর্যের এক হাজার এক নাম জঁপ করে পর্দার বাইরে এসে দর্শন দেওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটি লোক তাঁর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়তো। (মুন্তাখাব, পৃ. ২২৬)।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাদশা নিজে হাজার হাজার দেবতার দাসত্বে বন্দী হয়েছেন ক্ষুদ্র বস্তুটি থেকে সূর্য পর্যন্ত তিনি এমন প্রতিটি বস্তুর পূজা করতেন যার মধ্যে সামান্যতম উপকারের সম্ভাবনা এবং ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান ছিল। আর মুরীদরা এসব দেবতার পূজা তো করতোই তার উপর তাদেরকে স্বয়ং বাদশারও পূজা করতে হতো। তারা বাদশাহকে প্রতিদিন একটি করে সিজদা দিতো, এই সিজদার নাম যমিনবুস্ (ভূমি-চুম্বন) রাখা হয়েছিল। **এই অপকর্মে কোন কোন সুফীও শরীক ছিল। তাসাউফ সম্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'নজ্হাতুল আরওয়াহ'-এর ভাষ্যকার তাজুল আরেফীন সাহেব তো বাদশাহ্র সম্মানার্থে এই ভূমি-চুম্বনকে 'ফরজে আইন' (অপরিহার্য কর্তব্য) বলে ফতোয়াও দিয়েছিলেন। তিনি "বাদশাহ্র জন্যে সিজদাকে ওয়াজিব ঘোষণা করে, এর নাম রাখেন 'যমিনবুস' এবং বাদশাহ্র সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখাকে 'ফরজে আইন' বলেন। কেননা বাদশাহ্র মুখমণ্ডল হলো প্রয়োজন ও অভাবপূরণের কেবলা এবং উদ্দেশ্যের কাবা। তিনি কোন কোন দুর্বল রেওয়ায়ত এবং ভারতের কোন কোন সূফীর কার্যপদ্ধতি থেকে তাঁর এই দাবি প্রমাণ করেন।** (মুন্তাখাব, পৃ. ২৫৯)।

ফলে ভূমিচুম্বন রূপ সিজদার এই রীতি সাধারণ লোকদের মধ্যে জারি হয়ে যায়। আকবরের আমলে শুধু সাধারণ লোকদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না।

www.pathagar.com

কোন কোন বিশিষ্ট আলেমকেও এই মুশ্‌রেকানা অপকর্মে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। একজন বিশিষ্ট আলেম কিভাবে বাদশাহ্‌র সম্মানার্থে ভূমি-চুম্বন করেছিলেন, মোল্লা বদায়ুনী লেখনীর মাধ্যমে এর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন—এই মৌলভী যখন শাহী দরবারে হাজির হলো, তখন—

"ঘাড় বাঁকিয়ে সম্রাটকে কুর্নিশ করলো এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাতজোড় করে ও চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইলো। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন বসার অনুমতি মিলল, তখন সাথে সাথেই সে সিজদায় নুয়ে পড়লো পরে উটের ন্যায় বসলো। (ঐ, পৃ. ২৪৭)।

এ হলো আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীর আকীদা-বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার অবস্থা। কিন্তু এই ধর্মের আচার-পদ্ধতি সংস্কার ও হালাল-হারাম বোধের কাহিনী আরো দীর্ঘ। সংক্ষেপে সেগুলোর আলোচনাও প্রয়োজন।

সুদ ও জুয়ার বৈধতা

বদায়ুনী বলেছেন—

"সুদ এবং জুয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। এর উপরই অন্যান্য হারাম বস্তু সম্পর্কে অনুমান করা যায়। একটি জুয়া-ঘর খাস দরবারেই বানানো হয়েছিল। এবং শাহী কোষাগার থেকে জুয়াড়ীদেরকে সুদে ঋণ দেয়া হতো।" মোল্লা সাহেব বলছেন, ফতোয়া দেয়া হলো যে—

শরাব :

"শারীরিক সুস্থতার জন্যে ওষুধ হিসেবে যদি শরাব ব্যবহার করা হয় এবং তা পান করার ফলে যদি কোন ফেত্‌না-ফাসাদের সৃষ্টি না হয়, তাহলে যে কোন অবস্থায় শরাব পান করা যায়েজ। তবে সীমাতিরিক্ত নেশা করা, আর তার ফলে লোকেরা একত্রিত হয়ে শোরগোল করা নিষিদ্ধ। শোরগোলের খবর যদি বাদশাহ পেয়ে যেতেন, তাহলে কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন।"

আর স্বয়ং বাদশাহ "শাহী দরবারের পাশেই একটি শরাব বিক্রির কেন্দ্র খোলেন এবং শরাব বিক্রেতাদের বংশোদ্ভূত জনৈকা সুন্দরী যুবতীকে এর পরিচারিকা নিযুক্ত করেন। শরাবের মূল্যও স্বয়ং বাদশাহই নির্দিষ্ট করে দেন।" (মুন্তাখাব)

শুধু তাই নয়, "নওরোজের উৎসব অনুষ্ঠানসমূহে শরাব পানের আসর বসতো। তাতে অধিকাংশ আলেম এমনকি কাজী (বিচারপতি) এবং মুফতীদেরকে পর্যন্ত নিয়ে আসা হতো।' (মুন্তাখাব)

এই উৎসবে চারদিকে শরাব পানের মহাধুম পড়ে যেতো। বিভিন্ন ব্যক্তির নামে শরাব পান করা হতো। মোল্লা সাহেব লিখেছেন—

www.pathagar.com

"মালিকুশ্ শোয়ারা" (কবি-সম্রাট) ফৈজী মদপানের সময় বলতেন, এই পিয়ালা আমি ফকিহ্দের (ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ) অন্ধত্ব ও গোড়ামীর নামে পান করছি।"

দাড়ির দুর্দশা মদ যায়েজ করার পর সম্রাট আকবর তার নবপ্রবর্তিত ধর্মে যে বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা ছিল দাড়ি মুণ্ডন। দাড়ি রাখা তাঁর ধর্মে হারাম। এই হারাম প্রমাণের জন্যে তিনি বহু যুক্তি ও কিতাবী তথ্যের অবতারণা করেছিলেন। তাঁর হাস্যকর যুক্তি ও অবমাননাকর উক্তিটি ছিল এই—

"দাড়ির খাদ্যরস সংগৃহিত হয়ে থাকে অণ্ডকোষ থেকে। কারণ, কোন খোজারই (হিজরারই) দাড়ি হয় না। সুতরাং দাড়ি রাখাতে কি সওয়াব হতে পারে?"

দাড়ি মুণ্ডনের বৈধতা প্রমাণের জন্যে যে কিতাবী দলীলের অবতারণা করা হয়েছে, তা আরো হাস্যকর। আকবর প্রবর্তিত ধর্মের ভিত্তি যে কত দুর্বল, এই যুক্তি দেখলেই তা বুঝা যাবে এবং আকবরের দৃষ্টি-ভঙ্গিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের কোনো কিতাবে নাকি লিখা আছে এমনভাবে দাড়ি মুণ্ডন করো না, যেমনভাবে করে থাকে ইরাকের কোনো কোনো আওবাশ আরবী ভাষার শব্দ। আওবাশের অনুবাদ করা হয় উসাত। জনৈক মৌলভী আরবী আইন হরফটিকে কাফ বানিয়ে ছাড়েন, সোয়াদ-এর উপর একটি বিন্দু বসিয়ে দেন। এবং আসাত শব্দটিকে কাদাত বানিয়ে ফেলেন। আর শাহী দরবারে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত এই আরবী বাক্যটিকে এভাবে পেশ করেন—অর্থাৎ যেভাবে ইরাকের কাজীগণ দাড়ি মুণ্ডন করেন। এটিই হলো আকবরের দাড়িমুণ্ডনের দলীল। কেননা, ইরাকের কাজীগণ যখন দাড়ি মুড়িয়ে ফেলেন, তখন মুসলিম ভারতের কাজীগণ কেন মুড়াবেন না? আর কাজীগণ যখন মুণ্ডাবেন তখন সাধারণ লোকের পক্ষে তা মুণ্ডন করা বৈধ না হয়ে যায় কোথায়!

মোল্লা আবু সাঈদ পানিপথী নামক জনৈক বিশিষ্ট আলেম তাঁর লিখিত পুরাতন পাণ্ডুলিপির মধ্যে দাড়িমুণ্ডনের স্বপক্ষে একটি হাদীসও নাকি পেয়ে যান এবং শাহী দরবারে তা পেশও করেন। মোল্লা বদায়ুনী তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে এটিকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। মোল্লা সাহেবের ভাষায় এর অনুবাদ হলো—

"জনৈক সাহাবীর ছেলে দাড়িমুণ্ডন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, বেহেশতবাসীদের আকৃতি এরূপই হবে।"

এসব দলিল প্রমাণ জোগাড় করে আকবর স্বয়ং দাড়ির মূলোৎপাটন করেন, অন্যদেরকেও দাড়ি মুড়ানোর নির্দেশ দেন। মোল্লা বদায়ুনী তাঁর গ্রন্থে এই

www.pathagar.com

তারিখটিও লিখে রাখেন। তখন ছিল ৯৯০ হিজরী। এ সময় আকবরের বয়স ছিল ৪০ বছর। বাদশাহর দেখাদেখি দরবারের বড় বড় আলেম-ফাজেলরাও আপন আপন দাড়ি মুণ্ডন করে বাদশাহর প্রতি চরম আনুগত্য ও নিষ্ঠার প্রমাণ দেন।

ফরজ গোসল

সম্রাট আকবর তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে ফরজ গোসল তুলে দেন। মোল্লা বদায়ুনী লিখেছেন—

সঙ্গমের পর নাপাকীর কারণে গোসল ফরজ হওয়ার বিধিটাকে বাতিল করে দেয়া হলো। কারণ বীর্য নেক লোকদের পয়দায়েশের মূল। তাই সঠিক ব্যবস্থা এই যে, প্রথমে মানুষ গোসল করবে, তারপর সহবাসে লিপ্ত হবে।

বিয়ে

দ্বীন-ই-ইলাহীতে বিয়ে সম্পর্কেও বহু নতুন নতুন আইন জারি করা হয়। চাচাত বোন, খালাত বোন ও মামাত বোনের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কেননা, এতে ভালবাসা ও পারস্পরিক আকর্ষণ নাকি হ্রাস পায়। তাছাড়া এই আইনও করে দেয়া হয় যে,—"ষোল বছরের পূর্বে ছেলেদের চৌদ্দ বছরের পূর্বে মেয়েদের বিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। কেননা এতে সন্তানাদি দুর্বল হয়। (মুন্তাখাব)

ইংরেজ আমলের সারদা এ্যাক্ট এবং আমাদের দেশের পরিবার পরিকল্পনা আইন সম্রাট আকবরের এই আইনেরই আধুনিক সংস্করণ। মোল্লা বদায়ুনী লিখেছেন যে, মুসলমানগণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ের বয়সকে ওজর হিসেবে পেশ করেছিলেন। কিন্তু বাদশা হযরত আয়েশা (রা:)-এর বিয়ের এই বয়সের সত্যতা অস্বীকার করেন। তাছাড়া প্রয়োজনেও একাধিক স্ত্রী লোকের সঙ্গে বিয়ে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। যুক্তিস্বরূপ বলা হয় যে, "আল্লাহ এক এবং নারীও এক" আরো হুকুম জারি করা হয় যে, যেসব মহিলার মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে, তারা আর বিয়ে করতে পারবে না, যেসব নারীর বয়স পুরুষের চেয়ে বার বছর বেশি তারা উভয়ে যৌন সম্ভোগ করতে পারবে না। বিয়ের জন্যে সরকারি সার্টিফিকেট হাসিল করা বর-কনের পক্ষে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। হুকুম দেয়া হয় যে, তাদের উভয়কে কোতোয়ালীতে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তাদের সঠিক বয়সের সার্টিফিকেট হাসিল করতে হবে। তা না হলে তাদের বিয়ে বৈধ হবে না, তা সরকারি স্বীকৃতি পাবে না। এর পরিণাম এই হলো—

www.pathagar.com

"এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মচারীদের জন্যে অর্থোপার্জনের দারুণ সুযোগ হয়ে গেল। বিশেষত কোতোয়াল, অপরাপর কর্মচারী এবং তাদের সহযোগী ও অধীনস্থরা—যারা সাধারণত ইতর নিকৃষ্ট জাতীয় লোক—তারা এই আইনের ফলে যতো লাভবান হয়েছে, তার পরিমাপ বিপুল। (মুন্তাখাব, পৃ. ৩৯১)।

পর্দা

পর্দাপ্রথা উচ্ছেদ আধুনিককালের কোন কীর্তি নয়। আকবর তাঁর দ্বীন-ই-ইলাহীতেও এই পর্দাপ্রথা তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বদায়ুনী বলছেন—

"যেসব যুবতী নারী হাটবাজারে যাতায়াত করে, পথ চলাকালে অবশ্যই তারা মুখ খোলা রাখবে অথবা সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে চলবে।"

জেনা-ব্যভিচারের সুব্যবস্থা

আকবরের আমলে কোনো কোনো স্বার্থপর আলেম 'মুত্আ' বিয়েকে জায়েয বলে ফতোয়া দেন। তাঁরা এজন্যে হানাফী ফিকাহ্শাস্ত্রের দোহাই পাড়েন। তাতে কোথায় নাকি 'মুত্আ' বিয়ে জায়েয রাখা হয়েছে। কোনো কোনো মৌলভী এমন স্বকপোলকল্পিত কথাও আকবরকে অবহিত করেন যে কোন কোন মুজতাহিদের নয়টি, এমনকি অনেকে এরও অধিকসংখ্যক স্ত্রী নাকি একই সঙ্গে রাখা জায়েয বলেছেন। তবে, এ হলো দ্বীন-ই-ইলাহী প্রচারের পূর্বের কথা। কিন্তু নতুন ধর্মে একাধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হলে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়া হতো। একদিকে এই ছিল অবস্থা। অথচ অপরদিকে বিয়ে এবং মুত্আ ছাড়াও জেনা ও ব্যভিচারেরও অনুমতি ছিল। মনে হয়, আইনত জেনা হারাম ছিল না। কেবলমাত্র তা শৃঙ্খলায়িত করার জন্যেই আইন বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। মোল্লা বদায়ুনী লিখছেন—

"শহরের বাইরে বেশ্যাপল্লী তৈরি করে দেয়া হয়। এর নাম রাখা হয় শয়তানপুর। ওখানে যথারীতি রক্ষক, পাহারাদার ও দারোগা নিযুক্ত ছিল। উদ্দেশ্য, বারবণিতাদের সাথে যারা মিলতে চায় কিংবা তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, তারা যেন এদের কাছে আপন আপন নামধাম ও বংশ লিখিয়ে রাখতে পারে এবং ওসব কর্মচারীর অনুমতিক্রমে বেশ্যাদের সাথে যা ইচ্ছা করতে পারে।"

বারবণিতাদের সঙ্গে জঘন্যতম অপকর্ম করারও অনুমতি আইনে ছিল। তবে এই সুযোগ একমাত্র বাদশার ঘনিষ্ঠজনদের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। মোল্লা বদায়ুনী বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করেছেন। রুচিবিরোধী হওয়ার কারণে তা এখানে উল্লেখ করা সমীচিন নয়।

www.pathagar.com

খত্না

ছেলেদের খত্না করা ইসলামে সুন্নত। কিন্তু আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীতে এই সুন্নতের উপরও হস্তক্ষেপ করা হয়। অথচ স্বয়ং এই নতুন ধর্মের প্রবর্তকেরও খত্না করা হয়েছে। এই ধর্মপ্রচারের পূর্বে আকবর তার শাহজাদাদের খত্না করিয়েছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলিমের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব যখন বাদশাহর মনে জাগলো তখন তিনি ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি সম্পর্কে এই আইন জারী করে দিলেন যে—

"বার বছর বয়স হওয়ার পূর্বে ছেলেদের খত্না করানো চলবে না। বার বছরের পর ছেলেদের এটা ইচ্ছা হলে করবে না হলে করবে না। (মুন্তাখাব, পৃ. ৩৭৬)।

এটা স্পষ্ট যে, বার বছর পর কোন বালকই এই কষ্টকর কাজের প্রতি আগ্রহী হতে পারে না। তাছাড়া অন্যদিকে স্বয়ং সরকার এ সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করে থাকেন। সুতরাং এতে পরোক্ষভাবে খত্না বন্ধ করে দেয়ার গোপন ষড়যন্ত্রই করা হয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলমানকে অন্তত এ ব্যাপারে এক রাখার চেষ্টা চলেছিল।

মৃতের দাফন

এ ব্যাপারেও দ্বীন-ই-ইলাহীতে নতুন নির্দেশ জারী করা হয়। ইসলামে মৃতদেহকে কবরে দাফন করারই আদেশ রয়েছে। কিন্তু এই নতুন ধর্মগ্রহণকারীদের কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হলো যে, বিনষ্ট খাদ্য এবং কঠিন ইট মুর্দার ঘাড়ে বেঁধে তাকে পানিতে ছেড়ে দেবে। আর যেখানে পানি না থাকবে সেখানে তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে, অথবা দুষ্কৃতিকারীদের ন্যায় মৃতদেহকে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবে।

মনে হয় মৃতদেহকে ডুবিয়ে দেয়া, জ্বালিয়ে দেয়া, কিংবা ঝুলিয়ে রাখার আদেশ পরেই হয়েছে। কেননা, প্রথমদিকে এই নির্দেশ ছিল না। তখন দাফনের বিরোধিতা করা হয়নি। তখন হুকুম ছিল—

"মৃতব্যক্তির মাথা পূর্বদিকে এবং পা পশ্চিমদিকে রেখে তাকে দাফন করতে হবে।" (ঐ, পৃ. ৩৫৭)।

আকবরের বিশিষ্ট মুরীদদের অন্যতম ছিলেন সুলতান খাজা। তাঁর মৃত্যুর পর আকবর তাঁকে ঠিক এভাবেই দাফন করেন। তদুপরি তাঁর কবরে যেন অনায়াসে রৌদ্রকিরণ ঢুকতে পারে সেজন্যে তাতে একটি জানালাও বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। (ঐ, পৃ. ৪৪১)।

"সূর্যের দিকে মুখ করে তিনি একটি খিড়কী (বাতায়ন) বানিয়ে দিয়েছিলেন

www.pathagar.com

যেন প্রতিদিন ভোরে সূর্যকিরণ তার মুখমণ্ডলে পড়তে পারে।

কেননা এর কিরণ পাপমোচনকারী।

মানুষকে একথা বলতেও শোনা গেছে, তাঁর মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল।

"সম্রাটের হঠকারিতা এতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল যে, ঠিক কাবা শরীফের দিকে পা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে যেমন দাফনের নির্দেশ দিয়েছিলেন; তেমনি স্বয়ং নিজেও শোয়ার জন্যে ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন।" (মুন্তাখাব, পৃ. ৩৫৭)।

অর্থাৎ আকবর স্বয়ং ঠিক কেবলার দিকেই পা রেখেই শুতেন।

এই ছিল দ্বীন-ই-ইলাহী, সম্রাট আকবর যা প্রবর্তিত করেন। ইসলামের বিরোধিতা করাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই জীবনের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ইসলাম নির্দেশিত সব ব্যবস্থাকেই আকবর ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। মোল্লা বদায়ুনীর বর্ণনায় জানা যায়, উপরোক্ত বিধি-বিধান ছাড়াও দ্বীন-ই-ইলাহীতে সোনা ও রেশমকে পুরুষদের জন্যে শুধু হালালই নয়; বরং প্রায় ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছিল। সে সময় যেসব আলেম এই নতুন ধর্ম কবুল করেছিলেন, কিংবা এর সমর্থক ও সহায়তাকারী হয়েছিলেন, তারা রেশমী বস্ত্র পরিধান করতেন এবং আল্লাহদ্রোহীর সকল হুকুম মেনে চলতেন। শুধু তা-ই নয় সম্রাট শূকর ও কুকুরকেও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন।

"ইসলামের বিরোধিতায় শূকর ও কুকুরের অপবিত্র হওয়ার নির্দেশকে বাতিল করে দেয়া হয়েছিল এবং শাহী মহলের ভেতর বাইরে এই উভয় প্রকারের অপবিত্র জীব রাখা হতো। প্রত্যুষে এসব দেখা বাদশাহ ইবাদত বলে গণ্য করতেন।" (মুন্তাখাব)

আকবরের নবরত্নের একরত্ন, বিশিষ্ট আলেম ফৈজী সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে মোল্লা বদায়ুনী মন্তব্য করেছেন যে, তিনি সফরকালে কয়েকটি কুকুরকে সাথে সাথে রাখতেন। এই কুকুরগুলোর সঙ্গে একই পাত্রে খানা খেতেন। কোনো কোনো সময় কবি কুকুরগুলোর জিহ্বা পর্যন্ত নিজের মুখের ভিতর নিয়ে নিতেন।" (মুন্তাখাব)

এই ছিল দ্বীন-ই-ইলাহীর পুরো নকশা। এতেই নাকি সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। আকবর নাকি সর্বধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। আর এ জন্যে পাশ্চাত্য ও হিন্দু ঐতিহাসিকগণ তাঁর প্রশংসাও করেছেন অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একমাত্র ইসলামই আকবরের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল। তাছাড়া আর সব ধর্মই তার সুদৃষ্টি লাভ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধানগুলোই একমাত্র অযৌক্তিক। তাছাড়া আর সবই যুক্তিভিত্তিক। তাই

www.pathagar.com

ইসলামের নির্দেশাবলীকে রদ করা হয়েছে। আর অন্যান্য ধর্মের বিধিগুলোকে এমনকি কুসংস্কারগুলোকে পর্যন্ত দ্বীন-ই-ইলাহীর অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এর মধ্যে রাখীবন্ধনের প্রতীক হাতে বাজুবন্ধ ব্যবহার অন্যতম। বাদশা এটা সবসময় হাতে রাখতেন। বিশেষত হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী তাদের উৎসব দিনে বাদশা তা ব্রাহ্মণদের হাত থেকে খুলে নিয়ে আপন হাতে পরতেন। এটি হীরকখচিত ছিল। সম্রাট কল্যাণকর মনে করেই তা করতেন। কিন্তু তাঁর ধারণা, এতে হিন্দুরাও খুশি হবে, দেবতারও সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে।

শিবরাত্রিতে বাদশা যোগীদের সঙ্গে কয়েকরাত বিনিদ্র রজনী কাটাতেন। অথচ ইসলামের শবেকদর কিংবা অপর কোনো পবিত্র রাত তাঁর পছন্দ হয়নি। সম্রাট একদিকে সিংহ ও চিতাবাঘের মাংস হালাল করে দিলেন, অপরদিকে "গরু, মহিষ, ঘোড়া, এবং উটের গোশ্ত হারাম বলে ঘোষণা করলেন।" (মুন্তাখাব) এরই সঙ্গে অপর একটি আইনও জারী করলেন, জবাই করা যার পেশা, তার সঙ্গে যে ব্যক্তি খানা খাবে, তার হাত কেটে দেয়া হবে। এমনকি তার স্ত্রীও যদি তার সাথে খানা খায়, তবে যেসব আঙুল দিয়ে খানা খেয়েছে, সেসব আঙুল কেটে ফেলা হবে।' (মুন্তাখাব পৃ. ২৭৬) এতে মনে হয় সাম্রাজ্যে হালাল পশু জবাই এবং তার গোশ্ত খাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা দেয়াই আকবরের উদ্দেশ্য ছিল।

এতো ছিল খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে নতুন ধর্মের বিধান। আকবর এর চেয়েও আরো বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। দ্বীন-ই-ইলাহীর এরূপ একটি আইনও আকবর জারী করেছিলেন,

"যদি কোনো হিন্দু নারী কোনো মুসলমান পুরুষের প্রেমে পড়ে এবং মুসলমানদের ধর্ম গ্রহণ করে, তবে সেই নারীকে কঠোর ও নির্মমভাবে ছিনিয়ে নিবে এবং তার পরিবারের লোকদের কাছে ফিরিয়ে দিবে।" (মুন্তাখাব, পৃ. ২৯২)।

মুসলমানদের প্রতি বাদশার এই দৃষ্টিভঙ্গি জাহাঙ্গীরের আমলেও মুসলমানদের করুণ ইতিহাস মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (র.) বর্ণনা করেছেন।

"ভারতের অমুসলমানরা নির্বিঘ্নে ও নির্দয়ভাবে মসজিদসমূহকে ধ্বংস করছে এবং সে স্থানে নিজেদের মন্দির গড়ে তুলছে। একইভাবে কাফেররা প্রকাশ্যভাবে কুফরী কাজকর্ম করে যাচ্ছে মুসলমানদেরকে ইসলামের হুকুম-আহকাম আদায় করতে দেয়া হচ্ছে না।" (মাক্তুবাতে মুজাদ্দিদ, পত্র নং ৯৩, ছয়খণ্ড, পৃ. ১৬২)।

এই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে আকবরের দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ দাবি করা হয়েছিল যে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হবে, সবার সঙ্গে সমান

www.pathagar.com

আচরণ করা হবে, সবাই সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে। আর কার্যত তা ছিল দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত।

মোল্লা বদায়ুনী আকবরের মৌখিক একটি বিবৃতি উল্লেখ করেছেন, একদিন বাদশা জনতার এক সমাবেশে ভাষণদানকালে স্বীয় মত জাহির করেন—

"হিন্দী ভাষায় গ্রন্থসমূহ—যা ভারতের মুনি, ঋষি ও জ্ঞানীদের রচিত—এর সবই সত্য। এগুলো সম্পূর্ণ নির্ভীক জ্ঞানের উপর ভিত্তিশীল। আর ঐ গোষ্ঠীর (হিন্দুদের) সকল বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার উৎসমূলই হলো এই গ্রন্থগুলো। সুতরাং আমরা হিন্দী থেকে নিজেদের নামে ফারসী ভাষায় এই গ্রন্থগুলো অনুবাদ না করবো কেন?... এর দ্বারা আমাদের ইহকাল ও পরকালের চিরন্তন উন্নতি, সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য হাসিল হবে। প্রচুর সম্পদ ও অধিক সন্তান লাভ করা যাবে।" (মুন্তাখাব, পৃ. ৩২০)।

এই উদ্দেশ্যে অনুবাদ বিভাগ খোলা হলো। আলেমগণ নিযুক্তিপত্র পেলেন, তাঁরা এসব গ্রন্থের অনুবাদে লেগে গেলেন, এর প্রকাশ, প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। অথচ আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্রাটের ব্যবহার ছিল খুবই মর্মান্তিক। মোল্লা বদায়ুনীর ভাষায়—

"আরবী পড়া, আরবী জানা দুষণীয় বলে ঘোষণা করা হলো। তাফসীর ও হাদীস অধ্যায়নকারীগণ মরদুদ ও অভিশপ্ত বলে খেতাব পেলেন।" এভাবে হাদীস তাফসীর ও ফিকাহ পড়া বন্ধ করে দেয়া হলো আর তদস্থলে জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ডাক্তারী, অংকশাস্ত্র, কবিতা ইতিহাস এবং প্রচলিত গল্পগুজব শিক্ষা চালু করা হলো। মোল্লা সাহেব লিখেছেন—

ঐ বছর ফরমান জারী হলো যে, প্রত্যেক জাতিকে আরবী শিক্ষা পরিত্যাগ করতে হবে। মুসলমান বিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র, ডাক্তারী অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শন ব্যতীত তারা আর কিছুই পড়তে পারবে না।" (মুন্তাখাব, পৃ. ৩৬৩)।

এর পরিণাম কি ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ইসলামী শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল, আর শুধু পার্থিব তথা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই চালু রইল। এই পরিণামটি মোল্লা বদায়ুনী তুলে ধরেছেন—

মাদ্রাসা এবং মসজিদসমূহ বিরাণ হয়ে গেল। অধিকাংশ আলিম নির্বাসিত হলেন। তাঁদের অযোগ্য সন্তানেরা যারা এদেশে রয়ে গেলো—তারা বাজিগরীতে সুখ্যাতি অর্জন করতে লাগলো।

ব্যাপার এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। তখনও সারা ভারতবর্ষ থেকে আরবী শব্দ বিতাড়নের আন্দোলন শুরু হয়নি। তবে আকবরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন জিনিসের নাম রাখার ব্যাপারে। এক্ষেত্রে তিনি হিন্দী শব্দ সংযোজনকেই অধিক পছন্দ করতেন। যেমন তিনি হাতীর নাম

www.pathagar.com

রেখেছেন নাথ পুল, পীরপ্রসাদ ইত্যাদি। সম্রাট আকবর কথাবার্তায় নিত্য ব্যবহৃত আরবী শব্দকে ঠিক রেখে তার উচ্চারণকে দেশায়িত করতে চেয়েছিলেন। এই উচ্চরণকালে তিনি আরবী হরফের (বর্ণ) স্থলে দেশী হিন্দী হরফ বসিয়ে উচ্চারণ করার চেষ্টা চালিয়েছেন। মোল্লা বদায়ুনী লিখেছেন—

"যেসব হরফ (বর্ণ) আরবী ভাষার সাথেই সম্পর্কিত—যেমন, যোয়া, তোয়া, ছা, হা, আইন, দোয়া, শিন যেসব হরফকে সম্রাট কথাবার্তায় ব্যবহার থেকে বাদ দিয়ে দেন। (মুন্তাখাব, পৃ. ৩০৭)।

তিনি এসব হরফের উচ্চারণে আরবী রীতি বর্জন করেন এবং দেশীয় রীতি চালু করেন। যেমন আবদুল্লাহ-কে আবাদাল্লাহ এবং আহরী-কে আহরা বলতেন। আর এভাবে বিকৃতি সাধন করতে পেরে খুবই আনন্দবোধ করতেন।

কিন্তু আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন। তাই শুধু কথাবার্তা পর্যন্তই আকবরের এই অপচেষ্টা সীমায়িত ছিল। যদি আকবর শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এই রীতি বাধ্যতামূলক করে দিতেন—তাহলে আজ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মহাঅবদান বিপুল গ্রন্থরাজির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে পড়তাম। অসম্ভব হয়ে পড়তো ওসব গ্রন্থরাজির গভীরে প্রবেশ করা এবং তার মর্ম উদ্ধার করা। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন রক্ষার দায়িত্ব স্বয়ং তাঁরই। তাই তিনি তা রক্ষা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

বস্তুত এভাবে শিক্ষা বরবাদ করার জন্যে আকবর প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা। অপরদিকে আলেম পীর ইমাম এবং খাতীবদের শতাব্দীব্যাপী ভোগ-দখলকৃত ভূসম্পত্তিসমূহও তিনি বাজেয়াফত করা শুরু করে দিলেন। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে যেসব সম্পত্তি তারা ভোগ করে আসছেন—আর ইসলামী শিক্ষাকে জিইয়ে রাখছিলেন, আকবর এসব সম্পত্তির পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে লাগলেন। ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের এ ছিল তাঁর পরোক্ষ প্রয়াস। আকবরী আমলের পূর্বে এসব ভূমির পরিমাণ ছিল।

"হেদায়ার ন্যায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের কিতাবসমূহ শিক্ষাদানকারীদের জন্য কমবেশি একশ' বিঘার জায়গীর নির্দিষ্ট ছিল। আর এটা ছিল ভূমির সর্বনিম্ন পরিমাণ।" (মুন্তাখাব)

আর আকবর ইসলামের প্রতি ইসলামী শিক্ষার প্রতি কি আঘাত হেনেছিলেন—ইসলামী তাহজিব-তামাদ্দুনের ধ্বংসসাধনে কিরূপ মেতে উঠেছিলেন, মুজদ্দিদ-ই আলফেসানীর এক পত্রে এর যে দৃশ্যটি ফুটে উঠেছে তা যেমনি করুণ, তেমনি মর্মান্তিক। তিনি লিখেছেন—

ইসলামী বসতি এলাকায় কাজী (বিচারক) নিয়োগ ইসলামী অনুশাসনের সামগ্রিক রূপের মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী যুগে (আকবরের আমলে) এটা মিটিয়ে

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছিল।" (প্রথম খণ্ড)

মুজাদ্দিদ সাহেব আরো উল্লেখ করেছেন, "প্রায় একযুগ ধরে ইসলামের সঙ্কটময় অবস্থা বিরাজ করে। এই সময় অমুসলমানরা শুধুমাত্র এতটুকু করেই সন্তুষ্ট ছিল না যে, ইসলামী শহরগুলোতে প্রকাশ্যভাবে কুফর চলতে থাক। বরং তারা তো এটাই চাচ্ছিল যে, ইসলামী হুকুম-আহকাম সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া হোক এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কোন চিহ্নই বাকি না থাকে। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, কোন মুসলমানের মাধ্যমে যদি ইসলামের কোন চিহ্ন প্রকাশ পেতো তবে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা হতো। (মাকতুব নং ৮২, প্রথম খণ্ড পৃ. ১০৬)

এই পরিস্থিতি ছিল জাহাঙ্গীরের আমলের প্রথমদিকে। আকবরের সময়ে পরিস্থিতি কিরূপ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস করার পর মুসলমানদের সামনে শিক্ষার দ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে বাদশাহী ফরমান জারী করা হয় তা ছিল এই—

"ইতর জাতির লোকদের শহরগুলোতে বিদ্যাশিক্ষা থেকে বিরত রাখা হোক। কেননা এই জাতি থেকে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে থাকে।" (মুন্তাখাব পৃ. ৩৫৬)

আকবর এখানে ইতরজাতি বলতে মুসলমানদেরকেই বুঝিয়েছেন। আর ধারণা করেছিলেন, এদেরকে অজ্ঞ ও মূর্খ রাখতে পারলেই তার সিংহাসন নিরাপদ থাকবে।

সূত্র : মুজাদ্দিদে আলফে-সানীর সংস্কার আন্দোলন

জুন ২০১২

বি. দ্র. : পাঠকবৃন্দ, আকবরের উপরোক্ত নীতি ও কর্মকাণ্ডের জন্যই ইউরোপীয় ও হিন্দু ঐতিহাসিকরা আকবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেন 'Akbar the Great'.

www.pathagar.com

সম্রাট আকবরের বিপথগামিতার নেপথ্য কারণ

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ (রহ.)

উম্মাহর বিগত চৌদ্দশত বছরের অধিক সময়ের ইতিহাসে সুখ-সমৃদ্ধি, শান-শওকাত ও উদ্দীপনাময় বহু গৌরবময় ঘটনা থাকলেও অনৈক্য, ধ্বংস, বিপর্যয়, দুর্বলতা, লজ্জা ও কলংকের অসংখ্য বেদনাদায়ক ঘটনারও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস কিংবা ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নে মুসলিম ঐতিহাসিকদের অন্যমনস্কতা বা ব্যর্থতার সুযোগে অমুসলিম ঐতিহাসিকদের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অনুপস্থিতি কিংবা বিজাতীয় চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবেই হোক ইতিহাস প্রণয়নে ইসলামের সুমহান আদর্শকে যেমন প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনায় মুসলিম শাসকদের কৃতিত্ব ও দক্ষতাকে যৎকিঞ্চিত প্রাধান্য দিলেও মানবতা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে তেমন মূল্যায়ন করা হয়নি। তদুপরি, মুসলিম বিদ্বেষীদের ইসলাম ও মানবতাবিধ্বংসী জঘন্য ষড়যন্ত্র যেমনটি ইতিহাসে স্থান পায়নি তেমনি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনার বশবর্তী হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের স্ব-প্রণোদিত ইসলামবিরোধী অপকর্ম ও রাজনৈতিক জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোকে প্রগতিশীলতার আবরণে কিংবা কৃতিত্বের প্রলেপে ঢেকে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। মানব সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে "কোনো অবস্থাতেই ক্ষমতার কেন্দ্রকে হাতছাড়া না করার মানসে পার্থিব ক্ষমতার অধীশ্বর দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা জনগণের উপর অনাচার ও কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়ে আদর্শিক সার্বভৌমত্বের স্থলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর থাকে।" সম্রাট আকবর ছিলেন সেই সামন্ত প্রভুদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরি। ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুশক্তি ও ব্রিটিশ বেনিয়াদের যৌথ প্রযোজনায় ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা হরণের নাটক মঞ্চস্থ হলেও এর প্রায় দুশো বছর পূর্বে সম্রাট

www.pathagar.com

আকবরের শাসনামলে এর প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছিল। আকবর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা বিনাশী 'দ্বীনে ইলাহী' প্রবর্তনের মাধ্যমে বিভেদযুক্ত 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতির যে বীজ বপন করেছিলেন তা আজ মহীরুহ আকার ধারণ করেছে যার কুপ্রভাবে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

মুসলিম জাতির ইতিহাসে বিপর্যয়ের প্রথম এবং বৃহত্তম দুর্ঘটনা তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) এর শাহাদাত। আরব কবির ভাষায়, "মা-কানা হালকু কায়ছিন লাহালকুন ওয়াহিদুন, অলকিন্নাহুবুনআনা কাওমিন তাহাদ্দামা" (অর্থাৎ কায়েসের ধ্বংস একটি একক ধ্বংসমাত্র ছিল না, এই একটিমাত্র ধ্বংসের ফলে একটি জাতির বুনিয়াদ চুরমার হয়ে গিয়েছিল)। উল্লেখ্য যে, ইতিহাসবিদগণ তাতার জাতির অভ্যুত্থান এবং ভ্রাতৃঘাতী আত্মকলহের সুযোগে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে স্পেন হতে মুসলমানদের অপ্রত্যাশিত বিতাড়ন এই দুটি ঘটনাকে মুসলিম জাতীয় বিপর্যয়ের ২য় ও ৩য় কারণ এবং সম্রাট আকবরের শাসনকালকে ৪র্থ ও সর্বশেষ বিপর্যয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। মুসলিম সাংবাদিকতার প্রবাদপুরুষ মাওলানা আকরাম খাঁ মুসলিম উম্মাহর চতুর্থ ও সর্বশেষ বিপর্যয় চিহ্নিত করতে গিয়ে লিখেন, "মোছলেম জাতির চতুর্থ ও সর্বশেষ যে সংকট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাহা হইতেছে ভারতের মোগলদের (মোগল সম্রাজ্য শব্দটি স্পষ্টতই বিভ্রান্তিকর...) সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং সেই বংশে জালালুদ্দীন শাহ আকবরের অভ্যুদয়। সেই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সহস্র বছর যাবত যেসমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এছলাম ও মুছলমানদের সমাজ জীবনের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল, সম্রাট আকবরের নিকট তাহা সমর্থন ও উৎসাহ পাইল। তিনি এই সমস্ত বিরুদ্ধবাদের ব্যাখ্যাদাতাদের প্রচুর সম্মান ও সমাদরের সহিত তাহার দরবারে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। মুছলমানদের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেবার জন্য ভারতে যে হিন্দু মানসিকতা নীরবে অথচ অব্যাহতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছিল– ইতিহাসের সর্বসম্মত রায় অনুসারে সেই হিন্দু মানসিকতাকে জীবনধারায় প্রাধান্য দেয়ার জন্য আকবর কোনোরূপ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বলাবাহুল্য একদিকে মুছলমান চিন্তানায়কগণ যে তীব্র ভাষায় আকবরের শাসননীতির নিন্দা করিয়াছেন এবং অপরদিকে মোছলেমবিরোধী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকগণ যে তাহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মহান সম্রাটরূপে প্রশংসাবাদ দিয়াছেন, ইহাই তাহার যথার্থ কারণ।"

www.pathagar.com

আকবর প্রবর্তিত দ্বীনে ইলাহী সম্পর্কে মাওলানা আকরাম খাঁ অন্যত্র লিখেন "এছলাম ও মুছলিম তমুদ্দুনের সকল শিক্ষা ও উপাদানের বিরুদ্ধে এক নিষ্ঠুর বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ইন্দো ইরানীর চিন্তাধারার সমন্বয়ে একটি নতুন প্রকৃতি পূজাভিত্তিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাই ছিল আকবরের ধর্মনীতির দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আকবরের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অগভীর, তাই হিন্দু মানসিকতার মর্মমূল যথার্থ অনুধাবনেই শুধু তাহার ভুল হয় নাই– সেই সময়কার মুসলিম জাতির সাময়িক জড়তাকে তাহাদের মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াও তিনি বিরাট ভুল করিয়াছিলেন। যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এই সময়ে মুছলিম ভারতের জীবন ও আত্মা সাময়িকভাবে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার মৃত্যু ঘটে নাই। কারণ যেকোনো পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই একজন মুছলমান সবসময় মুছলমানই থাকিবে।"

সম্রাট আকবরের বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সেই সময়ে গ্রীক দর্শনের মুক্তবুদ্ধি চর্চার কুপ্রভাবে ইসলামের তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ অনেকাংশে দুর্বলতর হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ ভাবনামগ্ন মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দু পণ্ডিত, যোগী, ঋষি, গণক, যুগী, সন্ন্যাসী, জ্যোতিষী ও প্রভাবশালী রাজপুতগণ ইসলামকে মিটিয়ে দেবার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই অপশক্তির মূল টার্গেট রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সম্রাটকে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও অনুশাসন থেকে বিচ্যুত করে তাঁর বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভ্রান্ত করে তাঁকে ষড়যন্ত্রের আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলা। ফলে সম্রাট ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি নির্ধারণে সনাতনী ধ্যান-ধারণায় বেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় মুসলিম উম্মাহ বিভক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

মুসলমানদের পারস্পরিক বিভক্তির আরেকটি মূল কারণ হচ্ছে শাহী মহলের অনুকম্পা প্রত্যাশী দুনিয়াদার আলেম সমাজের রাজকীয় সুযোগ সুবিধা লাভের অনৈতিক প্রতিযোগিতা। এসব কারণ ও উপকরণ নিরক্ষর আকবরের মন-মগজে এতো অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আলেম সমাজের জন্য যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিল সেগুলো সম্পূর্ণরূপে রহিত করে তদস্থলে তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামবিরোধী রীতিনীতি চালু করতেও দ্বিধা করেননি। মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কাছে আত্মসমর্পিত মুসলমান হিসেবে ইসলামকে বিজয়ী করার দৃঢ় মানসিকতা প্রদর্শনের পরিবর্তে তিনি বিজাতীয় চিন্তা-চেতনার সংস্কৃতিকে লালন ও সম্প্রসারণে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখে ইতিহাসের একজন জঘন্যতম খোদাদ্রোহী শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরই পথপরিক্রমায়

www.pathagar.com

ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিশ্বাসের উপর চতুর্দিক থেকে ছুরি চালিয়ে ইসলামের সকল মতাবলম্বীদের কাছে সমভাবে ধিকৃত ও ঘৃণিত চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আমরা তাঁর শাসনকাল পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, বিজাতীয় সংস্কৃতিতে সম্রাটের প্রবল আকর্ষণের প্রভাবে হিন্দু বা সনাতন ধর্মের ন্যায় অবতারবাদ ও পুনঃজন্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে মুসলমানদেরকেও উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং তিনি চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি-মূর্তি প্রভৃতি পূজা-অর্চনার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান ও অশ্লীলতা-ব্যাভিচার-মদ্যপান-গান-বাজনার মতো কার্যকলাপকে অবলীলায় রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা প্রদান করেন।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাস ও পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিপদসঙ্কুল নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকবিলা করেই শাসকশ্রেণীকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়েছে। আকবরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিদেশী আগ্রাসী শক্তির সহিত দেশের অভ্যন্তরে থাকা হিন্দু শক্তির যোগসাজশ সম্রাট বুঝতে পারলেও তাদের ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানকে সূচনাতেই নির্মূল করার সাহস ও সংকল্প প্রদর্শন করতে তিনি শুধু ব্যর্থ হননি বরং হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের এক অভিনব অসাধু নীতিকে রাজনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী মূল্যবোধ ও অনুশাসন চর্চার বিপরীতে শাহী মহলে মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা একটি নিয়মিত অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করে। জালালুদ্দীন আকবর শাহ্ গাজী কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা পরিধান করে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে যখন রাজদরবারে উপস্থিত হতেন তখন হিন্দু পণ্ডিত ও সভাসদগণ 'শঠে শঠাং' নীতির মাধ্যমে সম্রাটকে বিধাতার আসনে বসিয়ে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো ধ্বনিতে কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করতো। তাই তো সম্রাটের নামে দেবী বন্দনা রচনা করে হিন্দু ভক্তকবি গেয়েছেন,

হেথা এক দেশ আছে নামে পঞ্চগৌড়।
সেখানে রাজত্ব করে বাদশাহ্ আকবর।
অর্জুনের অবতার তিনি মহামতি
বীরত্বে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি।
ত্রেতা যুগে রাম হেন অতি সযতনে
এই কলি যুগে ভূপ পালে প্রজাগণে।

এই ধরনের অসাধু কার্যকলাপ ও চাটুকারিতায় প্রলুব্ধ হয়ে সম্রাট আকবরের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে কালক্রমে যা তাঁকে নিকৃষ্টতম আত্ম-প্রতারণার দিকে ধাবিত করে। একদিকে দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট অলি, আওলিয়া, ফকিহ্ আলেমদের হীন ও ঘৃণ্য বিরোধপূর্ণ আচরণ; অন্যদিকে হিন্দু জনসাধারণ, রাজপুত, পণ্ডিত

www.pathagar.com

ও পুরোহিত কর্তৃক ঈশ্বরের অবতার ও ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা অর্পণ– এই সমস্ত পারিপার্শ্বিকতায় বিভ্রান্ত সম্রাটের আর কী-ই বা করার ছিল। তাই তো দেখা যায়, মুসলিম ভারতের সমাজ জীবনের বহিরাঙ্গে যে নির্জীবতা ও রুগ্ন অবস্থা বিরাজমান ছিল, সম্রাটের কাছে যা মৃত্যু লক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল তাতে তিনি শেষ পেরেকটিও ঠুঁকে দিলেন।

অমুসলিম ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে আকবরকে মোঘল ডাইনেস্টির সবচাইতে সফল ও দীর্ঘস্থায়ী মোঘল শাসক হিসাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ইসলামবিরোধী একটি সংঘবদ্ধ চক্রের প্ররোচনায় আকবর অতিমাত্রায় প্রলুব্ধ হয়ে পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের মাঝে বিভেদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে তৎপর ছিলেন। সেই সময়ে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মহীন রাজনীতির লালন ও চর্চার প্রভাবে ইসলামী মূল্যবোধের লালন ও বিকাশ দুরূহ হয়ে পড়ায় দুনিয়াদার আলেমদের রাজা-বাদশাহ বা আমীর-উমরাদের নৈকট্যলাভ ও সন্তুষ্টি লাভ করার অভিলাষ, সভাসদ বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পার্থিব সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতার ফলে ঐশী জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের চরম বিকৃতি সাধন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামের এমনি এক বৈরী পরিবেশে একদা জুমআর নামাজে সম্রাটের আগমন উপলক্ষে ফতেহপুর সিক্রি জামে মসজিদটি সুসজ্জিত করা হয়। সম্রাট তাঁর জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার বাস্তব রূপদানকল্পে আগমন করলে সভাসদ, রাজভৃত্য, আশ্রিতজন ও চাটুকাররা মুসল্লির ছদ্মবেশে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। সম্রাট কর্তৃক মসজিদের মিম্বর হতে খুতবার জন্য রাজকবি ফৈজী কর্তৃক নিম্নরূপ একটি শ্লোক পূর্বেই রচনা করা হয়েছিল :

"প্রভু মোরে করেছেন রাজ্য অধিপতি
দিয়েছেন জ্ঞান আর সাহস শক্তি
সত্য আর ভালবাসা দিয়েছেন বুকে
তিনিই দিশারী মোর ন্যয়ে ভুলে চুকে
হেন ভাষা নাই করি তাঁর গুণগান
আল্লাহ আকবর সেই আল্লাহ মহান।"

আত্ম প্রবঞ্চিত সম্রাট মোসাহেব ভক্ত অনুরক্তদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে যথারীতি মিম্বারে আরোহণ করলেও উপরোক্ত শ্লোকের প্রথম তিন লাইন উচ্চারণ করার পরপরই মহাপরাক্রমশালী এই ধর্মদ্রোহীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে পড়ল এবং তিনি মিম্বর ত্যাগ করলেন। পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই যে, শ্লোকের শেষ তিন ছত্রে সম্রাট নিজকে আল্লাহ্‌র একজন 'অবতার' হিসেবে দাবি করার পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে। তখন ফতেহপুর সিক্রিতে তাঁর এই ভ্রান্ত

www.pathagar.com

দাবির প্রতিবাদ করার মতো একজন মুসল্লীর অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং চাটুকার সভাসদ ও পণ্ডিত রাজন্যবর্গ তার বক্তব্যের স্বপক্ষে জনমত গঠন করেছেন। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর মসজিদ ও রাসূল (সা.)-এর মিম্বরের মর্যাদা এভাবেই রক্ষা করেছেন। **ঘটনাটি আকবরের গুণমুগ্ধ একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এভাবেই বর্ণনা করেছেন : "কিন্তু এই ঘটনায় যে ভাবাবেগের সঞ্চার হলো, দৃঢ়চিত্ত সম্রাট প্রবল শত্রুর মোকালিয়ও যে কখনও বিচলিত হননি, তাকে অভিভূত করল। যে হৃদয় সকল বিপদে শান্ত থাকত এখন তা দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল। যে কণ্ঠস্বর যুদ্ধের তুমুল হট্টনিনাদ ছাপিয়েও উর্ধ্বে শ্রুত হতো, এক্ষণে তা বালিকার কণ্ঠের ন্যায় ভেঙে পড়ল। প্রথম তিন ছত্র উচ্চারণ করার পূর্বেই সেই উচ্চ মঞ্চ হতে আকবরকে নেমে আসতে হলো।"** [টার্ক্স ইন ইন্ডিয়া, ৬৯ পৃষ্ঠা]

ইতিহাসে যতদূর জানা যায়, সম্রাট আকবর উত্তরাধিকারসূত্রে মুসলিম শাসক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বরং বিজাতীয় মুণি-ঋষিদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে তিনি মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার চাণক্য নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক শক্তিকে খর্ব করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে সুসংগঠিত করার পরিবর্তে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার পথকে বেছে নিয়েছিলেন। মডার্ন ইন্ডিয়া হিস্টরীর ৬১নং পৃষ্ঠায় এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে– "ইহা একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, সম্রাট আকবর ভারতের পাঠান শক্তি তথা ভারতের তদানীন্তন দুর্ধর্ষ সামরিক জাতির ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। যদি দেখা যাইত যে, এই বিধ্বস্ত সামরিক জাতির স্থান গ্রহণ করার জন্য তিনি আর একটি মোছলেম সামরিক জাতি গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে রাজনৈতিক উপযোগিতার অজুহাতেও অন্তত তাহার এই অপকর্মকে ক্ষমা করা যাইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাহার পরিবর্তে সম্রাট আকবর শঠতাপূর্ণ কূটনীতি ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে মোছলেম ভারতের সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা গোড়াতেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন।"

আকবরের জীবন ও রাজত্ব

আকবরের জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আকবরের পিতা হুমায়ুন শেরশাহ আফগানীর কাছে পরাজিত হয়ে যখন পলাতকরূপে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করছিলেন তখন হিজরী ৯৪৯ মোতাবেক ১৫৪২ খ্রি. আকবর জন্মগ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। পরবর্তীতে শেরশাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। সেই সময় বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায় যেমন শিয়া, সুন্নী, রাফেজী, খারেজী মতবাদের অনুসারীদের মাঝে কোনো প্রকার সদ্ভাব বা সৌজন্যমূলক সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল না। তাদের দলীয়-উপদলীয় কোন্দলের ফলে মাঝে মাঝে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এই ধরনের উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রাণকেন্দ্র ছিল ইরান। অন্যদিকে, প্রজাদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই ভাগই হিন্দু ছিল যাদের প্রভাব এড়িয়ে রাজ্য পরিচালনা করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আকবরের পিতা হুমায়ুন মুসলমানিত্বের চেতনাকে বিসর্জন না দিয়ে অসামান্য প্রজ্ঞা ও কৌশল দিয়ে আফগানদের কাছ থেকে সিংহাসন পুনরুদ্ধারকালে তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। ১৫৫৬ সালে সম্রাট হুমায়ুনের ইন্তেকালের পর মাত্র ১৩ বছর বয়সে তদীয় পুত্র আকবর বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই আকবর রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তার সম্রাজ্য তিনটি প্রতিকূল শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল : আফগান শক্তি, ইসলামে বিভেদ সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক শক্তি ও পৌত্তলিক সম্প্রদায় তথা হিন্দু শক্তি। এই তিনটি প্রতিকূল শক্তির মাঝখানে নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য পরিচালনা করা দুরূহ ভেবে সম্রাট আকবর গদী সংরক্ষণের জন্য বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিন্দুদের মন রক্ষাকে সহজতর মনে করেছিলেন এবং হক্কপন্থী সুন্নী মুসলমানদের বাদ দিয়ে মুসলিম নামধারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। তদুপরি, শাহী দরবারে মোল্লা মোবারক নাগুরির পুত্রদ্বয় আবুল ফজল ও ফৈজীর ফিতনা ও তাদের ঐক্যবিনাশী বিতর্কিত কর্মকাণ্ড; দুনিয়াদার আলেম ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের মাঝে জাগতিক লোভ-লালসা চরিতার্থ করার প্রতিযোগিতা অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় তাদের প্রতি সম্রাট আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। সেই সুযোগে ভিন্নধর্মাবলম্বী কিছু পুরোহিত-মুণী-ঋষিদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিরক্ষর সম্রাটের উপর এতোটাই প্রভাব ফেলেছিল যে, তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে বুঝে না বুঝে 'দীনে এলাহী' নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন ইসলামবিরোধী মতবাদ প্রবর্তন করেন।

দীর্ঘ প্রায় ষাট বছর রাজত্ব করার পর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আকবর মারা যান। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরের কোনো ইতিহাস জানা যায়নি। পরোক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে যতদূর জানা যায় তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর কতিপয় বিয়োগান্তক ঘটনা এবং দীর্ঘকাল ধরে অন্তরে লালন করা পরিকল্পনা চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় জীবন সায়াহ্নে নির্মম অনুশোচনার আগুনে দগ্ধিত হচ্ছিলেন। মাতুলপক্ষীয় আত্মীয়-স্বজনের রাজনৈতিক প্ররোচনায় আকবরের বিরুদ্ধে পুত্র জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহ ঘোষণা, জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্তৃক তাঁর

www.pathagar.com

নতুন মতবাদ দীনে ইলাহীর দার্শনিক গুরু আবুল ফজলের আকস্মিক মৃত্যু, দীনে ইলাহী দীক্ষিত একমাত্র হিন্দু রাজা মহেশদাস বা বীরবলের আফগানদের হাতে শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যুবরণ সর্বোপরি ইসলামের প্রতি তার আজন্ম বিরোধিতা ও বিদ্রোহ তাঁর অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল, যা তাঁর মনের সকল শান্তি হরণ করে নেয় এবং তাঁর জীবনকে অত্যন্ত দুঃখময় করে তোলে। যেসব ঐতিহাসিক মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ইসলামে ফিরে আসার দাবি করে থাকেন তাদের দাবির প্রতি ভিন্নমত রয়েছে।

দ্বীনে ইলাহী প্রবর্তনে সম্রাট আকবরের উপর ইরানের অগ্নি উপাসকদের প্রভাব

দ্বীনে ইলাহীর বিভিন্ন ধারা-উপধারা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটা ইরানের বিভিন্ন অনৈসলামী কর্মকাণ্ডের রীতিনীতি থেকে উদ্ভূত একটি জঘন্য ইসলামবিরোধী মতবাদ। হিজরী নবম শতাব্দীর শেষভাগে ও দশম হিজরীর প্রথমভাগে ইরানে নকতী মতবাদের চরম বিকাশ ঘটে। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ পাছিখুয়ানী। নকতীরা ইসলামের মৌলিক আকীদা ও শরীয়্যাহকে অস্বীকারপূর্বক উপহাস করতো, পাশাপাশি কোরআনকে নবীর সৃষ্টি বলে প্রচার করতো। ফলে, ইসলামী শিক্ষা ও অনুশাসন সংকুচিত হয়ে মাহমুদের 'নকতী' মতবাদ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। হিজরী দশম শতাব্দীতে শেখ সফিউদ্দীন নামে একজন প্রতিক্রিয়াশীল শিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে 'সাফাভী' সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এরই ধারাবাহিকতায় সাফাভী সম্রাজ্যের অধীনে ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপক সংহার কার্য সম্পন্ন করা হয়। পাশাপাশি নকতী আন্দোলনকে বেআইনি ঘোষণা করে বিপুল সংখ্যক নকতীকে হত্যা করা হয়। এমতাবস্থায় নকতী বুদ্ধিজীবীরা পলায়নপূর্বক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মোঘল সম্রাজ্যের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকে। অবশেষে সম্রাট আকবরের সভাসদ ও পণ্ডিতচক্র নকতী মতবাদকে নবরূপে দ্বীনে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠা করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। **ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়ুনীর মতে, "সম্রাট আকবরের নতুন ধর্ম দ্বীনে ইলাহীর দার্শনিক গুরু আবুল ফজল, ফৈজী ও তাদের পিতা মোবারক নাগুরী আসলে 'নকতী' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কৌশলে তারা নকতীদের মূলনীতিগুলো দ্বীনে ইলাহীতে সংযুক্ত করেছেন।"** যে ইরানের ময়দানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসলামী আদর্শের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে অভূতপূর্ব খিদমত লালিত হয়েছে, যে মাটি ইমাম গাজ্জালী, শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি, আবদুর রহমান জামী, হযরত আবদুল কাদের জিলানী, হযরত শেখ সেহাবউদ্দীন

www.pathagar.com

সরোয়ার্দী, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, খাজা কুতুবুদ্দীন বকতিয়ার কাকী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম ইবনে মাযা, ইমাম নিসাঈসহ অসংখ্য যুগান্তকারী মনীষীর জন্ম দিয়েছে সেই ইরানে সাফাভী সম্রাজ্যের 'শিয়াবাদ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইলমে হাদীস, ইলমে ফিক্বাহ্সহ সকল প্রকার কোরআনী বিধানকে সমূলে উৎপাটন করতে সব ধরনের অপচেষ্টা চালানো হয়।

সম্রাট আকবরের শাসনকাল : শক-হুন শাসনামলে
আর্য-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দ্বারা অনুসৃত 'তিন প্রজন্ম প্রকল্প'

ইতিহাসবিস্মৃত জাতি হিসেবে আমরা হয়তোবা ভুলে গিয়েছি যে, আকবরের সময়ে প্রাচীন ভারতের শক-হুন শাসনামলে আর্য-ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দ্বারা অনুসৃত 'তিন প্রজন্ম প্রকল্প' পুনঃবাস্তবায়নের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. মুহাম্মাদ ফজলুল হকের ভাষায়, 'নাবালক অশিক্ষিত সম্রাটকে রাজা মহারাজারা রাজপুতনী হেরেম বালাদের মাধ্যমে ত্বরিৎ তালিম দিয়ে উঠতি যৌবনেই আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেন'। ফলে সম্রাট আকবর গোমরাহীতে এতো অধিক পরিমাণে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন যে, ইসলাম ও মুসলমানদের তাহজীব-তমুদ্দুন বিনাশী নীল-নকশা বাস্তবায়নের বীজ তার হাতেই অংকুরিত হয়েছিল। প্রকল্পটি নিম্নরূপ : প্রথম প্রজন্মে একজন ১০০% মুসলমান পুরুষের সাথে ১০০% হিন্দু রমণীর বিয়েতে যে শংকর জন্ম নেবে সে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ৫০% মুসলমান ও ৫০% হিন্দু ধর্মের অনুসারী হবে। দ্বিতীয় প্রজন্মে একজন ৫০% মুসলমান পুরুষের সাথে একজন ১০০% হিন্দু রমণীর বিয়েতে যে শংকর জন্ম নেবে সে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ১৭% মুসলমান ও ৮৩% হিন্দু ধর্মের অনুসারী হবে এবং তৃতীয় প্রজন্মে প্রথম প্রজন্মের একজন ১৭% মুসলমান পুরুষের সাথে একজন ১০০% হিন্দু রমণীর বিয়েতে যে শংকর জন্ম নেবে সে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ৭% মুসলমান ও ৯৩% হিন্দু ধর্মের অনুসারী হবে অর্থাৎ তৃতীয় প্রজন্মে ঐ ব্যক্তির জীবনধারা থেকে মুসলমানিত্ব প্রায় বিদায় নেবে। ইতিহাসে আকবরের অন্ততঃ দু'জন হিন্দু স্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যায় : তাদের একজন রাজা বিহারীর কন্যা ও রাজা ভগবান দাসের বোন, অন্যজন যোধপুরের রাণী 'যোধবাঈ' যিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের মাতা। সম্রাটের উপর হিন্দু বেগম ও তাদের আত্মীয় স্বজনদের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের প্ররোচনায় সম্রাট আকবর কর্তৃক দিল্লীশ্বর-জগদীশ্বর পদবী গ্রহণ করা, বেশ্যাবৃত্তি ও অবাধ যৌনাচারের অনুমোদন দেয়া, মসজিদ ধ্বংস করা ও মন্দিরের প্রসার ঘটানো, গরু জবাই নিষিদ্ধকরণ, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা, সুদ-জুয়া-শরাবকে হালাল

www.pathagar.com

ঘোষণা করা, সূর্যোপসনা-অগ্নিপূজা-মুর্তিপূজার অবাধ সুযোগ দেয়া, সালাম প্রথার রহিতকরণ ও ধর্মীয় শিক্ষার সংকোচন করা হয়েছিল। এসবই করা হয়েছিল 'তিন প্রজন্ম প্রকল্প' বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্বশূন্য করার লক্ষ্যে ইসলামের দুশমনেরা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে এবং এর অংশ হিসেবে একের পর এক এ ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আমরা তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনছি। 'তিন প্রজন্ম প্রকল্প' আজ মহীরূহ আকার লাভ করায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ চরম সন্ধিক্ষণে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রবল আকর্ষণ ও ভিন্নধর্মীয় জীবনসঙ্গী বেছে নেয়ার পেছনে এই নীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মনে হচ্ছে এদেশের সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলিম রাজনৈতিক পরিবারের ভবিষ্যৎ কর্ণধারগণ পাশ্চাত্য জীবন পদ্ধতি ও বিজাতীয় জীবনসঙ্গিনী বেছে নেয়ার ফলে বাংলাদেশ রাজনৈতিক নেতৃত্বশূন্যতায় পড়তে পারে। আমার অত্যন্ত আপনজন ঢাকা কলেজের অধ্যাপকের দুই কৃতী সন্তান বুয়েট থেকে স্কলারশিপ পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার পর প্রফেসর সাহেবকে অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে বিলাপ করতে দেখেছি যেমনটি দেখেছি– তাদের উপর্জিত কোনো অর্থ তিনি জীবদ্দশায় গ্রহণ করেননি। তাঁর আশংকা সত্য হয়েছিল– তার দু'সন্তানের কেউই আর মাতৃভূমির টানে স্বদেশে ফিরে আসেনি, পশ্চিমা রমণী বিয়ে করে মার্কিন মুলুকে সেটেলড হয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, স্কলারশিপের নামে আমাদের মেধাবী তরুণদের ইউরোপ আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করা হচ্ছে, ভোগবাদী জীবনব্যবস্থায় প্রলুব্ধ করে ইসলামী আচার আচরণ ও নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে পড়ায় তারা স্ব-ধর্মত্যাগ কিংবা স্বীয় ধর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরতেও দ্বিধা করছে না।

ভারতীয় সনাতনী ও পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতির অসহায় শিকার বাংলাদেশে আজ ঈমান আকীদা নিয়ে টিকে থাকাই বড় চ্যালেঞ্জ। মুসলিম জাতিসত্তার চেতনায় উজ্জীবিত ইসলামী তাহ্জীব-তমুদ্দুনকে বুকে ধারণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে আমরা যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম তখন অখণ্ড ভারতবর্ষের রক্ষার দোহাই দিয়ে বর্ণহিন্দুরা যেমন প্রকাশ্যে বিরোধিতায় নেমেছিল তেমনি তাতে শক্তিশালী সমর্থন যুগিয়েছিল ভারতবর্ষের মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশ। আরেকটি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল : পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ভাষার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে ভারতের সাথে রাখার দাবি করেছিলেন। কিন্তু শ্রী জওহরলাল নেহরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেলরা নাকচ করে দেয়ায় তা আর সম্ভব হয়নি। তখন পুরোপুরি না

www.pathagar.com

বুঝলেও পরিণত বয়সে বুঝতে পেরেছি যে, এই সিদ্ধান্তে জওহরলাল নেহরুর দূরদর্শী চিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি জানতেন ভারতবর্ষের সকল প্রকার আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে যে বাংলাকে ঘিরে, সেটা যদি ভারতের সাথে থেকে যায় তাহলে আন্দোলনের ঢেউ দিল্লীশ্বররা সামলাতে পারবেন না। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সম্মিলিত শক্তির শক্তির কাছে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতাও প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সাথে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেবরা একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েমের স্বপ্ন বাস্তব হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নচেৎ পৃথিবীর বৃহত্তম হিন্দু রাষ্ট্র ভারতের গোলামীর জিঞ্জির ও বেড়ী পায়ে শৃঙ্খলিত হয়ে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বাবুদের মতো নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করা ছাড়া উপায় ছিল না। ওপার বাংলার বাঙালি বাবুরা কথায় কথায় আমাদেরকে বাঙালি হবার উপদেশ দিয়ে থাকেন অথচ ভারতে বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতিসত্তা কিংবা পৃথক রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে এমন কোনো নজীর তাদের ইতিহাসে নেই। পৃথিবীর বৃহত্তম হিন্দু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তারা বদ্ধপরিকর, মুসলমানদের উদ্দেশ্যেই তাদের সকল কুপরামর্শ ও কুমন্ত্রণা।

ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র অংশীদার তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের সহযোগিতার মহৎ (!) উদ্দেশ্য বুঝতে না পারার মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় আজ আমাদের গুনতে হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে একমাত্র আলেমগণই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতের সাহায্য-সহযোগিতায় আমরা স্বাধীনতা অর্জন করলেও এতে ভারতের উদ্দেশ্যই সফল হবে। তাঁরা মনে করতেন যে, ভারত কোনো রকমে তাদের আজ্ঞাবহ একটি সরকার যদি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে অস্ত্র-যুদ্ধ ছাড়াই একটি রাষ্ট্রজয়ের বিরল ঘটনা ঘটবে। ফলে ভারত একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যবিধাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আমাদের মন্ত্রী বাহাদুররা হয়তো বলবেন 'ভারত আমাদের অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বন্ধু, তারা আমাদের কোনো প্রকার ক্ষতি করবেন না'। সিকিমের ইতিহাস আমাদের অজানা নয় কিন্তু নতুন প্রজন্ম হয়তো বা ভুলে গিয়ে থাকতে পারে যে, সিকিম নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন লেন্দুপ দর্জ্জি। প্রতিবেশী ভারতের লোলুপ দৃষ্টি বাংলাদেশের মতো অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উপর পূর্বেও ছিল এখনও আছে। লেন্দুপ দর্জ্জিরা আধিপত্যবাদী ভারতের শ্যেন দৃষ্টির ভার সইতে না পেরে সংসদে সর্বসম্মভাবে ভারতের সাথে একাত্মা হয়ে যাবার ঘোষণা দিল।

www.pathagar.com

পাকিস্তান থেকে আলাদা হবার পর আমরা দেখলাম এদেশের মাঠ-ঘাট-সাগর-বন্দর-নদী-খাল-বিল-পথ-প্রান্তর-বন-জঙ্গল সর্বত্র ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এমনকি আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ সংবিধানের বিভিন্ন ধারা উপধারাও ভারত থেকে আমদানি করা হলো। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের দোহাইয়ে সংবিধান থেকে ইসলামের পরিভাষাসমূহ প্রত্যাখ্যাত হলো। রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী দর্শনের বদলে ভোগবাদী ব্রাহ্মণ্য দর্শনকে স্থান দেয়া হলো। অতি উৎসাহী জনগণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করল 'এমনটি তো আমরা চাইনি'। আমি অশ্রু ভারাক্রান্ত ও বিস্মিত নয়নে অবলোকন করেছি চিরশত্রু ভারতের কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দৃশ্য। আমাদের স্ব-হস্তে গড়া ভ্রাতৃপ্রতিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা হয়তো অনেক বড় ভুল করেছিলেন তাই বলে কি ভারতের কাছে পরাজয়ের গ্লানি তাদের প্রাপ্য ছিল? মনটা ভেঙে খান খান হয়ে যায় এই ভেবে যে, ভারত কি ১৯৬৫ সালে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল? যুদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান, স্বাধীন হলো বাংলাদেশ অথচ বিজয়ী ভারত, বিজিত পাকিস্তান– এ কেমন আজব দৃশ্য। আমাদের সেনা কমান্ডার থাকতে কেন অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল তার অজনা ইতিহাস অনুসন্ধানে আমাদেরকে কারো দ্বারস্থ হতে হবে না। দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করলেই পেয়ে যাবেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ভারতের স্বার্থে, রাজনীতিবিদদের ভুলে পাকিস্তানীরা জাত-কূল না বুঝে ভাইয়ের উপর আক্রমণ করেছে আর আমরা জাত-কূল না বুঝে প্রতিশোধ নিতে ভারতের দ্বারস্থ হয়েছি। ভারত ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি, তারা সে মহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় ২৪টি বছর কাটিয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার সে সুযোগ তারা হাতছাড়া করবে কেন? ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। কৃতিত্ব ছিনিয়ে নেবার এমন সুযোগ ভারতের ইতিহাসে নেই বললেই চলে। সুযোগের সদ্ব্যবহার হলো, একটি গুলিও তাদের কামান থেকে বের হয়নি, কেউ প্রাণও দেননি অথচ তারাই বিজয়ী। যদিও আমরা সকলেই জানি যে, বাংলাদেশ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বরং নিরস্ত্র মানুষের উপর আঘাত এসেছে বাংলাদেশেই এবং সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ও রক্ত দিয়েছে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু কোনোভাবেই বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে না। আমার যতদূর মনে পড়ে, পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষও ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি, তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা একটু ভেবে দেখবেন কি কেন ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বকে ছিনতাই করেছিল এবং তিন দশক পরেও কেন

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বলেই অভিহিত করে থাকে? একটি জাতির সবচাইতে মূল্যবান ইতিহাস ছিনতাই হয়ে গেল তাই বলে কি আমাদের জাত কূল যাবে না কারণ তারা যে আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

আকবরের সময়ে নেয়া তিন প্রজন্ম প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা আগের মতো এখনও তৎপর আছে এবং তারা বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের জীবনাচারের বিপরীতে কর্মসূচি নিয়ে তা বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র কখনও থেমে থাকেনি বরং ষড়যন্ত্রের ধরন পাল্টেছে। তারা আমাদের সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে বেছে নিয়েছে। বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্ককে তারা নাম দিয়েছে 'লিভ টুগেদার'। একদা আমার এক ঘনিষ্ঠজন আমাকে প্রশ্ন করল হুজুর, **'বাংলাদেশ হংস সমিতি'র** নাম শুনেছেন কী? আমি এ ধরনের কোনো সমিতির নাম না শোনার কথা জানালে তিনি জানালেন যেসব ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পুরুষ ও মহিলা স্ব-স্ব ধর্ম পালনে বিশ্বাসী কিন্তু বিবাহসূত্র স্থাপন করেছে তারা নাকি হংস সমিতির সদস্যপদ লাভের যোগ্য। তিনি কিছু নামও উল্লেখ করলেন যারা এ সমিতির সদস্য যেমন রামেন্দু-ফেরদৌসী মজুমদার, কবি সুফিয়া কামালের কন্যা সুলতানা কামাল-চক্রবর্ত্তী প্রমুখ। তারা মানবাধিকার, সংখ্যালঘু ইস্যু, কর্মজীবী নারী ও নারী স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও প্রগতির দোহাই দিয়ে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর পক্ষে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ধর্মকে শুধুমাত্র তাদের লাগামহীন জীবনাচারের প্রতিবন্ধকতা হিসেবেই মনে করে থাকে। তাদের কাছে লিভ টুগেদার কিংবা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক কোনো বিষয় নয় বরং অপসংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে আকৃষ্ট করে যুবসমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। এই চানক্য নীতির প্রভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব বিজাতীয় সংস্কৃতিতে এতো অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে যে স্ব-ধর্ম, রাষ্ট্র ও বাসিন্দাদের স্বার্থ তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। এসব কুচক্রী আমাদেরকে নারীকেন্দ্রিক বৈদিক সভ্যতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা ভালো করেই জানে যে, নৈতিকভাবে উজ্জীবিত মুসলিম উম্মাহর সামনে যত বড় বাধাই আসুক না কেন তারা তা অতিক্রম করবেই। তাই মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে চরিত্র হনন করে হোক কিংবা কৌশলে অপকর্মে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে হোক নৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে তাদের অপতৎপরতা পূর্বের চাইতে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বীনে ইলাহীর মাধ্যমে সম্রাট ইসলামী জীবন বিধানের পরিবর্তে জাহেলিয়াতকেই বেছে নিয়েছিলেন

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, অজ্ঞতার

www.pathagar.com

অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজপতি বা রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী ক্ষমতার মোহে মহান প্রতিপালকের আনুগত্য ও দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলেন না, জনগণের ভাল-মন্দের বিধায়ক সেজে বসেছিলেন। তাই তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধানের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বা মহান প্রভুর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্যকে মেনে নিতে বার বার অস্বীকার করেছে। ক্ষমতার মসনদকে দীর্ঘস্থায়ী ও নির্বিঘ্ন করতে ভিন্নমতাবলম্বী কিছু ব্যক্তির সহিত যোগসাজশে সুযোগসন্ধানী সম্রাট স্বীয় মনগড়া মতবাদ 'দীনে ইলাহী' জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন যা মূলতঃ তৎকালীন ইসলামবিরোধী শক্তির দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই ফসল। এই ধরনের মতবাদ প্রবর্তনের মাধ্যমে আকবর উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছেন যার কুপ্রভাব আজও আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুয়্যৎ লাভের পূর্বের সময়কাল 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' বা বর্বর যুগ হিসেবে চিহ্নিত। সেই বর্বরতার যুগে ঐশী জ্ঞানের অনুশীলন না থাকায় মানুষ পূর্ব পুরুষদের মাঝে প্রচলিত নানা ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার, অহেতুক আন্দাজ-অনুমান এবং কামনা-বাসনার ভিত্তিতেই জীবন পরিচালনার পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছিল। স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাগুলোকে সিজদা করা, প্রতিমাগুলোকে উপলক্ষ করে উট ও ভেড়া-ছাগল উৎসর্গ করা, উৎসর্গকৃত পশুর রক্তে দেয়ালে চিত্রাঙ্কন করা, কাবা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় হাততালি ও শিস দেয়া, মেলা-পার্বন ও রং-তামাশা করার মতো সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর ইবাদাত তারা জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে পালন করতো। নারীদেরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো, কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। জীবনের বৃহত্তর পরিসরে ধর্মহীনতা এবং অনাচার পাপাচারের অবাধ প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল যেমন– লুট, হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান, সুদী কারবারসহ বিভিন্ন প্রকার গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকতো। ধর্মের জাহেলী ধারণা তাদের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং ধর্মকে জীবনের একটি অতিরিক্ত অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত ছিল। সেসব প্রথাগত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মানবতার মহান বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) নৈতিকতাভিত্তিক একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আগে একটি সংঘবদ্ধ দল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাঁরা ওহীভিত্তিক জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে মহানবী (সা.)কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আসহাবে রাসূলের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা তাওহীদের চেতনায়

www.pathagar.com

উজ্জীবিত হয়ে রাসূলের রঙে নিজদেরকে রঙিন করে সকলপ্রকার মানবীয় গুণাবলী অর্জন করেছিলেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল প্রকার ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সৎকাজে সহযোগিতা ও অসৎ কাজের মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। পরশ পাথরের সংস্পর্শে লোহা যেমন সোনায় পরিণত হয় তেমনি অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিও মহানবী (সা.)-এর সংস্পর্শে এসে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছিলেন। কোরআন ও সুন্নাহ সার্বজনীন এবং এর মৌলিক শিক্ষাই হলো মুসলিম জাতিসত্তার চেতনা বাস্তবায়ন করা। মূল কথা তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামের দাবি যেখানে থাকবে না কালো-ধলা, আরব-অনারব, ধনী-গরীব ও আশরাফ-আতরাফের কোনো ভেদাভেদ।

নিগূঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে আলোর পথ দেখাতে সত্যের সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার মতো সুযোগ্য নেতৃত্ব ও জনশক্তি গঠনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে মডেল আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাতে সমগ্র মানবের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী। অথচ সে প্রক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে আকবর সার্বজনীন মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হবার এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হবার খোঁড়া অজুহাতে তার রাষ্ট্র সীমানার সকল হাক্কানী আলেমের মতামতকে উপেক্ষা করেছিলেন। সম্রাট আকবরের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে আমরা স্ববিরোধিতা ও বিপরীতমুখিতা দেখেছি। একজন মুসলিম শাসক হয়েও তার পিতা প্রবর্তিত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা রহিত করে হাক্কানী আলেমগণের উপর যে অমানবিক নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছিলেন তাতে অনেকে দেশান্তর হতেও বাধ্য হয়েছিলেন। তাই আজ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'দীনে ইলাহী' প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্রাট আকবর জাহেলিয়াতকে বেছে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক স্মিথের ভাষায়,

"দ্বীন ই ইলাহী আকবরের ভুলের স্মৃতিস্তম্ভ, জ্ঞানের নয়। এই ধর্ম বিশ্বাস হাস্যকর, অহংকারের কিংবা অসংযত স্বৈরাচারের পৈশাচিক বিকাশ।" বাদায়ুনীর মতে, "দ্বীন ই ইলাহী প্রবর্তনের পর বাদশাহ আকবর ইসলামবিরোধী আইন প্রবর্তন করেন। হিন্দু অমাত্যবর্গ আকবরের দিল-দেমাগের উপর এমনই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, সেই সময়ে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা একেবারেই খর্ব ও বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন-কানুন জারি করতে লাগল। মুশরিকরা অবাধে ও নির্ভীকচিত্তে মসজিদসমূহ ধ্বংস করে মন্দির নির্মাণ করত। মুসলমানদেরকে ইসলামী হুকুম-আহকাম পালন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিধি-নিষেধ জারি করা হতো।"

ঐতিহাসিক হেগের ভাষায়, "দ্বীন ই ইলাহী প্রবর্তনের পরবর্তীকালে

www.pathagar.com

আকবর ইসলামের সঠিক অনুসারীদের নির্যাতিত করেন এবং মুসলমানদের উপাসনালয়গুলি ধ্বংস করেন।"

Encyclopedia Britannica-য় আকবরের এই হাস্যকর ধর্ম সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে "এই অদ্ভূত ধর্মের পয়গম্বর ছিলেন বাদশাহ্ আকবর স্বয়ং। প্রতিদিন প্রত্যুষে তিনি সমগ্র বিশ্ব উজ্জীবনকারী পরমাত্মার প্রতীকিরূপী সূর্যের পূজা করিতেন। অপরপক্ষে তিনি নিজে অগণিত মূঢ় নর-নারী কর্তৃক পূজিত হইতেন।" [ভারতের শিল্পকলা : ১৪শ' সংস্করণ]

তবে একথাটিও আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিভিন্ন দল-উপদলের বিভেদ ও দুনিয়াদার আলেমদের জাগতিক লোভ-লালসা চরিতার্থ করার ফেতনা নিরক্ষর সম্রাটের নৈতিক অধঃপতনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। মুসলিম বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক কোন্দল-বিভেদ, হানাহানি ও দলাদলির রাজনীতিতে সম্রাট যারপরনাই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন যদিও সম্রাট প্রথম জীবনে উলামা ও নেক ব্যক্তিদের সাহচর্য উপভোগ করতেন। এমনকি শায়খ সলীম চিশতী (রহ.) এর সাহচর্য পেতে সম্রাট ফতেহপুর সিক্রিতে রাজধানীও তৈরি করেন। জুমআর দিবসে সম্রাটের ব্যবস্থাপনায় উলামাগণের মজলিশ বসত এবং ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো। আকবরের জীবনের সবচাইতে বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে একজন খাঁটি মুসলিম হিসেবে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেও মোঘল সম্রাজ্যের সবচাইতে সফল ও দীর্ঘস্থায়ী এই শাসক কিভাবে 'সিরাতুল মুসতাকিম' থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। মাহফিলে উপস্থিত আলেমগণের খেদমতে বাদশাহ্ প্রচুর সম্মানী দিতেন। ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়ুনীর মতে,

"বাদশাহ্ উত্তম রত্ন সদৃশ ছিলেন। তিনি সত্যের অনুসন্ধানকারী ছিলেন এবং তার বুলন্দ খেয়াল ছিল অতিশয় উচ্চ স্তরের, যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন নিরক্ষর।"

"বাদশাহ উলামাগণের পরস্পর মতানৈক্যের কারণেই ইসলাম ধর্মের সঠিক প্রচার ও প্রসারে আস্থা হারিয়ে ফেলেন, কেননা তাঁরা একই বিষয় সম্পর্কে একজন হালাল বললে অন্যজন কোনো না কোনো অজুহাতে সেটাকে হারাম বলে প্রতিপন্ন করত। এর মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক ব্যক্তি ছিলেন– মোল্লা মোবারক নাগুরী ও তার দুই পুত্র– আবুল ফজল ও ফৈজী। এই মোল্লা সাহেব ছিলেন একজন বড় আলেম এবং সর্ববিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি চার মাযহাবের মতভেদ ওয়াকেফ হবার পর মুকাল্লেদ হয়ে যান।... তাঁর পুত্র আবুল ফজলের মতে, তিনি মালেকী, শাফেয়ী, হানাফী,

www.pathagar.com

হাম্বলী ও ইমামিয়া মাযহাবের নীতির সবকিছু শিক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ইজতিহাদকারী বনে যান।"

সম্রাট আকবরের সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব ছিল না। কারো কারো যোগ্যতা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত হলেও তারা তাদের পাণ্ডিত্যকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করতেন। রাজদরবারের সভাসদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রাজাকে খোদার অবতার রূপে পেশ করতেও দ্বিধা করতেন না। সরকারি গেজেটে ও নথিপত্রে প্রাপ্ত উপাধিসমূহ 'হযরত সুলতান, কাহাফুল আনাম, আমিরুল মু'মিনিন, জেল্লুল্লাহ্ আলাল আলামিন, আবুল ফাতাহ জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর, বাদশা গাজী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পার্থিব চাকচিক্যে মোহাবিষ্ট কিছু আলেম নামধারী ব্যক্তিবর্গের রাজকীয় সম্মান লাভের প্রতিযোগিতা বহুগুণে বেড়ে যাওয়ায় সর্বনাশের যে সূচনা হয়েছিল ক্রমবর্ধমান আত্মকলহের প্রচণ্ডতায় মুসলিম উম্মাহর ভিত্তিকে দুর্বল করে আল্লাহ্র একক কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল। শাহী দরবারের প্রিয়পাত্র হবার মানসে অনেক মুসলিম পণ্ডিত, আলেম ও বুদ্ধিজীবী নানারকম অশোভন, অযৌক্তিক কার্যাবলী প্রদর্শন করতেও দ্বিধা করত না। প্রথমদিকে সম্রাট তা দেখেও না দেখার ভান করতেন। কিন্তু তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিবাদ-বিসম্বাদ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে, তারা একে অন্যকে গোমরাহ ও কাফের বলে আখ্যা দিতে থাকে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়ুনি বলেন :

বিভিন্ন ধর্ম ও মতের দু'চারজন পণ্ডিত, পুরোহিত, সাধু, সন্ন্যাসী নিয়ে সভানুষ্ঠান ও তাদের সাথে ধর্মালোচনা তার অন্যতম রাজনৈতিক আচারে পরিণত হয়েছিল। এতেও তার প্রবর্তিত নতুন ফেতনা "দীনে ইলাহী"র আশাতীত সাড়া না পেয়ে শয়তানী খেয়ালের সাহায্যকারী সভাসদবৃন্দকে ডেকে পাঠালেন। মুসলিম নামধারী কতিপয় পণ্ডিত তাকে পরামর্শ দিল যে তিনি যদি গবেষণামূলক নতুন বিধি-বিধান জারি তথা ইজতিহাদ বা মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগ করতে সক্ষম হন তাহলে সকল মত ও ধর্মের অনুসারীরা তা একবাক্যে মেনে নিবে। আকবর যে ইজতিহাদের যোগ্য ব্যক্তি আলেমদের কাছ থেকে সে বিষয়ে ফতোয়া আদায় করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় এবং তদানুযায়ী মোল্লা মোবারক নাগুরী তদীয় সুযোগ্য পুত্রদ্বয় আবুল ফজল এবং ফৈজী– তিন কুচক্রী মিলে ইজতিহাদ করার একটি সনদ রচনা করে, যা ইতিহাসে 'মাহ্যারনামা' নামে খ্যাত। বস্তুতপক্ষে বাইয়াতনামার মাধ্যমে কোরআন, হাদীসসহ ইসলামী ধর্মগ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ভাষ্যদান এবং সমস্ত ধর্মগ্রন্থের নামে চূড়ান্ত মত প্রকাশ ও রায়দানের সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় অগ্নি ও সূর্যের উপাসক,

www.pathagar.com

আরবী হরফের পরিচয়-জ্ঞানহীন অশিক্ষিত এবং স্বয়ং দেবতাজ্ঞানে পূজিত একজন মদ্যপ ও লম্পট সম্রাটের হস্তে। যতদূর জানা যায়, দরবারের ১৮ জন সদস্য উক্ত বাইয়াতে স্বাক্ষর করেন, একমাত্র বীরবল ছাড়া যাদের সকলেই ছিলেন মুসলমান। ডাকাতের হাতে তলোয়ার দিলে তার পরিণাম যা হয় মূর্খ আকবরের হাতে সনদ তুলে দেওয়ায় তার স্বেচ্ছাচারিতা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। এই সনদে সমর্থন দিতে অনীহা প্রকাশ করায় হক্কানী আলেমদের উপর সীমাহীন নির্যাতন ও অত্যাচারের মাধ্যমে দস্তখত আদায় করা হয়েছিল। ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদী স্পষ্টবাদী হক্কানী আলেমদের কাউকে কাউকে বন্দী এবং কাউকে নির্বাসনে পাঠানো হলো। ঐতিহাসিক ব্ল্যাকম্যানের 'আইন-ই-আকবরী' ১৮৬নং পৃষ্ঠায় বাইয়াতনামাটি অবিকৃত অবস্থায় আছে। বাইয়াতনামায় শ্রুতিমধুর ধর্মকথা ও বাক্য বিন্যাসের আবরণে সম্রাট আকবর ও ধর্মদ্রোহী উপদেষ্টাগণ ইসলামের মর্মমূলে ছুরিকাঘাত করতে দ্বিধা করেননি।

ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভের পর সম্রাটের এই ঔদ্ধত্য দিন দিন বেড়েই চললো। আল-কোরআন ও রাসুলুল্লাহ্ (স.)-এর সুন্নাহর প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করেই তিনি ক্ষ্যান্ত হননি বরং কুরআন ও হাদীসকে অযৌক্তিক-অবৈজ্ঞানিক, ওহীকে বেদুইন সর্দারের মনগড়া প্রতারণা এবং আমাদের আদর্শ নেতা, সর্দারে দু'জাহান আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর রিসালাতকে প্রহসন বলতেও দ্বিধা করেনি (নাউজুবিল্লাহ্)।

সম্রাট আকবর হিন্দু মুণী-ঋষিদের প্ররোচনায় ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনগড়া উদ্ভট কুফরী মতবাদ, তন্ত্র-মন্ত্রের প্রচার-প্রসারে যেমন ভূমিকা রাখতেন তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবে একের পর এক ইসলামবিরোধী ফরমান জারি করতেন। হিন্দু চানক্য শক্তির সাথে সম্রাটের এই দহরম-মহরম প্রকৃত মুসলমানগণ সহজে মেনে নেয়ার চাইতে নির্বাসনকেই বেছে নিয়েছিলেন। তার ইসলামবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বাংলা ও বিহারের নিরূপায় মুসলমানগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং উপমহাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে হাক্কানী আলেমগণের শরণাপন্ন হন। জৈনপুরের মোল্লা মোহাম্মদ ইয়াজদী তখন একটি ফতোয়া জারি করেন, যা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক Vincent A. Smith, Akber the Great Moghul গ্রন্থে যে উদ্ধৃতি দেন তা নিম্নরূপ :

"Early in 1580 A.D Mullah Mohammad Yazdi, a theologian converse with ventured to issue a formal ruling (Fatwa) in his capacity as Kazi of Jaunpur, that rebellion against the innovating emperor was lawful." (১৫৮০ সালের

www.pathagar.com

প্রারম্ভে জৈনপুরের কাযী মোল্লা মোহাম্মদ ইয়াজদী তার এলাকায় বিধান জারি করেন যে, সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা মুসলমানগণের পক্ষে আইনসঙ্গত কারণ তার বিধিসমূহ ভারতবর্ষে ইসলামের মৌলিক অস্তিত্বের অনিষ্ট সাধনের সূচনা করেছে)।

আকবরের এসকল অপকর্মের একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হযরত মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (রহ.) আকবরের সময়কালকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উপমহাদেশে ইসলামবিরোধী আইন-কানুন বাস্তবায়ন করার সময়কাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "আকবর রাষ্ট্রীয়ভাবে দারুল ইসলামে (হিন্দুস্তানে) কুফরী হুকুম আহকাম জারি করতো এবং মুসলমানরা ইসলামী হুকুম আহকাম জারি করতে অক্ষম ছিল। মুসলমানরা এরূপ করলে তাদেরকে হত্যা করা হতো। বড়ই আফসোসের বিষয় এই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনয়নকারীগণকে বেইজ্জতী ও অপদস্ত হতে হতো এবং অবিশ্বাসীরা রাজকীয় সম্মানী লাভ করতো ও আস্থাভাজন ছিল। মুসলমানরা আহত হৃদয়ে ইসলামের জন্য মাতম করতো, শত্রুরা হাসি তামাশা করে তাদের জখমের উপর লবণ ছিটিয়ে দিতো।"

মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিভাজিত ও সংকুচিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে যত প্রকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রচলিত ছিল তার সবই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি কোরআনী ভাষা আরবীকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে আরবী বর্ণমালার যেসকল বর্ণ শুধু আরবীতে আছে– অন্য ভাষায় নেই, সেগুলোকে দৈনন্দিন কথা-বার্তা থেকে অপসারিত করা হয়। যে সকল আলেম ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রের উন্নতমানের পুস্তকাদির অধ্যাপনা করতেন তাদেরকে একশত বিঘা জমির জায়গীর দেয়ার প্রচলিত প্রথাকে রহিত করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে, বিজাতীয় সংস্কৃতির লালন, প্রচার ও প্রসারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা হতো।

মোল্লা বাদায়ুনীর ভাষায় :

"একদিন আকবর তার সভাসদদের উদ্দেশ্যে বলেন : প্রাচীন কালের হিন্দু মুণি-ঋষীদের রচিত বেদ-পুরাণগুলো নির্ভুল জ্ঞানের ভাণ্ডার।... সুতরাং এসব গ্রন্থের ফারসী তরজমা প্রকাশ করা গেলে আমাদের ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তি অর্জিত হবে।"

দ্বীনে ইলাহীর মূলমন্ত্রগুলো জানা থাকলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে বিভেদের অপসংস্কৃতি গড়ে তুলতে কিভাবে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে নস্যাৎ করা হয়েছিল :

- দীনে ইলাহীর মূলমন্ত্র ছিল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আকবর খলিফাতুল্লাহ।

www.pathagar.com

- হিন্দু চানক্য শক্তির নীল নকশা ও আবুল ফজলসহ অন্যান্য দুনিয়াদার আলেমদের যোগসাজশে এই মর্মে প্রচার করা হয় যে, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়াতের এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বিধায়, ইসলামী জীবন বিধানের কার্যকারিতা লোপ পেয়ে গেছে। তাই পাক কালেমা তাইয়্যেবায় মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (স.)-এর স্থলে আকবর খলিফাতুল্লাহ সংযোজন করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতেও দ্বিধা করেনি।
- আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহ্র রাসুল বলে স্বীকার করাটা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। দ্বীনে ইলাহী কবুলের জন্য একটি শপথনামা পাঠ করানো হতো :

  "আমি আন্তরিকভাবে বাপ দাদার কাছ থেকে প্রাপ্ত ইসলাম ত্যাগ করছি, সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহী কবুল করছি। এই দ্বীনের চার বুনিয়াদ– সম্পদ বিসর্জন, মর্যাদা ত্যাগ, দ্বীন ত্যাগ ও জীবন উৎসর্গকরণ কবুল করছি।"
- আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকৃতি না দিয়ে তদস্থলে সূর্য, নক্ষত্র, আগুন, পানি, বৃক্ষ, বানর, শূকর প্রভৃতির পূজা প্রবর্তন করা হয়েছিল। আকবর প্রত্যহ চারবার সূর্যের পূজা করতো। তাঁর চেহারা না দেখে পানাহার নিষিদ্ধ ছিল। পূজা অর্চনা শেষে যখন আকবর বেরিয়ে আসত নর-নারী নির্বিশেষে সকল ভক্তরা তাকে সেজদা করতো।
- গঙ্গাজল অতীব পবিত্র বিধায় বাদশাহ নিয়মিত ব্যবহার করতো। স্বল্পতা থাকলে সাধারণ পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতেন।
- হিন্দু ধর্মকে সনাতন ও সার্বজনীন ধর্ম বলা হতো এবং হিন্দুদেরকে তাওহীদপন্থী বলে উল্লেখ করা হতো। শূকরের গোস্তকে হালাল করা হয়।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে দাড়ি রাখা অবৈধ ঘোষিত হয়। চিত্রাংকন ও ছবি তোলাকে দ্বীনি কাজ বলে এসব অপকর্মে পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো।
- হিজরী সালকে ঘৃণা করা হতো এবং নতুন বাংলা সালের প্রবর্তন করা হয়। এই নতুন সালের প্রথম দিন ও শেষ দিনকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করা হতো। (বাংলাদেশে নব প্রচলিত ফিৎনা বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের নামে বৈশাখী অনুষ্ঠান ও চৈত্র সংক্রান্তি এর নবরূপ)
- রাসূলে পাক (সা.) ও তাঁর মিরাযকে বিদ্রূপ করা হতো। আকবর তার দরবারে যে সমস্ত লোকের নাম আহাম্মদ বা মোহাম্মদ ছিল তা পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখেন।
- আকবরের সময়ে কোরআনের ওহীর শিক্ষাকে অমার্জনীয় অপরাধ এবং কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার্থীগণকে মরদূদ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

হিদায়ার অধ্যাপকদের একশত বিঘা জমির জায়গীর দেয়ার প্রথা এবং প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কাজী নিয়োগের বিধান উচ্ছেদ করা হয়েছিল।

- এইমর্মে নির্দেশ জারি করা হয় যে, চিঠিপত্রের শিরোনামে আল্লাহ্‌র নামের সাথে আকবর সংযুক্ত করতে হবে, চেলারা একে অন্যের সাথে সাক্ষাতে সালাম এর পরিবর্তে আল্লাহু আকবর, উত্তরে জাল্লাজালালুহু মা আকবারা শানুহু উচ্চারণ করতো। উল্লেখ্য যে, আকবরের পুরো নাম ছিল জালালুদ্দীন আকবর। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী ব্যক্তিপূজার রাজনীতির সাথে কতই না মিল।
- শাহী দরবারের নিয়ম ছিল যখন সম্রাট আগমন করতেন তখন একজন ঘোষক বলতো 'আল্লাহু আকবার' অন্যজন বলতো 'জাল্লে জালালুহু' যার অর্থ আবারই আল্লাহ্ এবং তারই মহত্ত্ব ঘোষণা করা হচ্ছে।
- **মাহে রমযানের সিয়াম সাধনার প্রতি মর্মন্তুদ অবমাননা করা হয় পক্ষান্তরে, হিন্দুদের একাদশীকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করা হয়। দৈনন্দিন পানাহার ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ব্রাহ্মণ্য ও চানক্য সমাজের পুনর্জন্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।**
- আকবরের অনুসারীরা 'চেলা' নামে অভিহিত ছিল এবং কোনো চেলার মৃত্যু হলে মাথা পূর্বদিকে এবং পা পশ্চিম দিকে রেখে দাফন করা হতো। কবরে সূর্যের আলো প্রবেশ করার মতো জানালা রাখা হতো। জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে লাশ দাফনের পরিবর্তে পুতে ফেলা অথবা পানিতে ভাসিয়ে দেয়ার শাহী ফরমান জারি করা হয়েছিল।
- কোনো যুবতী নারী রাস্তায় বের হলে তার চেহারা খোলা রাখার বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে জারি করা হয়েছিল। রাজপুত কন্যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাদশাহর দাড়ি কামানোর খেয়াল হয় এবং এর পক্ষে দলিল ও সংগ্রহ করা হয়েছিল। কথিত আছে যে, নওরোজের উৎসবে কাজী, মুফতী এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী মদ ছাড়া থাকতে পারত না। তার প্রবর্তিত ধর্মমতে মদ্যপান হালাল ছিল এবং শাহী দরবারে একজন সুদর্শনা যুবতীর পরিচালনায় একটি মদের আসর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যার আধুনিক রূপ হচ্ছে শহরের বিভিন্নস্থানে বর্তমানে দৃশ্যমান অসংখ্য মদের বার।
- ইসলামে নিষিদ্ধ সুদ ও জুয়া দীনে ইলাহীতে আইনসিদ্ধ করা হয়। ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তিকে বৈধতা দানের উদ্দেশে শয়তানপুর নামে কলোনী স্থাপন করা হয়েছিল।
- **মুসলমানদের মসজিদে প্রতিমা রাখা বৈধ করা হয়। হিন্দু পূজারীগণ**

www.pathagar.com

মসজিদে তাদের পূজা পাঠ করতো। রাজার হিন্দু রাণীগণ এসব পূজায় অংশ নিতো।

- ৮ শ্রাবণের মেলায় আকবর হিন্দুদের অনুকরণে তিলক ধারণ করতেন এবং মণিমুক্তা খচিত একগুচ্ছ সূত্র রাখীবন্ধন হিসেবে গ্রহণ করা হতো।
- গরু জবাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।
- মুসলমানদের পবিত্র উপাসনালয় মসজিদসমূহ ধ্বংস করে তদস্থলে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল।

'সকল ধর্মকে সমান নজরে দেখা হবে' দীনে ইলাহীর মূলনীতিতে উল্লেখ থাকলেও আকবরের স্ব-ধর্ম ত্যাগ ও পরধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণই ছিল এর মূলমন্ত্র। হাজার বছর পেরিয়ে যাবার অজুহাতে ইসলামী বিধি-বিধান সম্বলিত শরীয়াহকে অকার্যকর আখ্যা দেয়ার পেছনেও ছিল চাণক্য রাজনীতি, যাতে মুসলমানরা স্বর্ণালী সে যুগের কথা মনে করে উজ্জীবিত হতে না পারে। ইসলামের সুমহান আদর্শকে কটাক্ষ করার হীন উদ্দেশে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতোই একটি আচার সর্বস্ব ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। ইসলামবিরোধী শক্তি ভাল করেই জানতো যে, মুসলমানদের মাঝে আত্মকলহের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে না পারলে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত করা সম্ভব হবে না। তাই শয়তানের রাজত্ব কায়েমের স্বপ্নে বিভোর এই অপশক্তি মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানভূতি ও ঐক্য বিনষ্টের সুগভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে টার্গেট করেছিল। তাদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের প্রভাবে সত্য ও সুন্দরের ইসলাম, সর্বাঙ্গীন কল্যাণময় মানব মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম তার রাজনৈতিক দর্শন হারিয়ে ফেলে, যার প্রভাবে মুসলমানরা সহজেই স্বকীয় রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে বিপথগামী ও বিভ্রান্ত হয়ে পারস্পরিক কোন্দল, ঝগড়া ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছিল। দীনে ইলাহীর প্রভাবে তারা ভুলে গিয়েছিল যে, ইসলাম অনুশীলন নির্ভর সর্বাঙ্গীন কল্যাণের ধর্ম। ইসলামী মূল্যবোধ, নীতি, আদর্শ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে শাহী দরবারের আনুকূল্য প্রত্যাশী সভাসদ, পরামর্শক ও বিভিন্ন ধর্মের বিশেষজ্ঞদের কুপরামর্শে রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে উৎসাহদান, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নানা মতবাদের প্রচার ও প্রসার সর্বোপরি, নানা তন্তর-মন্তর বাস্তবায়নের অপতৎপরতা চালানো হয়েছিল। আকবরের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ও তার ধর্ম দ্বীনে ইলাহী আজ অতীতের বেদনা, ইসলাম তার মৌলিকত্ব নিয়ে টিকে আছে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বীনে ইলাহীর স্থান দখল করে

www.pathagar.com

আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভেদের মহাপ্রাচীর গড়ে তুলছে।

আধুনিক জামানার জাহেলিয়াত-ধর্মনিরপেক্ষতা : দ্বীনে ইলাহীর সুযোগ্য উত্তরাধিকার

উপমহাদেশের রাজনীতি অঙ্গনে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের যে আদর্শ প্রচারিত হয় তা স্বরূপে আকবরের দ্বীনে ইলাহীর নবতর সংস্করণ। এক কথায় দ্বীনে ইলাহী ও ধর্মনিরপেক্ষতা একে অন্যের পরিপূরক। দ্বীনে ইলাহীর স্থপতিগণ যে উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে ব্যবহার করেছিল আজও একই উদ্দেশ্যে এই ধারণাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলামবিরোধী এই মনগড়া ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে মুসলিম মানসে চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে ও বহুধাবিভক্ত নিপীড়িত-নিগৃহীত মুসলমানরা ঐক্যের পথ খুঁজে পেতে পারে।

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রায় দু'শো বছর পূর্বে সম্রাট আকবরের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দীনে ইলাহীর মতো একটি মনগড়া ও ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভেদযুক্ত 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতির যে বীজ বপন করা হয়েছিল তা আজ মহীরুহ আকার ধারণ করেছে, যা মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা বিনাশ ও আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কিংবা বর্ণ হিন্দুদের কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা না থাকলেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের ঈমান, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও তাহজীব-তমুদ্দুনের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ ধরনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা ধর্মনিরেপেক্ষতার বলি হলেও লাভবান হচ্ছে মুসলিম নামধারী সমাজতান্ত্রিক ধারার কলুষিত রাজনৈতিক একটি গোষ্ঠী। **আমাদের নতুন প্রজন্ম ইসলামী ভাবধারা ও আদর্শের বিপরীতে আধুনিকতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সনাতনী ধারার নির্জীব পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে অদূর ভবিষ্যতে হয়তোবা আমাদের ইন্তেকালের পর দোয়ার জন্য মোল্লা মৌলভী ভাড়া করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।**

'দীনে ইলাহী'র মতো পারস্পরিক বিদ্বেষপূর্ণ একটি নতুন ও উদ্ভট জগা-খিচুড়ি মতবাদ প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্রাট আকবর ইসলামপ্রিয় মানুষের অন্তরে যে সুগভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিলেন এর ধারাবাহিকতা আজ ধর্মনিরপেক্ষতা রূপে স্পষ্টতঃই আমাদের সমাজে দৃশ্যমান। ধর্মনিরপেক্ষতার পারিভাষিক অর্থ

www.pathagar.com

হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও মুহূর্তকে আল্লাহ্‌র বিধানের অধীন সমর্পণ না করে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে মানুষের অধীন রাখা এবং মাবনজীবনকে নামমাত্র কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখে ও রাজনীতির মতো একটি মৌলিক বিষয়কে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত রাখা। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এই ভেবে আজ আতঙ্কিত যে, আকবর যেভাবে দ্বীনে ইলাহীর মাধ্যমে ভোগবাদী ও বিভেদের সংস্কৃতি প্রচলন করে ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুনকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন আধুনিক জমানার জাহেলিয়াত **'ধর্মনিরপেক্ষতা'র প্রবক্তরা আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে কলুষিত করে আমাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও নতুন প্রজন্মকে ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে বিভেদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে মুসলমানদের ভিতর থেকে দুর্বল করার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। শিরকযুক্ত এই জঘন্য মতবাদের ধারাবাহিকতায় আইয়্যামে জাহেলিয়াত ও আকবরের সময়ে গৃহীত বিভিন্ন ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।** মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূলে আকরাম (সা.) তাঁর সহচরগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান আদর্শ বাস্তবায়নে আমাদের সামনে অনুপম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকতাসম্পন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টিতে এদেশের বিজ্ঞ আলেম সমাজের বিশেষ করণীয় রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে কিছু মতভেদ থাকতেই পারে, তাই বলে ঢালাওভাবে কোনো দল বা গোষ্ঠীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সমীচিন হবে না। তাওহীদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁদের সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলতে পারলে আমরা যে স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তা বাস্তবায়িত হবে এবং দলে দলে মানুষ ইসলামের ঝাণ্ডাতলে আশ্রয় নিবে। ইসলামী মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনাহীন দাওয়াত কিংবা জিকির-ফিকির, **তোতা পাখির মতো শেখানো কিছু তাসবীহ্-তাহলীল, ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে এই জঘন্য বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। সর্বাঙ্গীন কল্যাণের আদর্শসমূহ বাস্তবায়নে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে নেতৃত্ব দেবার দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হবার শপথ নিতে হবে। ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনকে সর্বাধিক গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে পারলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অপসংস্কৃতি আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না।**

আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নানা মুণি নানান মত তথা মানব সৃষ্ট মতবাদের প্রাধান্য, ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন রাজনীতির প্রভাব

www.pathagar.com

এবং মানুষের বড়ত্ব ও আমিত্ব প্রকাশের প্রবণতায় আকবর প্রবর্তিত দীনে ইলাহীর দীর্ঘমেয়াদী কুপ্রভাবের বাস্তব প্রকাশ। আধুনিকতা ও প্রগতির নামে অবাধ তথ্য প্রবাহের দোহাই দিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনা হয়েছে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমরা সকলেই। আমাদের সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের রেওয়াজ বা রসমের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, যা মূর্খ সম্রাট মান্দ প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিজাতীয় মুণী-ঋষিদের চক্রান্ত ও পরিকল্পনায় মুসলমান হিসেবে নিজের আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়ায় আকবরের সময়ে সমাজে নৈতিকতার যে দৈন্যতা দেখা দিয়েছিল এর ধারাবাহিকতা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আজ বিষময় করে তুলেছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' মতবাদকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বুকে আঁকড়ে ধরতেই পারে। কিন্তু ধর্মীয় সহনশীলতা ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে সকল ধর্মের প্রতি সমআচরণের দোহাই দিয়ে এই দর্শনকে যেসকল মুসলমান রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে গ্রহণ করতে তৎপরতা দেখায় তখন তাদের লক্ষ-ঝম্ফকে আকবরের সভাসদ ও রাজন্যবর্গ আবুল ফজল, ফয়জীর প্রেতাত্মার আর্তনাদ বলেই মনে হয়। আকবরের সময়কার দুনিয়াদার আলেমদের কেতনার সাথে বর্তমান সময়ের দুনিয়াদার আলেমদের জাগতিক লোভ-লালসা চরিতার্থ করার প্রতিযোগিতা অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। আকবর যেভাবে রুটিতে মধু মেখে আলেমদের মাঝে বিভেদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছিল ইহুদী-খ্রিস্টান-নাসারা চক্র আজ দুনিয়াদার আলেমদের অর্থ ও বিত্তের প্রলোভনে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুনকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এই ভ্রষ্টনীতির কুপ্রভাবে আলেম সমাজ রাজনীতিকে জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। মনে রাখতে হবে, দীনে ইলাহীর বাস্তবায়নে আকবরের সময়ে মুণী-ঋষিদের ভূমিকা যেমন ছিল তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতার পেছনে বর্তমান সময়ের ইসলামবিরোধী পৌত্তলিক, ভারতপ্রেমিক ও সমাজতন্ত্রীদের কুমন্ত্রণা রয়েছে।

মুসলমানদের মাঝে যাতে কোনো প্রকার বন্ধন বা সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য ইসলামবিরোধী শক্তি এক হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু একজন মুসলমান পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখেল হবার ঘোষণা দিয়ে জীবন ঘনিষ্ঠ-সংশ্লিষ্ট সকল কাজে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়, সেহেতু সে হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতো স্ব-ধর্ম ত্যাগ বা পর ধর্ম গ্রহণ কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অনুসারী হতে পারে না। একজন পরিপূর্ণ মুসলমান তাঁর স্বীয় ধর্মীয় চেতনার প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখবে এটাই স্বাভাবিক, এটা কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। বাংলাদেশে পরিপূর্ণরূপে ইসলামী

www.pathagar.com

অনুশাসন মেনে চলার প্রত্যয়ী ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এই ভেবে যে, ধর্মীয় উদারতার দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার লেবেল এঁটে দিয়ে যারা সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তাদেরকে ধর্মীয় লেবাসধারী কিছু ব্যক্তি তাদের বক্তব্য ও কর্মের মাধ্যমে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করছে না। ইসলামে বিভেদ থাকতে পারে না, তবে মতভেদ থাকতে পারে। মতভেদের সীমারেখাও ইসলাম জানিয়ে দিয়েছে। সেই সীমারেখা অতিক্রম করে অনেককে দেখা যায় ইসলামী রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কাফের ফতোয়া দিতেও দ্বিধা করছে না। **কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আলেমসমাজকে একটি বিষয় অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে জেনে নিতে হবে যে, ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। দ্বীনি ইলম শিক্ষাদানের সাথে সম্পৃক্ত সম্মানিত আলেমগণ রাজনীতিকে নোংরামি হিসেবে মনে করে থাকে। মুসলিম বিদ্বেষী অপশক্তি ধর্মকে একটি সুউচ্চাসনে রেখে জীবনের বাকি ক্ষেত্রগুলোকে অধর্মের কাছে বিসর্জন দেবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামের মূল বুনিয়াদকে ইতোমধ্যে যথেষ্ট নড়বড়ে করে দিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত সিরাতুল মুস্তাকিম (সত্য-সঠিক ও সহজ-সরল রাজপথ) থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত আলেমসমাজ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না হলে জাতির ঘোর অমানিশা কাটবে কী করে? জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায় :**

"দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মৎ?"

[উপরোক্ত লেখাটি আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ (রহঃ) রচিত 'ইতিহাসের আলোকে আত্মকলহের ভয়াবহ পরিণাম' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি ১৯১৫ খ্রি. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা থানার অন্তর্গত দেলী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০ জানুয়ারি ২০০৩ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। তিনি আজিমপুর গোরস্তান শাহী মসজিদে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় খতিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং মাদরাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুরসহ সারাদেশে বহু মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মক্কা বিজয়' ও 'চাঁদ দেখা' ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়।]

www.pathagar.com

শিয়া মাজহাবী চিন্তাধারা

আন-নাওবখতি বলিয়াছেন—রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনে উম্মত তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১. শী'আঃ অর্থাৎ আলী ইবনে আবি তালিবের অনুসারী; ২. আনসার, যাহারা মদিনা রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ)কে আমীর মনোনয়ন করতে চেয়েছিলেন; ৩. সেই দল যাহারা আবু বকর (রাঃ)-এর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। (ফিরাকুশ শি'আঃ পৃ. ১)

আল ইয়াকুবী মদীনার মসজিদে সমবেত লোকদের সামনে হযরত আবুযর গিফারীর নিম্নোক্ত বক্তব্যকে শিয়া মতবাদের ভিত্তি হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। বক্তব্যটি হলো— "আলী হচ্ছেন মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতিনিধি (ওয়াসি) এবং তাঁর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ)। হে নবীজির পরবর্তী উদ্ভ্রান্ত উম্মাহ, যদি তোমরা তাদেরকে নেতৃত্বে অগ্রাধিকার দাও যাদেরকে আল্লাহ অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাদেরকে উপেক্ষা কর—যাদেরকে আল্লাহ উপেক্ষা করেছেন এবং রাসূলের পরিবারের মধ্যে দৃঢ়ভাবে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা কর, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা হবে সমৃদ্ধশালী এবং তোমাদের জীবনযাত্রা হবে প্রাচুর্যময়। (সূত্র : শিয়া মাজহাবের উৎপত্তির ইতিহাস, মূল সৈয়দ মুহাম্মদ জাফরী, অনুবাদ মনজুর আলম পৃ. ৮৪)

বস্তুতঃ সূচনাকাল হতেই হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বনকারীদের শী'আ বলা হতে থাকে। কিন্তু উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধের সময় যারা হযরত আলীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তাদেরকে শিয়া বলা হতো। কারবালার যুদ্ধে হোসাইন ইবনে আলী ও তাঁর সঙ্গী-সাথী, পরিবার-পরিজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হলে শিয়া মতবাদ প্রকাশ্য ও স্বাতন্ত্র্যতা লাভ করে। হোসাইনের (রাঃ) শাহাদাতের পর হযরত আলীর অনুসারীদের মধ্যে যে মতানৈক্য শুরু হয় তার মাধ্যমেই শিয়ারা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইমামী শিয়াদের মতে, যারা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর ওয়ারিশ কেবলমাত্র তারাই মুসলমানদের ইমাম হওয়ার যোগ্য, অন্যদিকে যায়দি শিয়াদের মতে হযরত আলীর অন্য স্ত্রীর সন্তান-সন্ততিরাও ইমাম হওয়ার যোগ্য।

www.pathagar.com

হুসাইনের শাহাদাতের পর ইয়াজীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত আলীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মদ বিন আল হানাফিয়া ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁর রাজ্যের অনেক অংশ দখল করেছিলেন। হানাফিয়ার প্রতিনিধি 'আল মুখতার' হুসাইনের রক্তের বদলা নিতে গিয়ে কারবালার হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ ব্যক্তির শিরোচ্ছেদ করেছিলেন। তিনি কারবালার হত্যাযজ্ঞের মূল রূপকার উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের মস্তক কর্তন করে তা জয়নাল আবেদীন বিন হুসাইনের সম্মুখে উপস্থাপন করেছিলেন। এসব কারণে এসময় আল হানাফিয়াকে বেশিরভাগ শিয়া তাদের ইমাম হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

অপরদিকে যারা আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) এর রক্তের বন্ধনের উত্তরাধিকারী ব্যতীত অপর কাউকে মুসলমানদের উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন তারা নীরবে তাদের বিশ্বাস লালন করেছেন, রাজকার্য থেকে, রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন এবং নিজেদের মতবাদ শিক্ষার মাধ্যমে প্রচার করে মতবাদের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। অবশেষে ফাতিমা ও আলীর উত্তরাধিকারী ইমাম খোমেনী-ইমামী শিয়াদেরকে রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় করেন এবং ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১% এর বেশি হবে না। যারা আছেন বেশিরভাগই উর্দুভাষী মুহাজির। ফলে বাংলাদেশের সুন্নী মুসলমানেরা শিয়াদেরকে ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী মনে করেন। এদেশের আলেম-ওলামারা এসকল ভ্রান্তি নিরসনের কোনো উদ্যোগ কখনো গ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। বাংলাদেশের সুন্নী মুসলমানদের জ্ঞাতার্থে এবং ভ্রান্তি নিরসনে নিম্নের দলিলাদি উপস্থাপন করছি—

১. শিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির মৌলিক উপাদান তা-ই, যা ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। শী'আ ইসলাম হতে ভিন্ন কোনো দ্বীন নয়। এর ভিত্তি কোরআন, হাদীস ও আহলি বায়তের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হিজরী ১৩৩ সনে উমাইয়া শাসনের পতন হয় ও আব্বাসীয় শাসন শুরু হয়। উভয় শাসনের শেষ ও শুরুর সময়ে (ইমামী শিয়াদের ৭ম ইমাম হিসাবে পরিচিত) ইমাম জাফর আস-সাদিক স্বাধীনভাবে ইলম, মারিফত ও মাযহাবের বিস্তৃতির সুযোগ পান। তাঁর পশ্চাতে বস্তুগত শক্তি ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। এটা ছিল ইমামের ইলমী ও আমলী শক্তি এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাব, যার ফলে লোকজন বিভিন্ন স্থান হতে আকৃষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে ইমামের পাঠচক্রে আসতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁর পাঠচক্রে চার হাজার ছাত্র জড়ো হয়। এদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রঃ), সুফইয়ান উয়ায়না (রঃ), সুফইয়ান ছা'ওরী (রঃ), শুবা ইবনে হাজ্জাজ (রঃ) ও ফুদায়ল ইবনে আয়্যাদ নামক প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শি'আঃ পরিভাষার 'উসুলে আরবাআ মিয়া'র চারিশত গ্রন্থের অধিকাংশ এ সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ এই ৪০০ গ্রন্থকে উৎস ধরে হাদীসের এক বিশাল সংকলন তৈরি করে সর্বকালের জন্য সংরক্ষণ করে রাখেন। (সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫১, ইফাবা প্রকাশনা)

২. শিয়াগণ বার ইমামের প্রতি বিশ্বাসকে যদিও অপরিহার্য মনে করে তবুও তাদের অস্বীকারকারীদের ইসলামের বহির্ভূত মনে করে না। বরং তার উপর ইসলামের যাবতীয় বিধান জারি হবে। (সূত্র : ঐ, পৃ. ৭৪৮, তথ্যসূত্র আ'য়ানু'শ শী'আঃ ১ম খণ্ড পৃ. ৯৭)

৩. ইমামত—ইমামী শিয়াদের ইমামত হলো একটি পদের নাম। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর অবর্তমানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দীন ও দুনিয়া তথা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার একক পদকে বলা হয় ইমামত। এই পদে যিনি থাকেন তিনি হলেন ইমাম। তিনি একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান, ধর্মেরও প্রধান। ইসলামের স্বার্থ রক্ষা করা, শরীআ'তের বিধিবিধান জারি করা এবং মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের প্রশিক্ষণ দেওয়া ইমামের দায়িত্ব। ইমাম নিয়োগ করা উম্মতের উপর ওয়াজিব। খারিজী সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোনো মাজহাব এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেনি।... ইমামী শিয়াদের বিশ্বাস এই যে, ইমামের নিয়োগ আল্লাহর পক্ষ হতে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ বিষয়ে জনগণের মতামতের কোনো স্থান নেই। তাদের মতে, ইমামতের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে জনগণের মতামতের উপর ছেড়ে দিলে উম্মতের মধ্যে বিভেদ বিশৃঙ্খলাকেই ডেকে আনা হবে। কেননা জনগণের মতামত বিভিন্ন রকম স্বার্থে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

ইমামতের পদ একনায়কতন্ত্র এবং বংশীয় ও গোত্রীয় শাসন হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক, বংশীয় ঐক্যের কোনো মূল্য নেই। বরং ইমামতির জন্য আসল মাপকাঠি ঐসব গুণ, যা এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অপরিহার্য। শী'আঃ মতাদর্শ অনুযায়ী ইমামের মধ্যে ইলম, ফা'দীলাত, যুহুদ ও তাকওয়া ছাড়াও ইমামের নিষ্পাপ হওয়াও জরুরি। অন্যথায় তাঁর ভুল কর্মপদ্ধতি শরীয়াতের বিধানের উপর প্রভাব ফেলে ইমামতের স্বার্থকে কলঙ্কিত

www.pathagar.com

করে দেবে। কিংবা নিজে স্বৈরাচারী শাসকের আসনে আসীন হবে।... খলীফা ও ইমাম রাষ্ট্রের মধ্যে আল্লাহর জারিকৃত বিধানের তদারকী ও প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। জনগণ তাদের আনুগত্য করে চলে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার কারণে। আহলে বায়তের ইমামদের মূল লক্ষ্য ছিল—মানুষের স্বভাবজাত স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখে মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুগামী করা এবং মানুষের উপর হতে মানুষের প্রভুত্ব খতম করা। (সূত্র : ঐ, পৃ. ৭৪৭)

বাংলাদেশের মুসলমানদের শতকরা ৯৮% হানাফী মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে। ইমামী শিয়াদের প্রথম সাতজন ইমামকে এ মাজহাবের অনুসারীদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা চিনে এবং ভক্তি শ্রদ্ধা করে। পরবর্তী ইমামদের নাম হয়তো অনেকে জানেন না। এই না জানাটা শিয়া মাজহাবের কোনো দোষ নয়। শিয়ারা আল্লাহর একত্ববাদকে ও তাঁর নাজিলকৃত কোরআনকে বিশ্বাস করে, তাঁর প্রেরিত রাসুল (সঃ)কে নিজেদের প্রথম ইমাম হিসাবে সাব্যস্থ করে, হযরত আলী (রাঃ)কে দ্বিতীয় ইমাম হিসাবে সাব্যস্থ করে। কোনো মানুষ যদি আল্লাহকে মানে, তাঁর রাসুল (সঃ)কে অনুসরণ করে তবে তার সাথে কোনো মুসলমানের বিরোধ থাকার কোনো যুক্তি নেই। **তদুপরি আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি আমাদের মাজহাবের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) শিয়াদের ৭ম ইমাম জা'ফার আস সাদিকের শিষ্য ও সহযোগী ছিলেন এবং আধুনিক বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও বিপ্লবের বীজ যিনি বপন করেছেন সেই মহান ব্যক্তি জামালউদ্দীন আফগানী (রঃ)ও একজন সুন্নী ছিলেন। এই মহান ব্যক্তির আহ্বানেই বর্তমান বিশ্বের শিয়া-সুন্নী ইসলামী আন্দোলনসমূহ সূচিত হয়েছে। এমতাবস্থায় শিয়া-সুন্নী বিভেদের কোনো হেতু আছে বলে আমি মনে করি না। যারা আধুনিক বিশ্বে জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় চায়, তাদের উচিত বিজাতীয়দের Divide & Role নীতির চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের দুটি শাখাকে দুটি হাত মনে করা, একহাত অন্য হাতকে সাহায্য করবে এবং বাতিলের মোকাবিলায় উভয় হাত ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।**

মূলতঃ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের ইহুদী-খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ শত শত বই লিখে শিয়া-সুন্নী বিভেদের বীজ বপন করে উভয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল সৃষ্টি করেছে—যে দেয়ালকে ভাঙার কাজ শুরু করেছেন ইরানী বিপ্লবের রূপকার ইমাম খোমেনী (রঃ)। এজন্যই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ইমাম খোমেনীর (রঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইরান- মিসরের সুন্নী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলেমুন এর সহযোগী, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার রূপকার সুন্নী হামাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং লেবাননের শিয়া মিলিশিয়া বাহিনী

www.pathagar.com

হিজবুল্লাহর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকচক্র মুসলিম ঐক্যকে বিনষ্ট করার জন্য পৃথিবীর মুসলিমপ্রধান দেশসমূহে তাদের তাবেদার এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমানদের দিয়ে বিভিন্ন নামের উপদল সৃষ্টি করে। ইরানে এরূপ দুটি উপদলের নাম যথাক্রমে বাবিয়াত ও বাহাই। উভয় মতবাদ থেকে অনুপ্রেরণা ও সাহিত্য নিয়ে ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কাদিয়ানী ফেরকার সৃষ্টি করা হয়। ইরানে সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার সরকারসমূহের প্রধান সহযোগী ছিল ইহুদী, বাবিয়াত ও বাহাই ফেরকার লোকেরা। ভারতবর্ষে ও বর্তমান ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার সরকারসমূহকে সহযোগিতা করছে কাদিয়ানীরা। কাদিয়ানী ধর্মমতের উপর আমার একটি প্রবন্ধ আছে, যা পরিশিষ্টে দেয়া হবে। নিম্নে অপর দুই ফেরকার পরিচয় উল্লেখ করা হলো :

বাবিয়াত : সাইয়্যেদ আলী মোহাম্মদ শিরাযী (১৮২০-১৮৫০) এই ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা। সে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে ইমাম মাহদীর সাথে মিলিত হবার দরজা (বা'ব) বা মধ্যম হিসাবে দাবি করে। পরে সে তার উপর আসমানী কিতাব নাজিল্ হওয়ার দাবি করে। এরপর সে নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করে। ইরান সম্রাট মোহাম্মদ শাহ ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জনমতের চাপে আলী মোহাম্মদ সিরাজীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

বাহাই : বাবিয়াত মতবাদের প্রবক্তা আলী মোহাম্মদের শিষ্য মীর্যা হোসেন আলী উরফে বাহাউল্লাহ (১৮৩০-১৯১২) ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত বাহাই ধর্ম প্রচার করে। বাহাই মতে, ১৯ সংখ্যা পবিত্র। তখন ইরানের ক্ষমতায় ছিলেন ব্রিটিশ অনুগত দুর্বল শাসক নাসিরুদ্দিন শাহ। তাঁর পক্ষে বাহাউল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, ফসলের ক্ষেতে যেরূপ আগাছা জন্মায় তদ্রুপ ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ, মুসলমানদের ইসলাম বিষয়ক অজ্ঞতা, অমুসলিম দার্শনিকদের বিভ্রান্তি, ইহুদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্তে শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের মধ্যেই কুসংস্কার, বিদাআ'ত প্রবেশ করে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছে। বর্তমানে অনেক সুন্নী পীর ও ফের্কা যেরূপ সঠিক ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে তদ্রুপ অনেক শিয়া গ্রুপও ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। এমতাবস্থায় মাজহাবী বিচ্ছিন্নতাকে প্রাধান্য না দিয়ে মুসলমানদের উচিত আল্লাহর নাজিলকৃত পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা এবং কুসংস্কার ও বিদআত মুক্ত হওয়া।

www.pathagar.com

কাদিয়ানী ফেরকা বা মতবাদ

নন-ইস্যুকে ইস্যু করা, মীমাংসিত বিষয়কে বিতর্কিত করা, ফরজ কাজ বাদ দিয়ে নফলের পিছনে সময় ব্যয় করা আমাদের জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে সম্প্রতি সরকার এরূপ একটি অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অথচ কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে সরকার প্রকারান্তরে প্রতিপক্ষের দুইটি উপকার করেছে।

এক. নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে।

দুই. তথাকথিত পাশ্চাত্য প্রগতিশীলদের নেতিয়ে পড়া কণ্ঠকে উচ্চকিত করার সুযোগ করে দিয়েছে।

পৃথিবীতে হাজারো মত ও পথ রয়েছে। এখনও শতাধিক ধর্মমতের অনুসারী জনগোষ্ঠী রয়েছে। এতদসত্ত্বেও নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মজলুম মুসলমানগণ স্বধর্ম ত্যাগ করে অপরাপর ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না। কাদিয়ানী ধর্মমতও উক্ত শতাধিক ধর্মমতের একটি বৈ নয়। উক্ত শতাধিক ধর্মমতের প্রকাশনা মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষতি করতে পারেনি, কাদিয়ানী প্রকাশনাও মুসলমানদের ঈমান আমলের ক্ষতি করতে পারবে না।

বর্তমান পৃথিবীর ৪৮টি দেশ কাদিয়ানীদেরকে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি, তাদের প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করা বা নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি। কাদিয়ানী মতবাদ অনুযায়ী তাদের ধর্ম স্বতন্ত্র, তাদের নবী আলাদা, তাদের উপাসনালয়, পাঠশালা, সামাজিক রীতি-রেওয়াজ মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এমতাবস্থায় অন্যান্য স্বতন্ত্র ধর্মসমূহের মত কাদিয়ানী ধর্মমত ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। কাদিয়ানীদের সাথে মুসলমানদের মৌলিক বিরোধ এই যে, তারা অমুসলমান হয়েও নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের ধর্ম ও সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিভাজন সৃষ্টি করতে চায়। এমতাবস্থায় কাদিয়ানী ফেতনার অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেতে পৃথিবীর অন্যান্য

www.pathagar.com

মুসলিম দেশের ন্যায় কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করাই যথেষ্ট, তাদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা জরুরী নয়। কেননা তাদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ না করলে জনগণ তাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে, তাদের ভণ্ডামী সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হবে। সুবিশাল ও মহান ইসলামী সাহিত্যের তুলনায় কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিতান্তই আবর্জনা বলে গণ্য হবে। তাদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও মান সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা লাভের জন্য কাদিয়ানী প্রকাশনার (ওহীর) কয়েকটি নমুনা প্রদান করা হলো :

১. "যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিবে না, তোমার নিকট বায়আত করিবে না এবং তোমার বিরোধিতাকারী হইবে সে আল্লাহ ও রাসুলের (গোলাম আহমদ) বিরুদ্ধাচরণকারী জাহান্নামী।"
(তাবলীগে রিসালাত ৯ খ. পৃ: ২৭)

২. "যে ব্যক্তি আমার (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) বিরোধী, সে খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, মুশরিক এবং জাহান্নামী।"
(নুযুলুল মাসীহ পৃ: ৪, তাযকিরাহ পৃ: ২২৭, খাযাইন ১৮ খ. পৃ: ৩৮২)

৩. "সকল মুসলিম আমাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং আমার দাওয়াতের সত্যতা স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু বেশ্যার সন্তানেরা আমাকে গ্রহণ করে নাই।"
(আইনা-ই কামালাত পৃ: ৫৪৭-৮)

৪. "যে ব্যক্তি আমাদের বিজয়ের প্রবক্তা হইবে না, তাহার সম্পর্কে পরিষ্কার বুঝিতে হইবে যে, তাহার ব্যভিচার জাত সন্তান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে।" (আনওয়ারুল ইসলাম পৃ: ৩০ খাযাইন ৯ খ. পৃ. ৩১)

৫. "যে সকল মুসলমান হযরত মসীহ মওউদের (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে নাই—এমনকি যারা হযরত মসীহে মওউদের নাম পর্যন্ত শুনে নাই তাহারাও কাফের, ইসলামের বাইরে।" (আইনায়ে ছাদাকত পৃ: ৩৫)

সম্ভবত উপরে উল্লেখিত ওহীর! ভয়ে ভীত হয়ে এদেশের কিছুসংখ্যক মুসলিম নামধারী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী কাদিয়ানীদের পক্ষে জেহাদে অবতীর্ণ হয়ে লাশ ফেলার হুমকি দিচ্ছেন। সর্বোচ্চ আদালতের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টির হুমকি দিচ্ছেন। সন্ত্রাসীর ভাষায় কথা বলছেন। কাদিয়ানী ধর্ম মতের বিরোধিতা করে তথাকথিত জারজ হওয়া, বেশ্যার সন্তান হওয়া, মুশরিক, কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার চেয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর বিরোধিতা করে মুরতাদ হওয়াকে

www.pathagar.com

শ্রেয় মনে করছেন। এমতাবস্থায় উক্ত প্রগতিশীলদের প্রতি আক্রোশ ভাব পোষণ না করে তাদের হুমকিকে মজলুমের আর্তচিৎকার মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে।

পাশ্চাত্য প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণ সাধারণত ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন। ফলে উক্ত বুদ্ধিজীবীগণ বিবর্তনবাদী কাদিয়ানী ধর্মের পক্ষে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কাদিয়ানী ধর্মমতের কালানুক্রমিক বিবর্তনসমূহ নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হবে।

- ১৮৮০ থেকে '৮৮ সাল পর্যন্ত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন একজন মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে একজন তুখোড় তার্কিক।
- ১৮৮৯ সন থেকে তিনি জনগণের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ শুরু করেন ও নিজেকে উম্মতের আউলিয়া দরবেশদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেন। (সীরাতুল মাহদী, ১ম খ., পৃ. ১৪, ৩১ ও ৮৯)।
- ১৮৯১ খ্রীঃ থেকে তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করেন। (হাকীকাতুল ওয়াহয়ী, পৃ. ১৪৯, সীরাতুল মাহদী, পৃ. ৩১, ৮৯)।
- ১৯০০ খ্রীঃ থেকে তার মুরীদগণ তাকে নবী হিসাবে আখ্যায়িত করে। জনরোষ থেকে রক্ষা পেতে তিনি এ সময় নিজেকে আংশিক নবী, ছায়ানবী, ঝিল্লী নবী ও বুরুজী নবী হিসাবে প্রচার করেন। (কালিমাতুল ফাসল, পৃ. ১৬৭, মুনকিরীনে খিলাফাত কা আনজাম, পৃ. ১৯)।
- ১৯০১ খ্রীঃ তিনি নিজেকে নবী ও রাসূল বলে ঘোষণা করেন এবং পূর্বেকার ঝিল্লী-বুরুজী দাবি রহিত করেন। (সীরাতুল মাহদী, পৃ. ৩১, হাকীকাতুল ওয়াহয়ী, পৃ. ৩৯১, খাযাইন ২২, খ. ৪০৬-৭)।
- ১৯০৪ সালে তিনি নিজেকে হিন্দু অবতার শ্রীকৃষ্ণ বলে দাবি করেন। (লেকচার—শিয়ালকোট, ২ নভেম্বর, ১৯০৪, পৃ. ৩৪)।

লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও কাদিয়ানী ধর্মমতের সাথে ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের কোন মিল নেই। ইসলামে প্রত্যেক মুসলমানের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। দ্বীনদার পরহেজগার মুসলিমের জীবন ও কর্ম পরিচালিত হয় এভাবে—"নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার সমগ্র জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।" পক্ষান্তরে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীগণ সকল সময় সাম্রাজ্যবাদের স্বঘোষিত এজেন্ট বা দালাল। সাম্রাজ্যবাদের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তাদের জীবন ও কর্ম পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ কাদিয়ানীদের প্রকাশনার কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো।

১. "অতএব আমার ধর্ম—যাহা আমি বরাবর প্রকাশ করি, এই যে,

www.pathagar.com

ইসলামের দুইটি অংশ রহিয়াছে। প্রথমত: আল্লাহতায়ালার আনুগত্য স্বীকার করা। দ্বিতীয়ত: সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, যাহা শান্তি স্থাপন করিয়াছে। অত্যাচারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের আশ্রয়ে আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহা হইতেছে ব্রিটিশ সরকার।" (শাহাদাতুল কোরআন, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ৩য় পৃষ্ঠা)।

২. তিনটি বিষয় আমাকে ইংরেজ সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রথম পর্যায়ে পৌছাইয়াছে। প্রথমত: মরহুম পিতার প্রভাব, দ্বিতীয়ত: বর্তমান সরকারের বিশেষ অনুগ্রহ, তৃতীয়ত: খোদার এলহাম। (তিরিয়াকুল কুলুব, ৩০৯-১০ পৃ.)।

৩. "এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, আমার মুরীদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে জেহাদের বিধান সমর্থনকারীদের সংখ্যা ততই হ্রাস পাইবে। কারণ আমাকে মসীহ এবং মাহদী হিসাবে মানিয়া লওয়াই জেহাদের বিধানকে অস্বীকার করা।" (শাহাদাতুল কোরআন, ১৭ পৃ.)।

৪. "আমি নিজের কাজ না মক্কায় উত্তমরূপে আঞ্জাম দিতে পারি, না মদীনায়, না তুরস্কে, না সিরিয়ায়, না ইরানে, না কাবুলে, কিন্তু এই সরকারের অধীনে যাহার সৌভাগ্যের জন্য দু'আ করিতেছি।" (তাবলীগে রিসালাত, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ৬৯)।

৫. **"আমরা আশা করি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সাথে সাথে আমাদের ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র ক্রমশ: বিস্তার লাভ করিবে এবং অমুসলমানদের মুসলমান বানাইবার সাথে সাথে আমরা মুসলমানদিগকে পুনরায় মুসলমান বানাইব।"** (আল ফজল, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১০ইং)।

কাদিয়ানীদের উক্ত রূপ শিক্ষার আলোকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তারা উম্মতে মুহাম্মদীকে কাদিয়ানী মুসলমান বা সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টে রূপান্তরে সক্রিয় রয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু সফলতাও তারা লাভ করেছে। কিন্তু তাদের সাফল্যে আমাদের বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্বীয় শাসন শোষণ সম্প্রসারণে বিভিন্ন চটকদার নামে ও ব্যানারে প্রতিনিয়ত এজেন্ট রিক্রুট করছে। এসব এজেন্টগণ বংশানুক্রমিকভাবে কেয়ামত পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের দালালীতে লিপ্ত থাকবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতনে তারা রুশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালী করছে। রুশ সাম্রাজ্যবাদের পতনে বর্তমানে রুশ কমরেডগণ ইহুদী-মার্কিন ও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের দালালী করছে। উক্ত তিন সাম্রাজ্যবাদের পতন হলে নবোত্থিত নতুন সাম্রাজ্যবাদের ছায়াতলে তারা আশ্রয় নেবে।

www.pathagar.com

কাদিয়ানীরা অমুসলিম এ বিষয়ে মুসলিম বিশ্ব একমত। বিশ্বের ১৪৪টি দেশের ইসলামী সংগঠনসমূহের কেন্দ্রীয় সংস্থা 'রাবেতায়ে-আলমে আল-ইসলামী' ১৯/০৪/১৯৭৪ইং তারিখে 'মক্কা ঘোষণা'য় কাদিয়ানীদেরকে 'কাফের' সাব্যস্ত করেছে। ওআইসি ১৯৮৮ সালের 'বাগদাদ ঘোষণা'য় কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

উপসংহারে আমি বলব, বর্তমান জোট সরকার কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞতার পরিচয় দেননি। সরকার যদি কাদিয়ানী কেতনা থেকে জনগণকে রক্ষায় আন্তরিক হন তবে পৃথিবীর অপরাপর ৪৮টি দেশ রাবেতা ও ওআইসি'র ন্যায় কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও স্বতন্ত্র ধর্মের অনুসারী হিসাবে ঘোষণা করাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কেননা প্রকাশনা নিষিদ্ধ করলে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, তদুপরি বিভিন্ন ব্যানারে সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টগণ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবে।

চট্টগ্রাম, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

www.pathagar.com

Pan Islamism বা বিশ্ব ইসলামীবাদ

২০ বছর বয়সে শিক্ষা জীবন শেষ করে শায়খ জামালউদ্দীন আফগানী ১২ বছর ব্রিটিশ প্রভাবাধীন আফগান সরকারে রাজকার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তিনি ব্রিটিশ কলোনী ভারত উপমহাদেশ, রুশ-ব্রিটিশ দখলদারীর অধীনস্থ ইরান, ব্রিটিশ কলোনী ইরাক এবং একমাত্র স্বাধীন মুসলিম দেশ তুরস্কে গমন করেন। ভ্রমণের জন্য তিনি কোথাও যান নাই। বিশ্বব্যাপী অধঃপতিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত নির্যাতিত ও পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি এসব দেশে ভ্রমণ করে এসব দেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও আলেমদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে তাঁদের প্যান ইসলামিক ধারণা ও পরাধীনতা থেকে মুসলমানদের উত্থানের রূপরেখা প্রদান করেন। সকল দেশেই তিনি অনেক আলেম, বুদ্ধিজীবী, শাসক ও সেনাপতিকে নিজ মতবাদে দীক্ষিত করেন। তাঁর এই মতবাদের সারকথা ছিল—

আব্বাসীয় শাসনামলের শেষ দিকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পর্যায়ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নব-উত্থিত ইউরোপীয় শক্তি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে এসব বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাজ্যগুলো একে একে গ্রাস করে ফেলে। পরাধীন মুসলমানরা অজ্ঞ-মূর্খ ও সর্বহারায় পরিণত হয়। এমতাবস্থায় পরাধীন মুসলিম দেশসমূহ যদি নিজ নিজ দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে সকল দেশ মুসলিম জাতীয়তাবাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি একক শক্তি রূপে আবির্ভূত হতে সক্ষম হবে। পরবর্তীতে সকল মুসলিম দেশ রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একজন মাত্র খলিফার অধীনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম হবে।

"বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে একই খলিফার অধীনে মুসলিম জাতীয়তাবোধের রাজনৈতিক ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করাকেই বিশ্ব ইসলামীবাদ (Pan Islamism) বলে।"

www.pathagar.com

সাইয়েদ জামালউদ্দীন আফগানীর এই মতবাদ ও মুসলমানদের উত্থানের রূপরেখাটি চিন্তাশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও আলেমদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমে মিসরে, এরপর ভারতে, ইরানে ও তুরস্কে এই মতবাদভিত্তিক সংগঠন গড়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো একে একে স্বাধীনতা লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে যেসব ধর্মীয় ভাবাপন্ন প্রতিরোধ আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় তা জামালউদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারা প্রসূত। ইখওয়ান আন্দোলনের সহায়তায় বাদশাহ আবদুল আযীযের সৌদি আরব প্রতিষ্ঠা, তুরস্কের বর্তমান ইসলামী আন্দোলন, মিসরের ইখওয়ান আন্দোলন, ইমাম খোমেনীর ইসলামী বিপ্লব, ১৯২০-২১ সালে ভারতে উত্থিত খেলাফত আন্দোলন, জামায়াতে ইসলামী, ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার ইসলামী আন্দোলনসহ ফিলিস্তিনের হামাস ও লেবাননের হিজবুল্লাহ আন্দোলন তাঁর চিন্তধারাকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তাঁর মৃত্যুর পর তুর্কী খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তাঁর মিশন পরিচালনা করেন। কিন্তু তুরস্কে ইহুদীদের পরিচালিত দুনমা আন্দোলন, মুসলিম বিশ্বে ইহুদীদের পরিচালিত ফ্রী-ম্যাসন ষড়যন্ত্র এবং ইউরোপের আবিষ্কৃত ভাষাভিত্তিক-ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের চক্রান্তে পতিত হয়ে সুলতান আবদুল হামিদ সফল হতে পারেননি। এতদসত্ত্বেও সুলতান আবদুল হামিদকে এখনো Pan Islamism-এর নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বর্তমানে OIC, IDB, রাবেতায়ে আলমে আল ইসলামী Pan Islamism মতবাদের সৃষ্টি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট, সমাজতত্ত্ববিদ, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক ও গবেষক **জনাব এস.এম. নজরুল ইসলাম** চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানাধীন ডোমখালী গ্রামে ১৯৬০ সালের ৩রা মার্চ জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৯৮৯ইং সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯০ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক (বাংলা) হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করে ব্যবসা, গবেষণা ও ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। ইতিমধ্যে তিনি জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় এবং ইতিহাস বিষয়ে শতাধিক গবেষনাধর্মী প্রবন্ধ এবং ১০টি সেমিনার পেপার রচনা করেন। ইতিমধ্যে তার ৫টি বই যথাক্রমে 'সমকালীন সংলাপ', 'জাতির উত্থান-পতন সূত্র', "সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে-অন্দরে", "খাল কেটে কুমির আনার পরিনাম" ওআমাদের উত্থান-পতন ঃ কারণ ও প্রতিকার" নামক বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বই **"ইসলামী পূনর্জাগরণের রূপকার ও রূপরেখা"** আমাদের জাতীয় জীবনের পথ নির্দেশনা সম্পর্কিত একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

তাঁর প্রবন্ধসমুহ একাধিক জাতীয় দৈনিক ও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত গবেষণাধর্মী **"মাসিক ইতিহাস-অন্বেষা"** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিজেকে, নিজ জাতিকে, সমাজকে, ধর্মকে ও বহির্বিশ্বকে জানার জন্য তাঁর প্রবন্ধসমুহ তথ্য সমৃদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্য। সহজ, সরল, সাবলীল ভঙ্গিতে এবং নির্ভীকচিত্তে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন। অতীত ইতিহাসের সাথে বর্তমানের সমন্বয়ের মাধ্যমে সুন্দর আগামী নির্মাণ ও জাতিকে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান তাঁর জীবনের লক্ষ্য। আমি তাঁর সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করি।

মোঃ মুজিবুর রহমান
এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট
সাধারণ সম্পাদক
ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারি ফাউন্ডেশন